আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-১০

অনুবাদ

মাওলানা আবু সাকী মাহবুব

মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
ফাযেলে হাটহাজারী

বইঘর

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com; web: www. boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

বই ঘর

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-১০
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৬০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0045-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : December 2016 © by the pablisher

Price : 360 Taka only

অ।র্প।ণ

আমাদের প্রেরণার উৎস–
বিগত শতকের আন্তর্জাতিক ইসলামি চিন্তাবিদ ও
ইসলামি সাহিত্যের দুই দিকপাল–
খতিব মাওলানা উবায়দুল হক রহ. ও
মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ.-
এর রূহের মাগফেরাত কামনায়–

–অনুবাদক

প্রকাশকের নিবেদন

উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন, বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.কে আল্লাহ তায়ালা অশেষ ও অদ্বিতীয় দীনি খেদমতের সৌভাগ্য নসিব করেছেন।

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে লেখনি ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি-উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, মেধা ও বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ-নসিহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আলেম-উলামাগণ তো বটেই, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা

হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশও করা হয়। বিশ্ব মুসলিমের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আলোচনা উপস্থাপনের জন্য তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয় পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তে। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর।

আমরা সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ২০১০ সালে জ্ঞানতাপস এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ দশম খণ্ডটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা যারপর নাই আনন্দিত। সেই সঙ্গে এই শেষ খণ্ডটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর থেকে পাঠকদের যে অনবরত তাগিদ ছিল তারও অবসান হলো।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর থেকে সম্মানিত পাঠকদের অবিরাম তাগাদার যে সুখকর পীড়ন তার ভাগ অনুবাদক প্রাজ্ঞ আলেম মাওলানা আবু সাকী মাহবুব সাহেবকে দিতে কার্পণ্য করিনি। আশ্চর্য ধৈর্য নিয়ে তিনি আমাদের অনেক কথা সহাস্যে হজম করেছেন; আর বার বার কুণ্ঠিত মনে সময় চেয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কয়েকটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে আমরা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য প্রকাশ করেছি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাগুলোও যথাসম্ভব বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। তাওফিকের মালিক আল্লাহ তায়ালা।

আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের

সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তায়ালা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ :
১ ডিসেম্বর ২০১১ ঈ.

দুআর মুহ্তাজ
এস এম আমিনুল ইসলাম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

পূর্ব কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ مُصَلِّيًا عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শোকর যে, খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম সিরিজের ১০ম খণ্ডটি এখন আপনাদের হাতে পৌঁছেছে। ওয়াজ ও নসিহত সংক্রান্ত যা পুঁজি আমাদের হস্তগত হয়েছে তা পাঠকদের খেদমতে পেশ করেছি। এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে এত পরিমাণ বিক্ষিপ্ত পুঁজি রয়েছে– যদি সেগুলো একত্রিত করা হয় তাহলে আরো কয়েকটি খণ্ড প্রস্তুত হতে পারে। সাধ্যমোতাবেক ও অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু হস্তগত হয়েছে তা আপনাদের খেদমতে পেশ করেছি।

আল্লাহ তায়ালা যে করম ও অনুগ্রহে খুতুবাতের সিরিজকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, তিনি ওই অনুগ্রহে খুতুবাতকে কবুল করতে আরো পুঁজি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। তখন ইনশাআল্লাহ আরো খণ্ড আপনাদের খেদমতে পেশ করা যাবে।

১০ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান 'ইসলামী আযাদী কা মুকাম্মাল প্রোগ্রাম' দারুল উলুম দেওবন্দের কুতুবখানা তথা পাঠাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যে বক্তৃতা বা সভাপতিত্বের ভাষণ আমাদের প্রয়োজন ছিল। উক্ত বয়ানটি সংগ্রহ করার জন্য দারুল উলুমের মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব মা.জি. এর খেদমতে আর্জিনামা লিখেছি। হযরত মুহতামিম সাহেব দারুল উলুমের কুতুবখানায় তালাশ করালেন। তখন শুধু উক্ত বয়ানটি পেলেন। উক্ত কাজে হযরত মুহতামিম সাহেব দা.বা. যে অনুসন্ধান করেছেন এর শুকরিয়া আমি যতই করি তা কমই হবে। পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বাস্তবতা হলো এই যে, দায়িত্বের যে পদমর্যাদায় তিনি সমাসীন সেদিকে লক্ষ রেখে নিজের কর্মব্যস্ততা হতে সময় বের করে উক্ত কাজকে আঞ্জাম দেয়া, একমাত্র লিল্লাহিয়াতের জযবা দ্বারাই সম্ভব। সেই কারণে উক্ত জযবার প্রতিদান দুনিয়ার বাহ্য বা প্রথাগত শুকরিয়া বাক্য দ্বারা আদায় করা সম্ভব হতে পারে

না। যা হোক, এক দুয়ায়ে মাসনুন তাঁর ইহসানের বদলার কারণ হতে পারে। আর তা হলো এই যে–

فَجَزَاكُمُ اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاء

আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এ ব্যাপারটি কিছুটা খুলে বললে আকাবিরদের উন্নত মানসিকতা এবং উচ্চ হিম্মৎ প্রকাশ পাবে, যাতে আমাদের মত ছোটদের জন্য রাস্তার মশাল এবং তাকলিদ অনুসরণী হবে।

যে সমস্ত তাকরির চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হলো নিরূপ–

১. ফিলিস্তীন আযাদীর প্রতিবাদ সমাবেশ– বোম্বে।

২. জমিয়তে উলামার দ্বীনি তালিমী কনফারেন্স– দিল্লী।

৩. দ্বীনি তালিমী কনফারেন্স– জমিয়তে উলামা, সাহারানপুর, ১৩৮০ হিজরী।

৪. ইউপি শাখা জমিয়তে উলামার মুরাদাবাদের বার্ষিক সম্মেলন।

৫. বোম্বে শাখার জমিয়তের দুটি মহাসম্মেলন যা যথাক্রমে ১৩৬৩ ও ১৩৬৪ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৩৬৪ হিজরীর তাকরিরটি হযরত মুহতামিম সাহেব দা.বা. সংগ্রহ করেন)। এবং

৬. মুসলিম শরীফের ওই হাদীসের ব্যাখ্যা যাতে বলা হয়েছে– 'জাহান্নাম প্রতি বছর দু'বার নিঃশ্বাস ফেলে।' যা মাসিক নক্‌শে দেওবন্দ পত্রিকায় পালাক্রমে জুলাই, আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯৫৯ ঈসায়ীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বয়ানটির অনুসন্ধান এখনো অব্যাহত আছে।

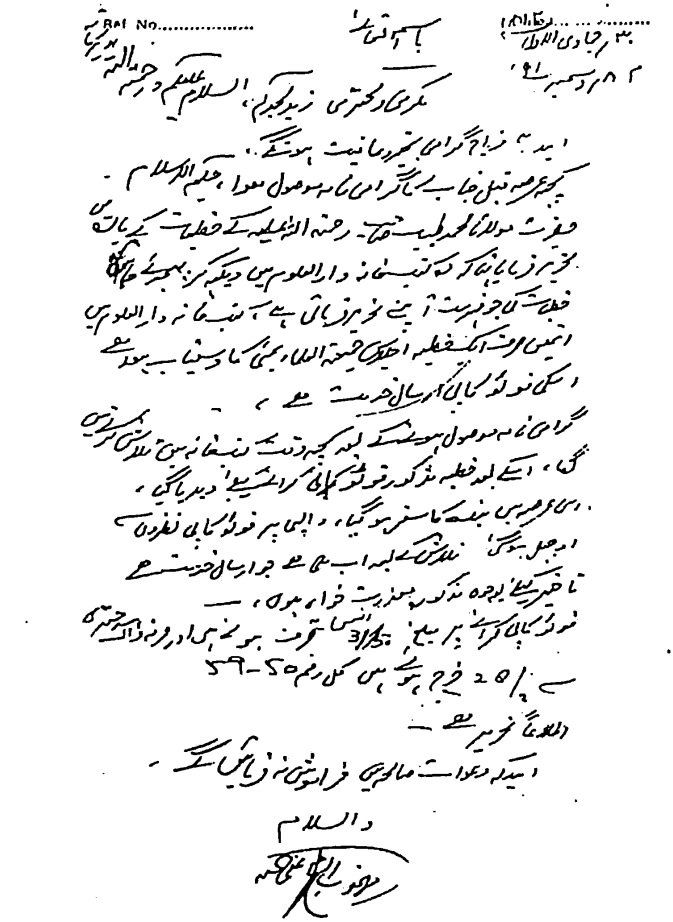
হায়! যদি উক্ত বয়ানগুলো হস্তগত হতো তাহলে খুতুবাতের আরেকটি খণ্ড প্রস্তুত করা যেত।

এগুলো উল্লেখ করার আরেকটি বড় কারণ হলো, যদি কোন আলেমের নিকট উক্ত বিষয়গুলো থাকে অথবা কোন্ স্থানে আছে বলতে পারেন, তাহলে অবগত করাবেন। ইনশাআল্লাহ উক্ত বয়ান সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যেক সম্ভাব্য চেষ্টা করা হবে আর পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হবে। যা হোক দারুল উলুম দেওবন্দে আর্জিনামা পাঠানো হলো। হযরত মুহতামিম সাহেব মা.জি. এর পক্ষ থেকে যে উত্তর দেয়া হয়েছিল তা কিতাবে সংকলন করে কিতাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পত্রে আমি উল্লেখ করেছিলাম, যে সকল তাকরির হস্তগত হবে সেগুলো ফটোকপি করে ডাক মারফৎ পাঠিয়ে দিবেন এবং এ কাজে যা ব্যয় হবে তা অবগত করালে আদায় করা হবে।

সুতরাং একদিকে হযরত ওয়ালা এই কষ্টটুকু করলেন যে, বয়ান সংগ্রহ করার পর পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন আর দেরি হওয়ার কারণ উল্লেখ করলেন। অপরদিকে স্বচ্ছ মুয়ামালার নমুনাস্বরূপ পূর্ণ খরচ লিখে দিলেন।

হযরত মুহতামিম সাহেবের মোবারক পত্রঃ



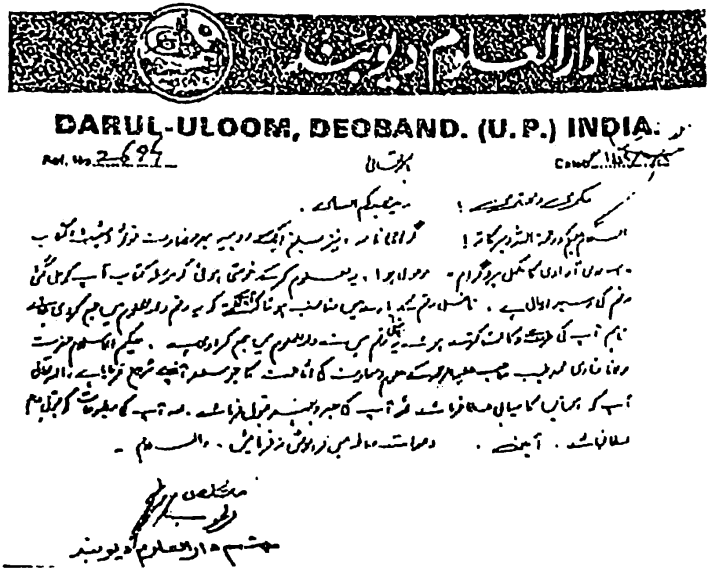
আমি শুকরিয়া পত্র পাঠালাম। সাথে-সাথে ভারতীয় একশত রূপী হযরতের খেদমতে পাঠালাম।

তাতে লিখে দিলাম, কিতাব ফটোকপি এবং ডাকে পাঠাতে যা ব্যয় হয়েছিল তা পরিশোধ করে যা অবশিষ্ট থাকবে তা অধমের

পক্ষ থেকে হযরত ওয়ালার খেদমতে হাদিয়া। আশা করি গ্রহণ করবেন।

হযরতের পক্ষ থেকে উত্তর এসেছিল এমন– 'ব্যয় তো দারুল উলুমে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ডাকে ব্যয় হয়েছে দুই/চার রুপি। আর অবশিষ্ট রুপি সম্পর্কে আপনার পক্ষ হতে লিখে দেয়া উচিৎ ছিল যে, সেগুলো দারুল উলুমে জমা করে নেয়া। যা হোক আমি আপনার পক্ষ থেকে ওকালতি করে অতিরিক্ত রুপি দারুল উলুমের ফান্ডে জমা করে দিয়েছি।' তিনি খুতুবাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করলেন। হযরতের এই পত্রকেও কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

হযরত মুহতামিম সাহেবের দ্বিতীয় পত্র:



বাহ্য দৃষ্টিতে হযরতের জবাবীপত্র প্রত্যক্ষ করে, সত্য কথা হলো একজন ছাত্র এবং হিতাকাঙ্খী হিসেবে অনেক কষ্ট ও ব্যথা পেয়েছি। খরচ বাদে অবশিষ্ট সামান্য রুপি যা হাদিয়াস্বরূপ ছিল, তা অনুগ্রহ করে নিলে খুশি হতাম। এছাড়া হাদিয়া একজন ভদ্র মানুষের পক্ষ থেকে ছিল। আর বাহ্যিকভাবে তা গ্রহণ না করার কোন কারণও ছিল না। কিন্তু অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মস্তিকে এ কথাটি উদয় হলো যে–

'কোনো প্রতিষ্ঠানের বাতি তখনই চালু থাকে, যখন প্রতিষ্ঠানের

দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠানের তরে কুরবানি করে দেয়। নিজেদের স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।'

কেমন যেন হযরত আমাদেরকে এখানে এমন হিকমাতের সবক দিলেন। বাস্তবতা হলো, যতদিন পর্যন্ত এমন পবিত্র আত্মাওয়ালা ব্যক্তিত্বগণ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান থাকবেন ততদিন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ইলমি উন্নতি, শিক্ষা-দিক্ষার মজবুতি, জনসাধারণের আশ্রয়স্থল এবং তাদের মনোযোগ ইত্যাদি নিয়ামতসমূহ অর্জন হতে থাকবে। এটি আকাবিরদের কর্মপদ্ধতির একটি সুন্দর নমুনা। তা এখানে কাগজের শোভা বর্ধন করা হয়েছে অর্থাৎ যুক্ত করা হয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে যে তা অনেক ছোটদের জন্য রাহনুমা এবং চলার পথে মশাল হিসেবে কাজ করবে।

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-এর বিন্যাস ও সংকলনের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওতায়ালা আপন ফযল ও করমে অনেক-অনেক নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সেই আলোচনা করার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে বড় একটি নিয়ামত যা রমযানুল মোবারকে পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতকালে নাসীব হয়েছে তার আলোচনা দ্বারা আশা করি অনেকের চিত্তাকর্ষণের কারণ হবে বিধায় উল্লেখ করছি। যদি ঘটনাটি হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা ও মদিনায় না ঘটতো তাহলে তা আলোচনা করতাম না।

যা হোক, খুব সম্ভবত ১৪০৭ হিজরির রমযান মাসে আমার উমরা করার সৌভাগ্য হয়। উমরাকালে মদিনা শরীফে উপস্থিত ছিলাম। মদিনা শরীফে অবস্থানকালে এ স্বপ্ন দেখলাম যে, কোন একজন দূর মুলুকে বসবাসকারী আমার নিকট এলেন। তিনি অত্যন্ত আযমত ও মহাব্বাত এমনকি অত্যন্ত ভক্তির সাথে পাকিস্তানী দুইশত রুপি এবং একটি কাগজের টুকরো দিচ্ছেন।

বিষয়টি স্বপ্ন ছিল বলে তেমন গুরুত্ব দেইনি। কারণ হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী রহ. এর অভিমত হল– 'জাগ্রত অবস্থার ফিকির করা চাই, স্বপ্নের কী গ্রহণ যোগ্যতা আছে।'

কিন্তু হলো এমন যে, ২৯ রমযান বাদ যোহর নিয়ম অনুযায়ী মসজিদ শরীফে লোকেরা শয়ন করতে লাগল। তখন পুলিশ

এসে সবাইকে উঠিয়ে দিল। পবিত্র রমযানে সাধারণ নিয়ম হলো, লোকেরা ফজর ও যোহরের নামাযের পর শুয়ে পড়ে। সাধারণত রাতে সবাই জাগ্রত থাকে আর দিনে আরাম করে। কিন্তু ওই দিন সাধারণ নিয়ম হতে সরে এসে সবাইকে জাগিয়ে দিল। অথচ শেষ দশকে ইতিকাফকারীগণও থাকেন। তাদেরকেও ঘুমাতে দেয়নি। এমনকি কতেকের খাট ও চৌকি ইত্যাদি সরিয়ে হারাম শরীফের বাহিরে ফেলে দেয়া হলো। আর– مَا فِيْ فُنْدَقِ، مَا فِيْ مُسْتَشْفٰى এর আওয়াজ শুনিয়ে দেয়া হলো। যা হোক সকল মানুষ পেরেশান ছিল যে, আজ এমনটি কেন হলো। আমরা বাবুস্ সালামের নিকটবর্তী খুটির পাশে বসেছিলাম। সেখানে মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব মা.জি. শাইখুল হাদীস জামিয়া খাইরুল মাদারিস-মুলতান তাশরীফ নিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'জায়গাটুকু লক্ষ রেখ, আমি ওজু করে আসছি।' আমার তখন কুরআনুল কারীম খতম হওয়ার শেষ প্রান্তে ছিল। আর মাত্র কয়েক পারা বাকি ছিল। সেগুলো পড়তে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে আমার নিকট একজন ব্যক্তি আগমন করলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব (দা.বা.) যিনি মুলতানের বাসিন্দা– তিনি কোথায়? আমি বললাম, তিনি ওযু করতে গিয়েছেন। এখনই এখানে চলে আসবেন। লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পরিচয় কি? আমি বললাম, আমার নাম মুহাম্মদ ইদ্রিস। অন্য কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি নিজেই বলে উঠলেন, হুশিয়ারপুরী? আমি আজর করলাম, জ্বি হ্যাঁ। সাথে সাথে এও জিজ্ঞেস করলেন, খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম আপনি সংকলন করেছেন? আমি আরজ করলাম, শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ, অন্যথায় এ নাম ধারণ করার যোগ্যও আমি নই। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন, কিতাব দেখে মনে হয়েছিল কোনো বয়স্ক মানুষ সংকলন করেছেন। কিন্তু আপনি তো আমাদের সমবয়স্ক। তিনি আরো বলতে লাগলেন, ভালোই হলো আপনার সাথে এখানে সাক্ষাথ হয়ে গেছে। অন্যথায় উমরা পালনের পর আমার পাকিস্তান যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এবং চিন্তা-ভাবনা ছিল যে, মুলতানে গিয়ে আপনার সাথে মুলাকাত করব। তিনি খুতুবাত সম্পর্কে

নিজের প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, খুতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডটি আমার একজন সম্মানিত বন্ধু– জামিয়া ইসলামিয়া আল্লামা বিনূনুরী, করাচি থেকে আফ্রিকার মরিশাশে পাঠান। আমি তা মুতালায়া করেছি। ফলে আমার উপর কিতাবটির কিছু প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

প্রথমত, তাসাওউফ সম্পর্কে আমার কুধারণা ছিল। সুফিয়ানে কেরাম অথবা আহলে তাসাওউফদের প্রতি আমার কোন প্রকার মহাব্বাত ও বিশ্বাস ছিল না। উক্ত কিতাবটি অধ্যায়ন করার পর বান্দার শুধু কু-ধারণাই দূর হয়নি বরং সুধারণা তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমার ভিতর অতিরিক্ত রাগ ছিল, যা অনেক নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং স্বাভাবিক হয়েছে।

তৃতীয়ত, যত দিন থেকে কিতাব অধ্যায়ন করেছি তারপর থেকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা গুরুত্বসহ রাখতে পারছি।

উক্ত কল্যাণকর কর্মসমূহের তাওফিক পাওয়ার কারণে কিতাবের সংকলকের সাথে মুহাব্বাত ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ফিত্বরিভাবে সৃষ্টি হয়। এই কারণে আকাঙ্খী ছিলাম যে, পাকিস্তান সফরে আপনার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবো।

আমি আরজ করলাম, এ তো আপনার কল্যাণকর ত্ববিয়ত এবং উন্নত জন্মগত স্বভাবের ফল যে, আপনি কিতাব থেকে এতগুলো ফায়দা অর্জন করেছেন। আল্লাহ মালুম! আমি যে কতবার উক্ত কিতাব অধ্যায়ন করেছি এবং ক্যাসেট থেকে শুনেছি কিন্তু আমি নিজেই উক্ত পবিত্র প্রভাব গ্রহণ করতে পারিনি।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার সাথে বসেছিলেন এবং আপন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে পঞ্চাশ রিয়াল হাদিয়াস্বরূপ দিলেন। তাঁকে বললাম, আমরা উভয়ে সফরে রয়েছি। টাকা তো সীমিত থাকে। সফরে প্রয়োজন দেখা দেয়। আপনি এহেন বাহ্যতা প্রদর্শন করবেন না। তারপর উক্ত কিতাব তো আপনার নিকট ক্রয় করেই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, আপনি তা গ্রহণ করেন।

সেই যুগে পাকিস্তানী চার রুপি এক রিয়াল সমান হতো। তখন আমার খেয়াল হলো এতো মদিনা মুনাওয়ারার ওই স্বপ্ন যার ব্যাখ্যা আজ পুরো হচ্ছে। অতঃপর মদিনা মুনাওয়ারার সাথে

সম্পর্কের কারণে তা গ্রহণ করে নিলাম এবং মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

তারপর তিনি বললেন, আমার আরো কিতাব প্রয়োজন। তাকে বললাম, আপনার ঠিকানা দিন। টাকা পাঠিয়ে দিবেন, সে মোতাবেক কিতাব পাঠিয়ে দেব। তিনি আমাকে তার ভিজিটিং কার্ড দিলেন। তখন স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশটিও পূরণ হয়ে গেল যে, সেখানে কাগজ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল এড্রেস কার্ড।

উক্ত স্বপ্ন মদিনাতুর রাসূল সা. এ সংঘটিত হওয়া এবং ওখানেই তার পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশ পাওয়ার কারণে খুতুবাত সংকলন কবুল হওয়ার আশা জাগে এবং মন চাইল যে উক্ত খুশির মধ্যে পাঠক মহলকে শরীক করে দোয়ার ভাগী হই।

তবে জানা থাকা ভালো যে, স্বপ্ন শরীয়তের দলিল নয়। কিন্তু-

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য সুসংবাদ।

এখানে তো স্বপ্নের ব্যাপারেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেন এ কিতাবকে আমাদের সকলের জন্য সুসংবাদ বানিয়ে দেন।

যা হোক, খুতুবাতে হাকীমুল ইসলামের ১০ম খণ্ড আপনাদের সামনে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে যে চেষ্টা ও অনুসন্ধান করা হয়েছে তা কবুল হওয়ার জন্য সবার নিকট দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ যেন ১১তম খণ্ডটি প্রকাশ করার সৌভাগ্য নসীব করেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ - وَالسَّلَامُ

মুহাম্মাদ ইদ্রিস হুশিয়ারপুরী
খুতুবাতে হাকীমুল ইসলামের সংকলক
২৫ জমাদাল আউয়াল ১০১৪ হিজরী
১০ নভেম্বর ১৯৯৩ ঈসায়ী
রোজ বুধবার

কালিমাতে তাবাররুক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ

বারাকাতুস সালফ, হুজ্জাতুল খালফ হাকীমুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব-এর মতো ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্বের নাম যুক্ত হওয়াই মাওয়ায়েজ ও খুতুবাত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। উলুম ও মারেফাতসম্বলিত এই মর্যাদাপূর্ণ বয়ানসমূহ আহলে ইলম, খতিবগণ, আইম্মায়ে মাসাজিদ, বক্তা ও মুবাল্লিগদের জন্য ইলম ও হিকমতের বিরাট ভাণ্ডার। শিরোনাম যুক্ত করার কারণে বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গম করা অতি সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, অত্র কিতাবটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করেছি এবং বেশ কিছু স্থানে সংশোধনের জন্য চিহ্ন দিয়েছি।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

আমার স্নেহের মৌলভী হাফেজ কারী মুহাম্মাদ ইদ্রিস [ফাযেলে জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান] সাহেব দিন-রাত অবিরাম মেহনত ও অনুসন্ধান করে এটি সাজিয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে আজ তা কিতাব আকারে পাঠক মহলের সামনে এসেছে। অন্তর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ যেনো প্রিয় সংকলকের এই মেহনত ও কুরবানীকে স্বীয় রেজামন্দির মাধ্যম বানান এবং নিজ পক্ষ হতে তাকে অগাধ প্রতিদান প্রদান করেন। সাথে সাথে ইলম ও আমলে, সুস্থতা ও জীবনে বরকত দান করে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে দীনের আরো

অধিক শক্তিশালী ও মজবুত সেবা করার তাওফিক দান করুন আর আমাদের সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

جَزَاكَ اللهُ يَا اِدْرِيْسَ خَيْرًا

عَلٰى مَا صَنَعْتَ لِاَهْلِ الدِّيْنِ خَيْرًا

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী
১১/০৩/১৪১১ হিজরী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১
নবীয়ে উম্মী / ৩১
ভূমিকা / ৩৩
বয়ানের আলোচ্য বিষয় / ৩৪
নবুওয়তের দাবি ও তার দলিল / ৩৫
নবুওয়ত মানবসমাজের ইলমের মাধ্যম / ৩৬
জাগতিক ইলমের মাধ্যমও নবুওয়ত / ৩৭
নবীদের উস্তাদ / ৩৮
নবুওয়ত ও তবিয়ত / ৪০
নবুওয়ত ও শিশুকাল / ৪১
ঘরোয়া মাধ্যমে তালিম বন্ধ রেখে উম্মিয়াতের হেফাজত / ৪৪
জাতীয় শিক্ষা মাধ্যম বন্ধ রেখে উম্মিয়াতের হেফাজত / ৪৭
প্রেরণের স্থান হিসেবে উম্মিয়াতের হেফাজত / ৪৮
উম্মিয়াত নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ / ৪৯
ওহী ও আকলের মাঝে পার্থক্য / ৫০
নবীদের আকলের উন্নতি ও উচ্চতা / ৫১
নবী করীম সা.-এর বুদ্ধিদীপ্ত কারনামা / ৫২
উম্মিয়াতকে গৌরবময় স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে / ৫৪
যেমন মিশন তেমন ইলম / ৫৫
ঈসায়ী মিশনের প্রেক্ষাপট / ৫৬
মুসাবী মিশনের প্রেক্ষাপট / ৫৬
উম্মি নবী পাঠানোর পটভূমি / ৫৭
খাতামুন নাবীয়্যিনের জন্য পরিপূর্ণতা আবশ্যক / ৫৯
উম্মি নবীর দীনের বৈশিষ্ট্য / ৬১
উম্মি নবীর ইলমের শান হলো জমইয়্যাত / ৬২

বয়ান : ২
বিপ্লবের পথনির্দেশ / ৬৩
বাস্তব অবস্থা / ৬৬
বক্তার প্রভাব প্রকাশের মাধ্যম / ৬৬
ইবাদাতের উদ্দেশ্য / ৬৬
তেলাওয়াত সর্বোচ্চ সৌন্দর্য অর্জনের মাধ্যম / ৬৮
জীবনের বিধান / ৬৮
কুরআনের শব্দাবলি আল্লাহর কামালাতের প্রকাশস্থল / ৬৯
আল্লাহর রজ্জু এবং তা ধারণ করার কর্মপদ্ধতি / ৭০
আযমত ও মহব্বতের তাকাজা / ৭১
কেয়ামত দিবসে গুণ হিসেবে বিভক্ত হবে / ৭২
আলেমদের পরকালীন মাকাম / ৭৪
কুরআনুল কারীমের তাজাল্লি প্রকাশের ব্যবস্থাপনা / ৭৪
কুরআনুল কারীম ইনকিলাবের কিতাব / ৭৫
মহিলাদের মাঝে ইনকিলাব / ৭৭
কুরআনুল কারীমের বরযখে ইনকিলাব সৃষ্টি করা / ৭৯
মহা ইনকিলাব / ৮১
সাহাবাদের ইনকিলাবের নমুনা / ৮২
খারাপ ইনকিলাব / ৮৩
জিন জাতির মাঝে ইনকিলাব / ৮৩
সাহাবাদের মাঝে কুরআনুল কারীমের
ইনকিলাবের একটি ঝলক / ৮৫
কুরআন বড় ও মহান ইনকিলাবের উৎসস্থল / ৮৬
সঠিক ইনকিলাবের আশায় উল্টো পথে দৌড়ঝাঁপ / ৮৭
কিতাবি ইনকিলাবের শিক্ষাপদ্ধতি / ৮৭
কিতাবী ইনকিলাবের তরবিয়ত পদ্ধতি / ৮৮
রাসূল সা.-এর শিক্ষাপদ্ধতি ও আমলি হেকমত / ৮৮
মোবারকবাদ প্রদান / ৮৯

বয়ান : ৩
কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা / ৯১
অন্ধকার আলয়ে আলোকিত চেরাগ / ৯৩
হায়াতের উৎসস্থল / ৯৪
সুপার পাওয়ার তথা পরাশক্তিগুলোকে পরাস্ত করার বুনিয়াদী কারণ / ৯৫
হাফেযে কুরআনের বাতিল হতে হেফাযত / ৯৭
হাফেযে কুরআন অমর / ৯৮
হাফেযে কুরআনের পিতাকে মুকুট পরিধান করানো / ৯৯
কুরআনুল হাকীমের সর্বকালীন হুকুমত / ১০০
কুরআনুল কারীমের প্রভাব অনন্তকাল বহাল থাকার কারণ / ১০১
হাফেযে কুরআনের সুপারিশের অধিকারী হওয়া / ১০২
অনন্তকাল মাথা উঁচু থাকা / ১০৩
কুরআনুল কারীমের আযমত / ১০৩
মহব্বতের নজর / ১০৩
বরকতের উপর বরকত / ১০৪

বয়ান : ৪
অল ইন্ডিয়া আহনাফ কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ / ১০৭
কৃতজ্ঞতা ও ভূমিকা / ১০৯
খুতবা রচনার উদ্দেশ্য / ১১০
আল্লাহর কাজ ও তাঁর কালাম / ১১১
তাকভিন ও তাশরি-এর উৎপত্তি ও পুনরুত্থান একই জাত / ১১১
তাকভিন ও তাশরির মূলনীতিও এক / ১১২
ইজাদ ও ইজতিহাদ / ১১৬
ইজতিহাদের প্রকারভেদ / ১১৭
মুজতাহিদের কাজ হলো হাকিকত উদঘাটন / ১১৭
শরীয়ত চূড়ান্ত পর্যায়ে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত / ১১৯
তানযিমে শরীয়তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত / ১২১
উলুম উন্মোচিতকরণে নবী ও উম্মতের মাঝে পার্থক্য / ১২৫
কিতাব ও সুন্নাহর নুসুসের জাহের ও বাতেন / ১২৮
উলামায়ে শরীয়তের দুটি স্তর : আহলে জাওয়াহের
এবং আহলে বাতেন / ১৩১
সাহাবাদের মাঝে আহলে ইলমদের দুটি তবকা / ১৩৪

ইজতিহাদী যোগ্যতা আল্লাহপ্রদত্ত, অর্জিত নয় / ১৩৭
ইলমে বাতেনই প্রশান্তির মূল / ১৩৯
সাহাবাদের মাঝে আহ্‌লে ইজতিহাদ / ১৪২
উম্মতের মাঝে যদি ইজতিহাদ আবশ্যক হয়
তাহলে তাকলিদও আবশ্যক / ১৪৬
সাহাবাদের মাঝেও তাকলিদের প্রচলন ছিল / ১৪৮
ইজতিহাদ ও তাকলিদের সীমারেখা / ১৪৯
এক শ্রেণীর ইজতিহাদ সমাপ্ত হয়েছে; তার সুস্পষ্ট প্রমাণ / ১৫১
খতম হওয়া ইজতিহাদ ব্যবহারে মন্দ পরিণতি / ১৫৩
ইমামদের মতানৈক্য রহমাতের কারণ / ১৫৬
ফিকহী মাসায়েল সংকলন নিন্দনীয় হতে পারে না / ১৬১
ফিকাহ অনুসারীদের উপাধি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উৎসমূল / ১৬২
ইখতিলাফী মাসায়েলে একক ব্যক্তিসত্তার তাকলিদ আবশ্যক / ১৬৬
কেমন তাকলিদে শখসী উদ্দেশ্য এবং তা কেন জরুরি / ১৬৮
ইমামদের ইখতিলাফী রুচিবোধ থেকে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন মূলনীতি / ১৭৪
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকাহর কয়েকটি নমুনা / ১৭৫
তাকলিদ না করা অথবা বিপরীতমুখী তাকলিদে চলার কারণে
কয়েকটি প্রকাশ্য বাহ্যিক ক্ষতি / ১৮৭
পূর্বসূরীদের মাঝে নির্ধারিত তাকলিদ ব্যাপক ছিল / ১৯১

বয়ান : ৫
ইসলামি আযাদীর পরিপূর্ণ প্রোগ্রাম / ২০১
ভূমিকা / ২০২
আমার সবচেয়ে বড় ইজ্জত ও সৌভাগ্য / ২০৯
পুরাতন আলোচনা / ২১০
সংক্ষিপ্ত পয়গাম / ২১১
পয়গাম এবং তার দফাসমূহ, বৃটিশদের হঠকারিতা / ২১১
গোলামির কারণসমূহ / ২১২
ইলমের বিনাশ / ২১৪
বাহ্যিক ও প্রথাগত মর্যাদা ধ্বংস / ২১৬
অর্থনৈতিক ধ্বংস / ২১৭
বহির্সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত / ২১৭
বৃটিশদের কর্মপদ্ধতি / ২১৮

মুসলিমদের শিক্ষা পদ্ধতি ধ্বংস করার বৃটিশ ষড়যন্ত্র / ২১৯
বৃটিশদের লুটতরাজ / ২২১
ভারতীয় মুসলিমদের মুসলিম জাহানের সাহায্য থেকে
বঞ্চিত রাখার জন্য বৃটিশদের ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন / ২২৪
স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলিমদের বদনাম রটানোর স্কিম / ২২৫
বুনিয়াদী সমস্যা / ২২৬
স্বাধীনতার প্রচেষ্টা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব / ২২৭
স্বাধীনতা লাভের প্রোগ্রাম / ২২৭
বৃটিশদের গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতা / ২২৯
নবীসুলভ নেতৃত্বের প্রয়োজন / ২৩০
লুণ্ঠনকারী জাতির সাথে জিহাদের হুকুম / ২৩১
অহিংসার মাধ্যমে প্রতিবাদ / ২৩২
অসহিংস প্রতিবাদের পাঁচটি হাতিয়ার / ২৩৩
ইউরোপের গোলামি হতে মুক্তি লাভের পথ / ২৩৪
সম্মিলিত কর্মের প্রয়োজনীয়তা / ২৩৫
নেতৃত্বের মাপকাঠি / ২৩৬
স্মারকলিপি পেশ করার ভিত্তি / ২৩৬
হুকুমত ও জাতির মাঝে বোঝাপড়া প্রয়োজন / ২৩৭
নেতার চালচলন বা রীতিনীতি / ২৩৮
ফেরাউনি নেতৃত্ব ও শক্তির সঙ্গে কথোপকথনের পদ্ধতি / ২৪০
উচ্চ আওয়াজে দাবি পেশ করার নিষেধাজ্ঞা / ২৪২
মুসলিম নেতাদের প্রাথমিক দায়িত্ব / ২৪৩
আলেমদের জন্য কেন নেতৃত্বআবশ্যক / ২৪৪
রিসালাতের ভাষ্যকারদের মারেফতের বাহক হওয়া উচিত / ২৪৬
নবুওয়ত নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক / ২৪৭
ক্ষমতার দম্ভে বৈধ দাবিসমূহ অস্বীকারকারীদের পরিণতি / ২৪৮
ধারাবাহিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিশ্চিত ফলাফল হয় / ২৫২
স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা / ২৫৫
যুগের ফেরাউনকে মুসুভী আদর্শের নেতৃত্বই পরাজিত করতে পারে / ২৫৭
ইসলামি স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও ফলাফল / ২৬০
স্বাধীনতার দাবি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে হওয়া উচিত / ২৬৩
ইসলামি স্বাধীনতার দুটি পথ / ২৬৬
স্বাধীনতার দাবির পক্ষে দলিল আবশ্যক / ২৬৮
আমীর নির্বাচন ও কেন্দ্রিকতা গঠন / ২৭২

নেককারদের নেতৃত্ব হতে বিদ্রোহ করার পরিণাম / ২৭৫
মিশ্র সমাজে মুসলিম সংগঠনের দুটি মূলনীতি / ২৭৬
অমুসলিমদের সঙ্গে সম্মিলিত আন্দোলন / ২৭৭
আন্তর্জাতিক মানের মাকসাদ পূরণে কর্মপন্থা / ২৭৭
পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি একই উদ্দেশ্যে এবং
কর্মবণ্টনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত / ২৭৯
জমিয়তে উলামার স্বতন্ত্র্য মর্যাদা / ২৮০
বোঝা ও বুঝিয়ে দেওয়ার পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা / ২৮১
স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম / ২৮২
শরয়ী রাজনীতির সম্মান / ২৮৬

বয়ান : ৬
মানবতার পূর্ণতা / ২৮৭
পূর্ণতার উৎসব / ২৮৯
আরম্ভ ও সমাপ্তির আনন্দ / ২৯০
তাকমিলপ্রিয় উম্মত / ২৯০
মানবতার শিশুকাল ও তাদের প্রাথমিক জ্ঞান / ২৯১
প্রাথমিক ইবাদাত / ২৯২
বিশ্বমানবতার দ্বিতীয় যুগ ও তাদের জ্ঞান / ২৯২
মানববিশ্বের তৃতীয় যুগ ও তাদের ইলম / ২৯৪
মুসা আ.-এর যুগ ও তার ইলম / ২৯৪
আহকামের মূল তথ্যের যুগ / ২৯৪
নবী আ.-এর যুগ মানুষের ইজতিহাদের যুগ / ২৯৫
উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে নবুওয়তের প্রভাব / ২৯৬
আমল ও বানানো শরীয়ত / ২৯৭
বিশ্বমানবতার যৌবনকাল / ২৯৮
মানবজগতের শিশুকালের শিক্ষাব্যবস্থা / ২৯৯
মানবজগতের যৌবনকালের শিক্ষানীতি / ৩০০
বিশ্ব মানবতার বৃদ্ধকাল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিকরণ / ৩০১
বৃদ্ধকালে ইলমের প্রশস্ততা / ৩০১
বৃদ্ধ উম্মতের উপর হতে আমলের বোঝা কমানো হয়েছে / ৩০২
দীনের পূর্ণতা / ৩০৩
সমাপ্তি অধিক আনন্দ ও খুশির বস্তু / ৩০৩

সমাপ্তি ও পূর্ণতার তামান্না / ৩০৫
পূর্ণতাদিবস নির্বাচন / ৩০৫
একদিকে সমাপ্তি অপরদিকে সূচনা / ৩০৬
উলুম ও ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ / ৩০৬
মোবারকবাদ জ্ঞাপন / ৩০৭
হুসনে নিয়তের ফলাফল / ৩০৮
সত্যবাহী পূর্বসূরী পাঠানোর ওয়াদা / ৩০৮
ব্যক্তিত্ব নির্বাচন ও পছন্দ করার প্রয়োজনীয়তা / ৩০৯
নির্বাচনের মানদণ্ড / ৩১০
সর্বসাধারণের দলিল / ৩১০
আলেমদের একতা জরুরি / ৩১১
সত্য অন্বেষণ করা / ৩১২

বয়ান : ৭
হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. / ৩১৩
হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ. / ৩১৫
বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় / ৩১৫
ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভ ও মুসলিমদের পরাজয় / ৩১৫
ধর্মীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা / ৩১৬
এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামি ইউনিভার্সিটি / ৩১৭
আরবী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি / ৩১৭
তুর্কী খেলাফতের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব / ৩১৯
কাসেমী চিন্তাধারার তিনটি বুনিয়াদি উপাদান / ৩১৯
হযরত নানুতুবী রহ.-এর ইউরোপ ভ্রমণের তামান্না / ৩২০

বয়ান : ৮
ইলম ও হেকমতের ঝর্ণাধারা / ৩২১
বাস্তব চিত্র / ৩২১
অলীদের মাযারে উপস্থিতি ও উলামায়ে দেওবন্দ / ৩২১
কবর যিয়ারত নিষেধকারীদের সাথে যুদ্ধ / ৩২৪
কবর যিয়ারতের জন্যে ভ্রমণ / ৩২৪
তাজিম জায়েয, ইবাদাত জায়েয নেই / ৩২৭
শিরকী নাম থেকে পরহেয করতে হবে / ৩২৯

আউলিয়া কেরামদের তাজিম / ৩২৯
গাইরুল্লাহর জন্যে আংশিক ইবাদাতও জায়েয নেই / ৩৩০
কিয়াম ও সিজদার নিষেধাজ্ঞা / ৩৩০
কবরে সিজদা করা নিষেধ / ৩৩১
দরুদ শরীফ ব্যাপক করার হেকমত / ৩৩১
কবর যিয়ারতের আদবসমূহ / ৩৩২
রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়তে সফর / ৩৩২
উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অহেতুক উত্তেজনা / ৩৩৩
ইসালে সাওয়াব নিষেধের অভিযোগ / ৩৩৪
আম্বিয়া আ.দের কবরের জিন্দেগী / ৩৩৫
আলামাতে হায়াত / ৩৩৬
হায়াতের দলিল-প্রমাণ / ৩৩৭
নযর-নিয়ায বা ইসালে সাওয়াব / ৩৩৮
মুশরিকসুলভ নযর-নিয়ায / ৩৪০
যাবিহা নির্দিষ্টকরণ / ৩৪১
হাদিয়া, যিয়াফত বা ইসালে সাওয়াবের সদকা / ৩৪২
ইসালে সাওয়াবের জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্টকরণ / ৩৪৩
দাওয়াম ও ইলতিযামের পার্থক্য / ৩৪৪
সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা / ৩৪৫
চেহলাম-বার্ষিকী হিন্দুয়ানা প্রথা / ৩৪৬
উপমহাদেশের মুসলমানদের রসম পালনের কারণ / ৩৪৬
হিন্দু-মুসলিম সংমিশ্রণের প্রভাব / ৩৪৭
দীন ও রেওয়াজের পার্থক্য / ৩৪৮
ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক নিয়তের উপর / ৩৪৯
ইসালে সাওয়াবের সঠিক পন্থা / ৩৪৯
ইলমে গায়েবের বিতর্ক / ৩৫১
উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা / ৩৫২
উলামায়ে বেরেলির দাবির খণ্ডন / ৩৫২
উলামায়ে দেওবন্দের দাবি / ৩৫৩
নামাযের পর মুসাফাহা / ৩৫৪
নামাযের পর দ্বিতীয় দোয়া / ৩৫৫
হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ. ব্যক্তিত্ব ও কর্ম / ৩৫৭
আমার সৌভাগ্য / ৩৫৭
ইলমি রুচিবোধের রং ও ধরন / ৩৫৭

ফায়দাসমূহ / ৩৫৮
তাকরীর ও বয়ানের ধরন / ৩৫৮
শিক্ষাদান পদ্ধতি / ৩৫৯
চারিত্রিক গুণাবলি / ৩৬০
সত্যপ্রিয়তা / ৩৬১
রচনাপদ্ধতি / ৩৬২
কবিতা ও ছন্দ রচনা / ৩৬৩
রাজনৈতিক অবদান / ৩৬৪
কৃতিত্বের স্বাক্ষর / ৩৬৫
আদেশ পালন / ৩৬৬

বয়ান : ১

নবীয়ে উম্মী

পরিবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা প্রদানকারী উস্তাদ কেউ ছিল না। বংশে বা গোত্রে কোন শিক্ষক ছিল না। দেশে ইলমের চর্চা ছিল না। মোটকথা, ইলমি কোন উসিলা বা মাধ্যম ছিল না। উম্মিদের দেশ ছিল। ছিল নিরক্ষরদের দেশ। তাদের মাঝে এমন এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যিনি এত বড়-বড় জ্ঞানগর্ভ কথা পেশ করেন যে, তাঁর ইলম দেখে জগদ্বাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তিনি শুধু ইলমই পেশ করেননি; বরং এত মহান কানুন ও সংবিধান দুনিয়াবাসীর সম্মুখে পেশ করেন, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও শাখাকে পরিবেষ্টন করে। আর তা এমতাবস্থায় পেশ করেন, যখন তিনি নিজে পড়ালেখা জানেন না, তাঁকে কেউ পড়াননি। আবার দেশেও লেখাপড়ার কোন চর্চা ছিল না। পরিবারে, সমাজে ও বংশে কোন আলেম বিদ্যমান ছিল না। এতদসত্ত্বেও এমন ইলম পেশ করেন যে, আলেমরা তাঁর ইলম দেখে হতবাক হন, থ খেয়ে যান। বুদ্ধিমানরা অপারগ ও অক্ষম হয়ে যান, হার মেনে নেন, মাথা নত করেন। সুতরাং এত বড় আলেম পড়ালেখা ছাড়া, কোন উস্তাদ ছাড়া! নিশ্চয়ই তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ শিখিয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। বাস্তবে উম্মি হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়ার দলিল।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا○

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

পবিত্র মসলিসে আপনারা সীরাত শ্রবণের জন্য সমবেত হয়েছেন। আর সীরত কার? আমার আপনার নয় অথবা সাধারণ কোন ব্যক্তির নয়। বরং মানবকূলের সর্দার এবং আকায়ে দোজাহান জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত শ্রবণের জন্য আগমন করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত সুস্পষ্ট। আপনারা নবী হিসেবে সীরাত শ্রবণ করতে চান। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে দুটি সাইড রয়েছে। একটি হলো তিনি একজন মানুষ। অপরটি তিনি হলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আপনারা এখানে শুধু মানবিক সীরাত শ্রবণের জন্য আসেননি; বরং নবীসুলভ সীরাত জানার ও শোনার জন্য এসেছেন। অর্থাৎ নবুওয়তি সীরাত আপনাদের মূল উদ্দেশ্য। নবুওয়তি সীরাত আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে না যদি আপনাদের সামনে নবুওয়তের কিছু মর্ম সুস্পষ্ট হয়। যখন নবুওয়ত সম্পর্কে অবগত হবেন, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীরাত আপনাদের সামনে খুলে যাবে। উক্ত কারণে আমি আপনাদের সামনে এ আয়াত তেলাওয়াত করেছি।

বয়ানের আলোচ্য বিষয়

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়তের দাবি করেছেন। তারপর নবুওয়তের দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারপর নবুয়াতের অংশের প্রতি ইশারা করেছেন। তারপর নবুওয়তের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করেছেন। যেই কারণে বিবদমান বক্তৃতার কয়েকটি অংশ হবে– ১. নবুওয়তের দাবি। ২. নবুওয়তের দলিল। ৩. নবুওয়তের অংশাবলি যে, তার অংশগুলো কী-কী এবং কেন কোন বস্তুর উপর নবুওয়ত অন্তর্ভুক্ত। ৪. নবুওয়তের হাকিকত কী? ৫. পৃথিবীতে নবুওয়ত আসার উদ্দেশ্য কী? এ কয়েকটি অংশ বর্তমান তাকরীবের আলোচ্য বিষয়। আর উক্ত আয়াতের আলোচ্য বিষয়ও একই।

অতএব, আজকের তাকরীর মূলত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর। আয়াতটি অনেক উলুমের সমষ্টি। আমাদের মতো মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই যে, ওই ইলম ও মারেফতকে বর্ণনা করে ফেলব অথবা বয়ানের হক আদায় করব। কিন্তু উক্ত সমস্ত আলোচ্য বিষয় সামান্য-সামান্য আলোকপাত করার ইচ্ছা রাখি।

নবুওয়তের দাবি ও তার দলিল

প্রথম বিষয় হলো নবুওয়তের দাবি। আল্লাহ তায়ালা নিজে দাবি করেছেন–

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا

আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি উম্মি ও নিরক্ষরদের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছেন। *[সূরা জুমুআহ : আয়াত ২]*

এখানে প্রেরণ করার দাবি মূলত নবুওয়তের দাবি। আল্লাহ পাক যাকে পাঠান তিনি নবী হন, রাসূল হন। এখানে তো শুধু দাবি হলো, আমি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। কিন্তু রিসালাত নবুওয়তের দলিল কি? যে পবিত্র সত্তা প্রেরিত হয়েছেন এবং যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক দাবি করেছেন, আমি আমার রাসূল পাঠাচ্ছি। আবার স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাবি করছেন, আমি আল্লাহর রাসূল।

قُلْ یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا

হে লোক সকল! চাই তারা কোন দেশের বাসিন্দা হোক বা কোন জাতির সদস্য হোক অথবা কেয়ামত পর্যন্ত আগত ব্যক্তি হোক। আমাকে সকলের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। *[সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৮]*

অতএব, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দাবি করছেন, আমি রাসূল পাঠিয়েছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দাবি করছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল বনে এসেছি। উক্ত দাবির প্রমাণ কী যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত ও রিসালাতকে স্বীকার করা হবে? আর তা একটিই। তাহলো, 'উম্মিদের মাঝে উম্মি রাসূল এসেছেন।' অর্থাৎ নিরক্ষরদের মাঝে এমন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি পড়ালেখা জানেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরক্ষর হওয়া প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের দলিল।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিরক্ষর হওয়া তো দূষণীয় বিষয়। কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে যদি একথা বলি যে, তুমি নিরক্ষর, মূর্খ, লেখাপড়া জান না, তাহলে সে নিজের জন্য অপমান জ্ঞান করবে। নিরক্ষর হওয়া, পড়ালেখা না জানা বাহ্যিক নজরে কোন কামাল নয়। সমাজ একে তুচ্ছ মনে করে, দূষণীয় মনে করে। এখানে এত বড় পদমর্যাদার জন্য দলিল বর্ণনা করা হচ্ছে, যে পদপর্যাদা হতে বড় কোন পদমর্যাদা পৃথিবীতে নেই। অতএব, উক্ত

দাবি ও দলিলের মাঝে সম্পর্ক কী যে, তিনি নিরক্ষর এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়? সুতরাং আমি বলি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরক্ষর ও উম্মি হওয়া-ই দলিল, তিনি সবচেয়ে বড় আলেম এবং মানবজগতের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান আর সকল মানুষের মধ্য হতে উত্তম ও সম্মানিত মানুষ। কারণ, নবীগণ আ. জগতে ইলম শেখার জন্য আসেন না। শেখানোর জন্য আসেন। দুনিয়াতে তাঁদের কেউ উস্তাদ হয় না। তারা সরাসরি আল্লাহ পাক থেকে ইলম গ্রহণ করেন এবং মাখলুককে প্রদান করেন। নবীগণ কারো শাগরেগ হন না। স্রেফ আল্লাহ তায়ালা তাদের উস্তাদ হন। তারপর তাঁরা দুনিয়াবাসীকে নিজেদের শাগরেদ বানান। ছাত্র বানান। সারকথা, নবীগণ পৃথিবীতে ইলম দিতে প্রেরিত হন, ইলম অর্জন করার জন্য নয়।

নবুওয়ত মানবসমাজের ইলমের মাধ্যম

জগতে এমন কোন ইলম নেই, যার বুনিয়াদ নবীগণ কায়েম করেননি। অর্থাৎ আখেরাতের ইলম হোক, পরকালের ইলম হোক, জীবিকার হোক, অর্থনীতির হোক, সমাজ বিজ্ঞানের হোক; মোটকথা, যে কোন প্রকারের ইলম হোক সকল ইলমের বুনিয়াদ নবীগণ স্থাপন করেছেন। প্রথমে আমার মেধায় একটি দলিল ভেবেছি যে, মনে হয় বা সম্ভবত এটি আমার নিজস্ব বুঝ। আর তা হলো এই যে, কুরআনুল কারীমের মাঝে সকল মানব সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا

> আমি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছি এমতাবস্থায় যে, তোমরা সামান্য পরিমাণ ইলম রাখতে না। *[সূরা নাহল : আয়াত ৭৮]*

মানুষ পৃথিবীতে ইলমহীন এসেছিল, মায়ের পেট থেকে কোন ইলম নিয়ে আসেনি। সবাই মূর্খ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে।

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا

আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও নিয়ম অনুসারে এখানে নাকেরাহ তথা অনির্ধারিত অর্থবোধক শব্দটি নাফী বা নাবাচক শব্দের অধীনে এসেছে, যার অর্থ আম বা ব্যাপক। অর্থাৎ মানুষ সামিান্য পরিমাণ ইলম নিয়ে আসে না। যখন জন্ম

গ্রহণ করে, তখন একটি গোস্তের টুকরোর মতো থাকে। তাতে না আছে উপলব্ধি, না আছে আকল, না আছে ইলম। শুধু আছে অনুভূতি। যখন মানুষ দুনিয়া ত্যাগ করে, সে অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا

অতঃপর আমি তোমাকে এমন বয়সে পৌঁছে দেই, যা নিষ্কর্মা বয়স। পড়ালেখা জানা থাকা সত্ত্বেও তোমরা মূর্খ হয়ে যাবে, ইলম থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞ বনে যাবে। *[সূরা নাহল : আয়াত ৭০]*

যখন মানুষ অকর্মা বয়সে পৌঁছে, তখন মুখস্থ শক্তি বিদায় নেয়। তো প্রথমে ইলম খতম হয়। চাই তাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হোক। তখন নতুন করে কোন ইলম অর্জনের সুরত বাকি থাকে না। তখন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে পূর্বের ইলমের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ভবিষ্যতে আসার কোন পথ ও পন্থা-প্রক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না। তখন যেমন উম্মি এসেছিল, তেমনি চলে যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এখানে একথা ঘোষণা করছেন যে, যখন তোমরা জগতে এসেছিলে, তখন আলেম ছিলে না। আর যখন যাওয়ার পালা, তখনও ইলম নেই। অতএব, ইলম তোমাদের সত্তাগত বস্তু নয়। যদি হতো, তাহলে মায়ের পেট থেকে পেতে আর কবর পর্যন্ত তোমার সাথে যেত। ইলম আমার– যতদিন মন চায় তোমার ভেতর ঢেলে দেই। আর যখন চাই বের করে নেই। অতএব, কোন মানুষের সত্তার মাঝে ইলম নেই। সুতরাং সকল মানুষকে এমন ধরে নেওয়া হলে জগদ্বাসীর নিকট ইলম থাকে না। অতএব, ইলমের উৎসস্থল একমাত্র আল্লাহর সত্তা।

জাগতিক ইলমের মাধ্যমও নবুওয়ত

মানুষ পশুদের থেকে তো ইলম অর্জন করতে পারে না। কারণ, পশুরা মানুষ হতে নিম্নমানের প্রাণী। তেমনি জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ থেকে ইলম অর্জন করতে পারে না। কারণ, এগুলো পশু থেকেও নিম্নমানের। সুতরাং অধীন এবং নিম্ন পর্যায় থেকে ইলম অর্জন করা যায় না। বরং উত্তম ও মর্যাদাবান থেকে অর্জন করতে হয়। অতএব, মানুষের উপর যে উত্তম সত্তা রয়েছে, তা হলো আল্লাহর সত্তা। তাই আল্লাহর জাত ব্যতীত মানুষের ইলম আসার পথ নেই। আর আল্লাহর নিকট থেকে ইলম আসার সুরত হলো, কিছু বিশেষ বান্দা এমন হবে, যাদের সরাসরি আল্লাহ তায়ালা ইলম শেখাবেন। তারা হলেন নবীগণ।

সুতরাং প্রত্যেক ইলম মানুষের মাঝে নবীদের মাধ্যমে আসে। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, এমনটি মনে হয় আমার নিজস্ব বুঝ। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম, ইবনে হায্‌ম জাহেরী রহ. যিনি অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন, তিনি তাঁর স্বীয় গ্রন্থ 'মিলাল ওয়া নাহল'-এ দাবি করেছেন, সমস্ত ইলম চাই তা জাগতিক হোক বা পারলৌকিক নবীগণ নিয়ে এসেছেন।

হযরত আদম আ.-এর উপর ভাষার জ্ঞান নাযিল হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখানো হয়েছে। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৩১]*

হযরত ইদরীস আ.-এর উপর জ্যামিতি এবং গণিতের ইলম অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত দাউদ আ.কে কারিগরি জ্ঞান শেখানো হয়েছিল।

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে–

كان بعض الانبياء يخط خطا

কতক নবী রেখা টেনে লেখা শেখাতেন।

এখানে লেখার জ্ঞান উদ্দেশ্য যে, লেখা তাঁদের থেকে শুরু হয়েছে। রেখা টানার ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রেখা টেনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দেওয়া এবং নিয়ম দ্বারা সেগুলো উদঘাটন করা, যাকে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভবিষ্যৎ কথনবিদ্যা বলা হয়। যাহোক, বিভিন্ন প্রকার ইলমের কথা হাদীস শরীফে এসেছে, যেগুলোর সম্পর্ক নবীদের সাথে। আর নবীদের সকলের উস্তাদ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সত্তা।

নবীদের উস্তাদ

সে-কারণে যেখানে নবীদের ইলমের দাবি করা হয়েছে, ওখানে তাঁরা নিজেদের মুয়াল্লিম হিসেবে প্রকাশ করেছেন। হযরত আদম আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আল্লাহ তায়ালা আদমকে নামসমূহের ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৩১]*

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

হে নবী! আল্লাহ আপনাকে ইলম দিয়েছেন, যা আপনি আগে জানতেন না। আপনার উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে। *[সূরা নিসা : আয়াত ১১৩]*

আরো ইরশাদ হয়েছে–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

হে নবী! আপনি তো এও জানতেন না যে, কিতাব কাকে বলে, ঈমান কী জিনিস। কিন্তু আমি আপনার অন্তরে হেদায়েতের নূর ঢেলে দিয়েছি, ফলে আপনার উপর সবকিছু আলোকিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। আমিই যাকে চাই হেদায়েত দান করি। *[সূরা শূরা : আয়াত-৫২]*

হযরত ইউসুফ আ.কে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইলম দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলতেন–

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। *[সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০১]*

হযরত খিযির আ. সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

আমি খিযিরকে অন্তর্দৃষ্টির ইলম শিখিয়েছি। *[সূরা কাহফ : আয়াত ৬৫]*

হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আ. বলতেন–

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

আমাদেরকে পাখিদের ভাষার ইলম শিখানো হয়েছিল। *[সূরা নামল : আয়াত ১৬]*

সুতরাং সমস্ত ইলম নবীদের উপর এসেছে। প্রকাশ থাকে যে, তারা কোনো কলেজে শিক্ষা পাননি এবং তাঁদের নিকট কোনো ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না। তাদের কাছে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার শিক্ষা ছিল। আর নবীগণ ছিলেন তাঁর শাগরেদ। কারণ, নবীগণ পৃথিবীতে ইলম দিতে ও শেখাতে আগমন করেন। শেখার জন্য আসেন না।

নবুওয়ত ও তবিয়ত

আম্বিয়া কেরামদের ফিতরাত স্বভাবগতভাবে আলোকিত থাকে। তাঁদের তবিয়ত সেদিকে ধাবিত হয়, যেদিকে ইলম ও কামাল থাকে। অসম্পূর্ণতা ও দোষের প্রতি তাঁদের তবিয়ত জন্মগতভাবেই ধাবিত হয় না।

কিতাবুস সিয়ার-এ রয়েছে, হযরত ঈসা আ.-এর বয়স যখন পাঁচ বছরে পৌঁছে, তখন তাঁর সম্মানিতা মাতা তাঁকে পড়ার জন্য মকতবে পাঠিয়ে দেন। তিনি মকতবে পৌঁছে ছাত্রদের কাতারে বসে গেলেন। উস্তাদ তাঁকে বললেন, বলো, আলিফ। তিনি বললেন, আলিফের অর্থ কী?

উস্তাদ বললেন, আলিফের কী কোন অর্থ হয়? তিনি বললেন, তাহলে কি আপনি অর্থহীন ও অস্পষ্ট বস্তুর তালিম দেওয়ার জন্য বসেছেন? উস্তাদ বললেন, আলিফের কি কোন অর্থ হয়? তিনি বললেন, অর্থ না হলে তাকে বস্তু বলেন কেন? অর্থহীন বস্তুর অস্তিত্ব হয় না। তিনি বললেন, যিনি ইলমের উৎস, যদি তিনিই ইলমের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখেন, তাহলে ইলম কোথা থেকে আসবে? তাঁর হুরুফ থেকে তো ইলম সৃষ্টি হয়। উস্তাদ বেচারা পেরেশান যে, এই শিশুটি কোথা হতে এল। সে তো আমাকেই পড়াতে শুরু করল। তিনি বললেন, তুমি কি জান আলিফ এবং বা এর অর্থ কী? ঈসা আ. বললেন, হ্যাঁ আমি জানি। উস্তাদ বললেন, কী অর্থ? তিনি বললেন, আপনি ওস্তাদের আসন ছেড়ে ছাত্রদের কাতারে আসুন, আমি আপনার স্থানে বসব। শিক্ষক সরে এসে ছাত্রদের স্থানে বসলেন। তারপর তিনি ওস্তাদের আসনে বসলেন। তারপর আলিফ দ্বারা তাওহীদ ও হাকীকতের যত কথা রয়েছে, বলতে লাগলেন। তখন স্বয়ং উস্তাদও হতবাক এবং অন্যান্য ছাত্ররাও হতভম্ব এই ভেবে যে, এই বাচ্চা কী জিনিস প্রকাশ করছে!

মোটকথা, নবীগণ জন্মগত ও তবিয়তগতভাবে ইলমের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁদের তবিয়ত এমনই হয়। এতদ্বসত্ত্বেও ফ্যালোসুফিরা লিখেন, তবিয়ত উপলব্ধিহীন হয়। তাতে শুধু জযবা থাকে, উপলব্ধি থাকে না। উদাহরণস্বরূপ.

আপনার ক্ষুধা লাগে। এটি একটি তবিয়তগত জযবা। কিন্তু আপনি দলিল দ্বারা ক্ষুধা প্রমাণিত করেননি বরং আপনা-আপনি প্রকাশ পেয়েছে। পিপাসা অনুভব হলে দলিল-প্রমাণ দ্বারা হয় না। আপনি বলেননি, যেহেতু এ কারণে পিপাসা লাগে, তাহলে আমার পিপাসা লাগা উচিৎ। এজন্যই দলিল ছাড়াই পিপাসা অনুভব হয়। কারণ, তা তবিয়তগত বস্তু।

যদি পিপাসা ও ক্ষুধা লাগে আর আপনি দলিল দ্বারা প্রমাণ করেন যে, না কখনো পিপাসা লাগতে পারে না। তাহলেই তা দূর হবে না, দমন হবে না আপনি যতই দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করেন। কারণ, তা তো তবিয়ত হতে সৃষ্টি হয়েছে। তবিয়ত হলো জযবাগত বস্তুর উৎসস্থল। তা দ্বারা ইলম ও উপলব্ধি সৃষ্টি হয় না। কিন্তু নবীদের তবিয়তে উপলব্ধি ও অনুভূতি থাকে। তাঁদের তবিয়তে উপলব্ধি থাকে। আর তবিয়তগত জযবাগুলো স্বয়ং আকলদীপ্ত হয়, বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

নবুওয়ত ও শিশুকাল

হযরত ইবরাহীম আ. যার ঘটনা কুরআনুল কারীমে গ্রহ ও নক্ষত্র সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এমনটি রয়েছে যে, তিনি দোলনায় শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নক্ষত্ররাজি প্রকাশ পেতে লাগল। তিনি দোলনাতে শুয়ে থাকা শিশু। আকল তো দূরের কথা। তাঁর তো তবিয়তই পোক্ত হয়নি। কিন্তু যখন তিনি দোলনায় শুয়ে দেখলেন, কিছু আলো বের হয়ে আসছে, তখন তবিয়তগতভাবে মানুষের দৃষ্টি আলোর প্রতি ধাবিত হয়। অন্ধকারের প্রতি যায় না। মানুষের কাছে জোছনা ও আলোপ্রিয় হয়। অন্ধকারপ্রিয় হয় না। আর তবিয়তগতভাবে সকলেই একথা জানে যে, আলো অন্ধকার হতে উত্তম। সেজন্য আলোর জন্য চেষ্টা করা হয়। তো হযরত ইবরাহীম আ. তারকা দেখে বললেন–

هٰذَا رَبِّيْ

এই তো আমার প্রভু।

তাকে তো প্রভূ মনে হয়, যে এত উজ্জ্বলতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে। এতে তো উচ্চতাও রয়েছে এবং পাশাপাশি আলোও আছে। তাহলে যার মাঝে আযমত, উচ্চতা ও উজ্জ্বলতা রয়েছে, তিনিই রব হবেন। তাই তিনি বললেন,

هٰذَا رَبِّيْ

কিন্তু তারকা যখন উদিত হয়ে অস্তমিত হতে লাগল, তখন তিনি বললেন-

لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ

আমি অস্তগামী বস্তুকে ভালবাসি না।

অস্তমিত হয়ে যাওয়া বস্তু প্রভু হতে পারে না। আল্লাহ হতে পারে না। যে জিনিস অস্তিত্ব পেল অতঃপর তা হারিয়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল, রবের এমন শান হতে পারে না। এমন বস্তুকে আমি ভালোবাসি না। তারপর চাঁদ উদিত হলো। তিনি বললেন-

هٰذَا رَبِّيْ

ইনি আমার রব হবেন।

কারণ, তা সকল নক্ষত্র হতে উন্নত। সে একা এমন আলো বিচ্ছুরিত করেছে যে, তার সামনে নক্ষত্ররাজির আলো ম্লান হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন-

هٰذَا رَبِّيْ

ইনি আমার প্রভু হবেন।

فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

যখন চাঁদ নিজের চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে হারিয়ে গেল, ডুবে গেল, নিচে চলে গেল, নজর থেকে হারিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তা আমার রব হতে পারে না। যদি আমার রব আমাকে হেদায়েত না দেন, তাহলে আমি অবশ্যই বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আমার জানা নেই আমি কোন বস্তুকে রব মনে করছি। *[সূরা আন'আম : আয়াত ৭৭]*

অতঃপর সূর্য উদিত হলো, যা সারা দুনিয়াকে আলোকিত করে দিল। যে রাতকে কোটি-কোটি তারকা মিলে দূর করতে পারেনি। অনেক আলোকিত করেছে; কিন্তু রাত রাতই রয়ে গেছে। আর সূর্যের একটিমাত্র কিরণের সাথে-সাথে রাত হারিয়ে গেছে। আরো অগণিত কিরণ এখনো প্রকাশ পায়নি। কেবল সুবহে সাদিক উদিত হতে শুরু করেছে। অমনি রাত উধাও হতে শুরু করেছে। যাহোক, যখন সূর্য উদিত হলো, তখন তিনি বলে ওঠলেন-

هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ

এতো বড় রব মনে হয়।

فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

কিন্তু যখন সূর্যও তার চাকচিক্য ও প্রখরতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে নিচে নামতে লাগল এবং অস্তাচলে যেতে লাগল, আসরের সময় তার চেহারা-রূপ পাল্টে যেতে লাগল। আলো ম্লান হয়ে গেল। পরিশেষে মুখ ডেকে আড়াল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, এসকল বস্তুকে প্রভু মনে করা প্রকৃতপক্ষে শির্‌কে লিপ্ত হওয়া। আমি এগুলো থেকে মুক্ত, যেগুলোর তোমরা শরীক করছ এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করছ। আমি ওই শিরকের সাথী নেই। *[সূরা আন'আম : আয়াত ৭৮, ৭৯]*

মোটকথা, হযরত ইবরাহীম আ. দোলনার শুয়ে শিশুকালে আসমানের হাকিকত সম্পর্কে চিন্তা করছেন আর আল্লাহর বড়ত্ব ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ সন্ধান করছেন। এখন যদি উক্ত তাফসীরকারকদের অভিমতকে মেনে নেওয়া হয় যে, তিনি তখন দোলনা এবং মায়ের কোলে ছিলেন, তাহলে এতে প্রমাণিত হয় যে, নবীদের তবিয়ত জন্মগতভাবে ইলমের দিকে ধাবিত হয়। তাঁরা দোলনার থেকেও ইলমি জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন। মন্তব্যে পৌঁছেও ইলমি কথা বলেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মলাভ করেন। কিছু হাদীসে তাঁর জন্মের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তিনি কোন অবস্থায় জন্মলাভ করেন? চোখের নজর ছিল আকাশমুখী। শাহাদাত আঙ্গুল উপরে উঠানো ছিল। কেমন যেন তিনি একত্ববাদের সাক্ষ্য ঘোষণা করে জগতে আগমন করলেন।

এগুলো তবিয়তগত বস্তু। কিন্তু তাঁদের তবিয়ত হাকিকতের প্রতি ধাবিত হতো। নবীদের তবিয়ত হাকায়েকের দিকে যেত।

হযরত ইয়াহইয়া আ. সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে

وَآتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ○

আমি ইয়াহইয়াকে শিশুকালে আদেশ দিয়েছি। *[সূরা মারয়াম : আয়াত ১২]*

অর্থাৎ তাকে ইলমে লাদুন্নী ও মারেফত দান করা হয়েছে এবং কামালাতে

রব্বানী প্রদান করা হয়েছে। অথচ তখনও তিনি শিশু ছিলেন। একারণে কতক আলেমের অভিমত হলো, আল্লাহ তায়ালার অমোঘ নিয়ম ভঙ্গ করে হযরত ইয়াহইয়া আ.কে শিশুকালে নবুওয়ত দেওয়া হয়েছিল। যাহোক, নবীদের তবিয়ত জন্মগতভাবে পবিত্র হয়। তা নেক কর্মের দিকে ধাবিত হয়। বদ কর্মের প্রতি কখনো যায় না। তবিয়তগতভাবে সর্বদা কল্যাণ, ইলম ও উপলব্ধির দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং নবীগণ দুনিয়াতে আগমন করে কারো নিকট থেকে ইলম শেখেন না। কারো সামনে আদবের সাথে বসেন না। কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করেন না। তাদের উস্তাদ সরাসরি আল্লাহ। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে উম্মি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে তিনি নিরক্ষর ছিলেন। অর্থাৎ কোন মাদরাসায় তিনি তালিম পাননি, কোন উস্তাদ তাকে কিছু শেখাননি।

ঘরোয়া মাধ্যমে তালিম বন্ধ রেখে উম্মিয়াতের হেফাজত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি ও নিরক্ষর হওয়ার পাশাপাশি তাঁর অক্ষরজ্ঞান লাভ করার কোনো মাধ্যমও ছিল না। লেখাপড়ার প্রাথমিক মাধ্যম হলেন মাতাপিতা। তারা সন্তানদের তালিম দেন। কারণ, বাচ্চারা নিজ উদ্যোগে তালিমের দিকে যায় না। মাদরাসায় যায় না। শিশু আপন ইচ্ছায় মক্তবে যায় না। তাদের জোর জবরদস্তি করে পাঠাতে হয়। কখনো-কখনো মাতাপিতা মারপিট করে পাঠান। পিতার উপর দায়িত্ব হলো সন্তানকে দীনি তালিম প্রদান করা।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের পূর্বেই পিতাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, যাতে আমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর এহেন অপবাদ আরোপ না করতে পারে যে, তাঁর পিতা তাকে শিখিয়েছেন। ফলে তার উম্মিয়াত তথা নিরক্ষরতা আরো শক্তিশালী হয়েছে। তিনি নিজে তো লেখাপড়া জানতেন না। আর পড়ালেখার মাধ্যম হতেন যে পিতা, তাকে জন্মের আগেই উঠিয়ে নেওয়া হয়।

এখন এমনটি হতে পারত যে, মাতা তালিম দিয়েছেন। যদি পিতা দুনিয়া ত্যাগ করেন, তাহলে মাতা তার প্রতিনিধি হয়ে সন্তানদের তালিম দেন। তারা কখনো-কখনো তালিমের ব্যাপারে পিতার চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারেন।

একজন বড় মাপের আলেম ও ইমাম ছিলেন ইমাম রবিয়া। তিনি সালফে

সালেহীনদের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। রবিয়াতুর রায় ছিল তার উপাধি। তিনি মায়ের উদরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে পিতা সফরে বের হয়েছিলেন। ওই যুগে ব্যবসার জন্য সফর হতো। বর্তমান সময়ের মতো সফরের মাধ্যম ছিল না। মটরযানে চড়ে পৌঁছে যাবে, রেলগাড়ীতে বসে হাজারো মাইল অতিক্রম করবে, উড়োজাহাজে আরোহণ করে হাজার-হাজার মাইল ভ্রমণ করবে এমন ব্যবস্থাপনা ছিল না। সেই যুগে উটের উপর আরোহণ করে সফর হতো, বেশি দ্রুত হলে গাধার উপর সফর হতো। তার চেয়ে বেশি হলো ঘোড়ার মাধ্যমে সফর হতো। এভাবে তারা সফর করতেন।

মোটকথা, ইমাম রবিয়ার সম্মানিত পিতার রহ. সফর করার প্রয়োজন দেখা দিল। সফরটি ছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে। তা অনেক দীর্ঘ সফর হতো। দশ বছর লেগে যেত, বিশ বছর লেগে যেত। হযরত রবিয়ার পিতা তার মাকে বললেন, আমাকে দূর দেশে সফর করতে হবে। ব্যবসায়ী সফর। তাই কয়েকটি দেশে যেতে হবে। অনেক সম্ভবনা রয়েছে যে, এই সফরে দশ/বার বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। তিনি বিশ হাজার রুপি স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, ১০/১৫ বছর পর ফিরে আসতে হতে পারে। তুমি এই রুপিগুলো ব্যয় করতে থাকবে এবং হিসাব রাখবে। তারপর সফরে বের হয়ে যান।

পিতা চলে যাওয়ার ৪/৫ মাস পর ইমাম রবিয়ার জন্ম হয়। তার বয়স যখন ৪/৫ বছর, মা তাকে মস্তবে পাঠিয়ে দেন। তাঁর তালিম ও তরবিয়তের জন্য পৃথক উস্তাদ নির্ধারণ করেন এবং তার জন্য বেতন ধার্য করেন আর গচ্ছিত টাকা ব্যয় করতে থাকেন। ১১/১২ বৎসর বয়সে তিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের আলেম হলেন, হাফেয হলেন, মুহাদ্দিস হলেন, মুফাসসির হলেন এবং ফকীহ ও মুফতী হলেন। এমনকি বার বছর বয়সে তাকে ফতোওয়া দেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। মদীনার মসজিদে নববীতে তাঁর দরস শুরু হয়। বড়-বড় আলেমগণ তাঁর দরসে বসতেন। অথচ ইমাম রবিয়ার রহ. তখন দাড়ি গজায়নি। কিন্তু বড়-বড় আলেমগণ তার সামনে আদবের সাথে হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন। সমগ্র মুসলিম জাহানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে তাঁর আলোচনা হতে থাকে।

আনুমানিক পনের বছর পর তার পিতা ফিরে আসেন। যখন তিনি ঘরে পৌঁছেন, তখন ইমাম রবিয়া রহ. ঘরে ছিলেন। তিনি আপন বয়স হিসেবে নওজোয়ান হয়েছিলেন। দেহের গঠন-গড়ন বড় ছিল। পিতা লক্ষ করলেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করছে। তাই তাঁর পিতার রাগ এল। তিনি বললেন, তুমি কে আমার ঘরে প্রবেশ করছ? ছেলে পিতাকে

চিনতেন না। তাই ছেলেও বললেন, কমবখ্‌ত! তুমি কে যে আমার বাড়ির অন্দর মহলে চলে এসেছ? বাপ ও বেটার মাঝে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো। একজন অপরজনকে বললেন, তুমি অপরিচিত পুরুষ, আমার বাড়িতে প্রবেশ করছ কেন?

উভয়ের আওয়াজ উঁচু হওয়ার কারণে অন্দর মহল থেকে মা শুনলেন এবং উঁকি মেরে দেখলেন। তিনি চিনে ফেললেন, আমার স্বামী ফিরে এসেছেন। তিনি অতি দ্রুত উভয়ের মাঝে বিচার করে দিলেন। হযরত ইমাম রবিয়া রহ.কে বললেন, তুমি বাইরে চলে যাও। তার পিতার রাগের হালত এমন যে তিনি তার মায়ের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে থাকেন যে, সে কে ছিল যে ঘরে প্রবেশ করেছিল। তিনি বললেন, আপনি শান্ত হয়ে বসুন, আমি সবকিছু খুলে বলব। অবশেষে তিনি শান্ত হলেন। কিন্তু তিনি বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন যে, সে কে ছিল? আর সাথে-সাথে প্রশ্ন করলেন, রেখে যাওয়া অর্থের হিসাব দাও?

মা বললেন, আমি টাকা নিয়ে কোথাও ভেগে যাব না। আপনি হিসাব পাবেন এবং ওই ব্যক্তি সম্পর্কেও শুনতে পাবেন। কিন্তু আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। কিছুটা বিলম্ব করুন। অনেক মুশকিলে স্বামীকে শান্ত করে আহারাদি করালেন। তাকে বললেন, আপনি পোশাক পরিবর্তন করুন, গোসল করুন। তিনি তা করলেন। ইতিমধ্যে যোহরের নামাযের সময় চলে এল। স্ত্রী তাকে বললেন, আপনি মসজিদে নববী হতে নামায পড়ে আসুন। তারপর আপনাকে সব হিসাব বুঝিয়ে দেব। তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। নামাযের পর ইমাম রবিয়াতুর রায়-এর দরস শুরু হলো। তাঁর সামনে তৎকালীন যুগের বড়-বড় আলেম ব্যক্তিত্বগণ ছাত্র হিসেবে বসে আছেন। তাঁর মজলিসের মতো অন্য কারো মজলিস এতো বড় হতো না। সেই দরসে পিতাও বসে গেলেন। তার জানা নেই, দরসদাতা লোকটি তারই সন্তান। তিনি শ্রবণ করতে থাকেন। ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা পর মজলিস শেষ হওয়ার পর ঘরে ফিরে এলেন। বললেন, আজ আমি এমন একজন মহান আলেমের দরস শ্রবণ করেছি যে, তার মতো এতো বড় আলেম আমার জীবনেও দেখিনি। আমার আত্মা তাজা হয়েছে, নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আমার সকল মলিনতা ও কলুষতা দূর হয়ে গেছে। আমি এমন কোন ইমাম আজও দেখিনি। তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন।

স্ত্রী বললেন, আপনার মতে এমন একজন বড় আলেম কত টাকায় তৈরি হতে পারে? বললেন কত টাকায়? তিনি বললেন, যদি ধনভাণ্ডারও শেষ হয়ে

যায়, তাহলে ধনভাণ্ডার হালকা হয়ে যাবে আর উক্ত আলেম ভারী হয়ে যাবে। সমগ্র পৃথিবী ব্যয় করেও যদি এমন আলেম বানানো হয়, তাহলে তা অতি সস্তাই হবে। স্ত্রী বললেন, ওই যুবক হলো আপনার ঔরসজাত সন্তান। আর বিশ হাজার রুপি তাকে আলেম বানানোর পিছনে ব্যয় করেছি।

তৎক্ষণাৎ তিনি স্ত্রীর হাতে চুমু খেলেন। আর যখন ছেলে ফিরে এলেন, তখন তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং ছেলেও পিতার নিকট ক্ষমা চাচ্ছেন যে, আমার বেয়াদবি ক্ষমা করে দেন। তিনি বলছিলেন, আপনি আমার পিতা। আর পিতা বলছেন, তুমি আলেমদের উস্তাদ। তো আমারও উস্তাদ। এত বড় আলেম।

পিতা ছেলের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। ছেলে পিতার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। উক্ত ঘটনাটির উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, যদি পিতা বর্তমান না থাকেন, মা যদি বুদ্ধিমতী হন, তাহলে তিনি সন্তানদের পড়ান। ফলে রবিয়াতুর রায়ের মতো ছেলে তৈরি হয়।

যদিও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তাহলে মাতা পড়াতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর তাঁর মাথার উপর থেকে মাতার ছায়াও তুলে নিলেন। ইলম অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যমও উঠে গেল। পিতাও নেই, মাতাও নেই। তারপর পিতামহ তাঁর কফিল হলেন। দেখাশোনার ভার গ্রহণ করলেন। বাহ্যিকভাবে দাদাও একজন মাধ্যম হন। মাতাপিতা যেমন মনোযোগী হন, দাদা তেমন হন না। কিন্তু যতটুকুও ছিল, তাও আট বছর বয়সে খতম হয়ে গেল। পিতামহও দুনিয়া ত্যাগ করলেন। তারপর চাচা আবু তালেবের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর তরবিয়ত ও দেখাশোনা করেন। আবু তালেব আজীবন ভাতিজার দেখভাল করেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি। যাহোক ঘরে এবং পরিবারে এমন কেউ ছিল না, যিনি তালিম দেবেন।

জাতীয় শিক্ষা মাধ্যম বন্ধ রেখে উম্মিয়াতের হেফাজত

ঘরে বা পরিবারে কেউ যদি শিক্ষিত না থাকে, মাতা-পিতা ও দাদা-দাদি না থাকে; কিন্তু যদি দেশে ও জাতির মধ্যে ইলমের চর্চা থাকে, তাহলে মানুষ কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখতে পারে। কিন্তু আরব দেশ মূর্খদের দেশ ছিল। জগতের জাতিসমূহে আরবদের উপাধি ছিল মূর্খ জাতি হিসেবে। তাদের সবাই 'জুহালায়ে আরব' বলে ডাকত। 'আরবের পণ্ডিত' কেউ বলত না।

আলেম নাও বললে বুদ্ধিজীবী তো বলত। কিন্তু কেউ তাও বলত না। 'জুহালায়ে আরব' তাদের খেতাব ছিল। এবং ওই যুগের নাম ছিল 'যামানা জাহেলিয়্যাত'। কেমন যেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত মূর্খতার ছায়া ডেকে নিয়েছিল। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ঘরোয়া কোন মুরুব্বী ও শিক্ষক ছিল না, তবে সম্ভব ছিল বংশের মাঝে কোন মুরুব্বী বনে যেত, কোন উস্তাদ বনে যেত। তখন অপবাদ দেওয়া হতো, তাঁর যতটুকু ইলম ও জ্ঞান রয়েছে, তা তাঁর জাতির শেখানো ইলম। তাঁর প্রখর মেধা ছিল। তাই কয়েকটি কথা জাতি থেকে শুনে নিয়েছে। তবিয়ত ও স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল। তাই এক পোয়া ইলমকে এক মণ বানিয়ে বা তিলকে তাল বানিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন। তখন নবুওয়তের উপর অপবাদ আসত। সেজন্য ঘরোয়া পরিবেশ যেমন ছিল, তার চেয়ে বেশি খারাপ জাতির অবস্থা ছিল। তাদের মধ্যে ইলমের চিহ্নটুকুও ছিল না। ইলমের কোন চর্চাই ছিল না।

প্রেরণের স্থান হিসেবে উম্মিয়াতের হেফাজত

অতঃপর এমন সম্ভাবনা ছিল যে, কওমের মাঝে না থাকলে যদি বাহির থেকে আহলে ইলম এবং আলেমদের আনাগোনা থাকত, তাহলে কিছু না কিছু ইলমি কথা কানে পড়ত। কিন্তু বহির্বিশ্ব থেকে কেউ কিভাবে আসবে?

বাহির দেশ থেকে মানুষ তখনই আসে, যখন দেশে ব্যবসা থাকে, কৃষি পণ্য চাষের ব্যবস্থা থাকে, সম্পদ থাকে এবং সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে। তাহলে বাইরের লোক আসে। যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আসে। আর আরবের অবস্থা ছিল এমন যে–

بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

সেখানে না ছিল পানি, না ছিল ঘাস ও খাদ্যশস্য। *[সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭]*

পানি ও খাদ্যহীন দেশ। শুকনো মরুভূমিও পাহাড়ি অঞ্চল। সেখানে ছিল লু হাওয়া এবং বালু আর বালু। শুধু পাথরময় জমিন বা পার্বত্য অঞ্চল। ছিল না কোন নদীনালা, ছিল না দানা-পানি, ছিল না শ্যামলতা, বাগান ও ক্ষেত-খামার। কোন কিছুই ছিল না। তাহলে বহির্বিশ্ব থেকে কে আসবে? কেন আসবে?

যদি ইলমের চর্চা হতো, তাহলে ইলমি লোক আসত। কারিগরি ও শিল্পকলার চর্চা হলে কারিগর ও শৈল্পিকরা আসত। ব্যবসা আর কৃষি কর্ম থাকলে, কৃষক এবং ব্যবসায়ীগণ আসত। যখন কোন মাধ্যমই নেই, তাহলে মানুষ কেন আসবে?

সারকথা হলো, ঘরে ও পরিবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ানোর মতো কোন লোক ছিল না। বংশে ও জাতিতে কেউ ছিল না। দেশে ইলমের চর্চা ছিল না। মোটকথা, ইলম শেখার কোন উছিলা বা মাধ্যম ছিল না। অতএব, উম্মিদের দেশ ছিল, নিরক্ষরদের দেশ ছিল। সেখানে যদি একজন ব্যক্তি এসে বড়-বড় ইলমি ও জ্ঞানগর্ব কথা পেশ করেন যে তাঁর ইলম দেখে জগদ্বাসী হতবাক হয়ে যায়। শুধু ইলমি কথাই পেশ করেননি বরং এমন সংবিধান জগদ্বাসীর সম্মুখে পেশ করেছেন, যা জীবনের সকল শাখা ও কোণ পরিবেষ্টন করে নেয়। আর তিনি তা এমতাবস্থায় পেশ করেন যে, তিনি নিজে পড়ালেখা জানেন না এবং কেউ তাকে পড়াননি। না দেশে পড়ালেখার কোন চর্চা রয়েছে। না ঘরে এবং বংশে ও জাতিতে কোন শিক্ষিত মানুষ রয়েছে। তারপরও এমন ইলম পেশ করেছেন যে, আলেমগণ পর্যন্ত দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বুদ্ধিজীবীগণ অপারগ বনে গেছেন। সবাই হার মেনে নিয়েছেন। সুতরাং এত বড় আলেম স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার শেখানো ব্যতীত কিভাবে হওয়া সম্ভব? অতএব, উম্মি হওয়া আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়ার দলিল।

উম্মিয়াত নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ

নবুওয়তের আজিমুশ্বান দলিল হলো যে, তিনি উম্মি ছিলেন। তিনি উম্মিদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। শিক্ষিত সমাজে প্রেরিত হলে এমন অপবাদ আরোপ করা হতো যে, শিক্ষিতকরা তাকে পড়িয়েছেন এবং তাকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের যত পথ ও পন্থা হতে পারে সবই বন্ধ ছিল। যত আসবাব-সামগ্রী হতে পারে সবই অনুপস্থিত ছিল। তিনি নিজে পড়ালেখা জানতেন না। কিন্তু এমন ইলম পেশ করেছেন যে, শিক্ষিতকরা অপারগতা প্রকাশ করেছেন। হতবাক হয়ে গেছে। দাঁতে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়েছে। অতএব, উক্ত ইলম আল্লাহর শেখানো ব্যতীত কোথাও থেকে আসতে পারে না। প্রকৃত অর্থে আল্লাহর তালিমই নবুওয়ত। আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যভাবে নবীদের অন্তরে ঢেলে দেন। ওহীর কামালাত ইলহাম করেন।

মোটকথা, উম্মি ও নিরক্ষর হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়তের সবচেয়ে বড় দলিল। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কুরআনুল কারীমের মতো কিতাব পেশ করেছেন। কুরআনুল কারীম এমন এক মহাগ্রন্থ যে, জগৎ তার নমুনা পেশ করতে অক্ষম। সকলকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, হুংকার ছাড়া হয়েছে। কিন্তু সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে ফলাফল এমন হয়েছে যে, সকল জাতি তার প্রতি ঝুঁকেছে। তার মূল দ্বারা উপকৃত হতে চেয়েছে। তার শাখা-প্রশাখা হতে উপকার লাভ করতে চেয়েছে। কাল অতিক্রম করছে, ব্যাপক উন্নতি সাধন করছে। প্রত্যেক প্রাচীন কিতাব পুরাতন ও অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম প্রত্যেক যুগে নতুন এবং সতেজ রয়েছে, সচল রয়েছে। সুতরাং এমন পরিপূরক বিধান পেশ করা এবং পেশকারী একজন উম্মি হওয়া এছাড়া অন্য কোন দলিল হতে পারে না যে, এই মহান বিধান আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা বই নয়। অতএব, নবুওয়তের সবচেয়ে বড় দলিল হলো উম্মিয়াত বা নিরক্ষরতা।

ওহী ও আকলের মাঝে পার্থক্য

প্রকাশ থাকে যে, নিরক্ষর হওয়াকে আমরা মানবিক দুর্বলতা মনে করি। কিন্তু নবীদের বেলায় নিরক্ষর হওয়া সবচেয়ে বড় কামালের দলিল। কারণ, চিন্তা-গবেষণা করে কিছু ভালো-ভালো কথা বলা নবীদের কামাল নয়। চিন্তা করে কথা বললে দলিল হবে, আকলের দুর্লভ বস্তু হবে। কিন্তু ওহী আকল থেকে উন্নত ও উর্ধ্বের বস্তু। আকল যখন নিজে ভুল করে, তখন সুস্থতা ও সঠিকতার মানদণ্ড হয় ওহী, যা আকলকে সোজা করে, সুস্থ করে। আকলের মধ্যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা সৃষ্টি হয় না। পূর্ণ চমক ও জ্যোতি সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম ও ওহী তাকে সাহায্য না করে। গ্রামাঞ্চলেও অনেক বুদ্ধিমান বসবাস করে। কিন্তু তাদের আকল বিকৃত হয়ে যায়। কারণ, তাদের আকল ইলম থেকে আলো গ্রহণ করেনি। শহরে শিক্ষার চর্চা হয়। ফলে শহরের আকল সুপ্রশস্ত হয়। তাদের আকল ইলমের আলো পায়। এমন হয় না যে, গ্রামেগঞ্জে আকলমান্দ জন্মে না। আল্লাহ না করুন এভাবে বণ্টন হয়নি যে, গ্রামে সব বেকুফ জন্মে আর শহরে সব আকল ও বুদ্ধিওয়ালা হয়। গ্রামেও জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান জন্মে। সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা জন্মে। যেহেতু তালিম ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, তাই আকল বিকৃত হয়ে যায়। উলামায়ে ইসলামদের মধ্য হতে বড় বড় আলেম এবং বড় বড় ইমাম অধিকাংশই গ্রাম থেকে প্রকাশ পেয়েছেন। ইমাম গাযযালী রহ. গাযযালাহ্

গ্রামে বসবাস করতেন। ইমাম রাযী রহ. একজন গ্রাম্য মানুষ। ইমাম হাসান বসরী রহ. একজন পাড়াগাঁয়ের মানুষ ছিলেন।

মোটকথা, বড় বড় আলেম ও সুফীগণ গ্রামে বসবাস করতেন। তারা ইলম অর্জন করেছেন। ইলম আকলসমূহকে আলোকিত করেছে। বোধশক্তিকে উন্নত করেছে। ফলে মহাসম্মানিত আলেম তৈরি হয়েছেন। আকল ইলমের সাহায্য না পেলে হোঁচট খায়। এজন্য চিন্তা ও গবেষণা করে কিছু বলা নবীদের কামাল নয়। এভাবে সবাই বলতে পারে।

নবীদের আকলের উন্নতি ও উচ্চতা

তারপরও নবীদের আকল সাধারণ মানুষদের আকল হতে অনেক বুলন্দ ও উন্নত উঁচু হয়ে থাকে। কারণ, তাদের আকলের উপরই ইলম অবতীর্ণ হয়। আকল যত বড় হবে, তার উপর তত বড় ইলম নাযিল হবে এবং তত বড় হয়ে প্রকাশ পাবে। যদি আপনার দরসে কোন কম আকলওয়ালা ব্যক্তি বসে আর আপনি তার তাকরীর করেন। অপর একজন বুদ্ধিমান বসে, তাহলে তাকবীর উভয়ের দেমাগে একইভাবে পৌঁছে। কিন্তু তাকরীরের শেষে একজন বের হবে এমন যোগ্য হয়ে যে, ওই এক তাকরীরকে ডাবল বানিয়ে পেশ করবে আর অপরজনের নিকট অর্ধেকও থাকবে না।

মোটকথা, একজন পূর্ণ আকল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সামনে ইলম পেশ করলে সে কোথা থেকে কোথায় পর্যন্ত উন্নীত হয়। আর একজন অসম্পূর্ণ আকলওয়ালার নিকট পেশ করলে তা অর্ধেকও থাকে না। নবীদের আকল সবচেয়ে বেশি ভারী হয়। সরওয়ারে আম্বিয়া ও খাতামুল আম্বিয়া আ.-এর শানে ইরশাদ হয়েছে–

أُوتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইলম আমাকে দেওয়া হয়েছে।

এত বেশি ইলমের জন্য তত বড় বড় আকলওয়ালা হওয়া আবশ্যক। এজন্য সায়্যিদুল আম্বিয়া আ.-এর বুদ্ধিদীপ্ত কারনামা সম্পর্কে পৃথক কিতাব রচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ একে তো ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে নবীসুলভ কারনামা। কিন্তু যেগুলো নিরেট আকল দ্বারা ফয়সালা করেছেন, সে সম্পর্কে পৃথক কিতাব রচনা করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কিত ঘটনা দেওয়া হয়েছে।

নবী করীম সা.-এর বুদ্ধিদীপ্ত কারনামা

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ল। বদর যুদ্ধের সময় একপক্ষে তিনশত তেরজন সাহাবী। অপরপক্ষে এক হাজার সশস্ত্র সৈনিক। তিন শতজনের যুদ্ধ ছিল এক হাজার সৈনিকের সাথে। উভয় বাহিনীর ক্যাম্প ছিল ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে। পাহাড়ের এক পার্শ্বে মক্কার কাফেরদের তাঁবু ছিল আর অপর পার্শ্বে সাহাবায়ে কেরামদের তাঁবু ছিল।

ঘটনাক্রমে কাফেরদের ক্যাম্প হতে একজন লোক মুসলমানদের ক্যাম্পে চলে এল। তাদের কোনো সৈনিক চলে এল। হয়তো রাস্তা ভুলে এসেছে, না হয় ইচ্ছা করে এসেছে। আসার সাথে-সাথে পাহারারত সাহাবীরা তাকে ধরে ফেললেন। দুশমনদের কোন সৈনিককে ধরতে পারা যুদ্ধের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৈনিককে ধরার পর জিজ্ঞেস করতে লাগল, তোমাদের ক্যাম্পে কতজন সৈনিক আছে? সাহাবাদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অনুমান করা। এটি একটি অভ্যাসগত বিষয় যে, যখন দুটি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন একদল অপর দলের শক্তি অনুমান করতে চায়। তাই সাহাবাগণ চাচ্ছিলেন তাদের শক্তি অনুমান করতে। তাই তারা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কতজন? শত্রু সৈনিক ভীতি প্রদর্শন করার জন্য বলল, আল্লাহর কসম, অনেক বিশাল জামাত, বিশাল সমাবেশ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভয় প্রদর্শন করে জিজ্ঞেস করলেন, কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে বলল না। শুধু বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! অনেক বিশাল সৈন্যদল। আসল কথা বের করতে অপরাগতা প্রদর্শন করল। মানুষের উচ্চ আওয়াজ ও হৈহুল্লোড়ের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন তাঁবু হতে বের হলেন এবং ইরশাদ করলেন, এ শোরগোল কিসের? লোকেরা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিক সৈন্যদল থেকে এক ব্যক্তি এদিকে এসে গেছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের শক্তি কতটুকু? কিন্তু সে বলছে না।

তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তাকে অহেতুক কেন পেরেশান করছ? তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু-মিনিট পর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাহিনীতে প্রতিদিন কটি উট যবেহ করা হয়? সৈনিকটি বলল, প্রতিদিন দশটি উট যবেহ দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে হয় তোমাদের লোক এক হাজার হবে। কেননা, একশত মানুষ মিলে একটি উট খেতে পারে। দশটি উট যেহেতু যবেহ করা হয়, তাহলে

প্রমাণিত হয় তোমাদের লোকসংখ্যা এক হাজার।

সারকথা, যা সকলে মিলে সমাধান করতে পারেনি, তা তিনি এক মিনিটে সমাধা করে ফেললেন। তা ওহী দ্বারা বের করেননি, আকল দ্বারা করেছেন। শুধু বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা দ্বারা বের করেছেন। তা এক ধরনের অভিজ্ঞতা এবং সঠিক অনুমান দ্বারা করেছেন।

যাহোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার আকল অনেক উঁচুমানের ছিল। আর তার ইলম তো উঁচু মাপের ছিলই।

হাদীস শরীফে এসেছে– 'একলোক এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকাশে অভিযোগ প্রদান করল, আমার প্রতিবেশী আমাকে অনেক জ্বালাতন করে। এখন আমি অক্ষম। আমি মিনতি করেছি, তোষামোদ করেছি, করজোড় করে বলেছি। কিন্তু সে বিরত থাকছে না। সে সর্বদিক দিয়ে আমাকে অত্যাচার করে। এখন আমি কী করতে পারি? আমি অপারগ।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমাকে কৌশল বলে দিচ্ছি। তোমার ঘরের সকল সামগ্রী বের করে রাস্তার মাঝে রেখে দাও এবং সেগুলোর উপর বসে যাও। যাতায়াতকারী যারাই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ভাই তোমার ঘর থাকতে মালামাল রাস্তায় কেন? তাকে বলবে, প্রতিবেশী অত্যাচার করে; তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তুমি বাড়ি ছেড়ে দাও, রাস্তার মাঝে বসে যাও।

অতঃপর লোকটি বাড়ি পৌঁছে ঘরের সকল সামান বের করে রাস্তার মধ্যস্থলে রেখে সেগুলোর উপর বসে গেলেন। এখন যেই আসে তাকে জিজ্ঞেস করে ভাই তোমার ঘর থাকতে সড়কের মাঝখানে কেন বসেছ? সে বলল, ভাই সাহেব! পড়শি অত্যাচার করে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঘর ছেড়ে দিতে, সড়কে বসে যেতে। লোকেরা বলতে লাগল, অভিশাপ ও লানত ওই ব্যক্তির উপর, যে তার প্রতিবেশীকে অত্যাচার করে। এখন যে-ই আসে সে-ই তাকে লানত করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজারো লানত তার উপর বর্ষিত হয়েছে। সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী হাত জোড় করে বলতে থাকে, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আপনার ঘরে ফিরে যান। আমি ওয়াদা করছি, সারাজীবন কখনো আপনাকে অত্যাচার করব না। সে নিজে গিয়ে তার সামান বাড়িতে উঠিয়েছে এবং অঙ্গীকার করেছে যে, আজীবন আপনার খেদমত করব। আর আল্লাহর দোহাই দিয়ে তার মাল-সামান বাড়িতে রেখেছে। এগুলো তিনি

ওহীর দ্বারা করাননি। বরং আপন বুদ্ধি ও আকল দ্বারা করিয়েছেন। তা ছিল তাঁর বুদ্ধির প্রভাব।

মোটকথা, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. আল্লাহর নিকট থেকে যেমনভাবে ইলম নিয়ে আসেন, তেমনিভাবে আকল-বুদ্ধিও নিয়ে আসেন। অতএব, তাঁরা যত বড় মাপের আলেম, তত বড় মাপের বুদ্ধিমানও। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদুল আম্বিয়া হওয়ার কারণে যেমনভাবে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন, তেমনি সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমানও ছিলেন। এ-কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুদ্ধিমত্তার উপর পৃথক কিতাব লেখা হয়েছে।

উম্মিয়াতকে গৌরবময় স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি ছিলেন। উম্মিয়াত তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল। উম্মিয়াতকে আল্লাহ তায়ালা গৌরবময় ও প্রশংসার স্থানে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۡ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

সে সমস্ত লোক যারা আনুগত্য অবলম্বন করে রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষেধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। *[সূরা আরাফ : আয়াত ১৫৭]*

তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর আলোচনা করা হয়েছে যে, একজন রাসূল আসবেন, যিনি নবী হবেন এবং উম্মি ও নিরক্ষর হবেন।

এখানে সাহাবীদের ডাইরেক্ট বলা হয়েছে আর ইনডাইরেক্ট সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে রাসূলের আলোচনা পেয়েছ, তিনি উম্মি হবেন, নিরক্ষর হবেন। অতএব, উম্মি ও নিরক্ষর হওয়া এ কথার দলিল যে, তিনি যে ইলম পেশ করেছেন, তা তাঁর বুদ্ধি ও মেধা দ্বারা নয় বরং তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।

যেমন মিশন তেমন ইলম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম কেমন ছিল?

أُوتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

পূর্ব এবং পরবর্তী তামাম উলুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে একত্রিত করা হয়েছিল।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة

পূর্ববর্তী সকল নবীকে নিজ নিজ কওমের প্রতি পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সমগ্র মানুষের জন্য দেশ ও জাতির পার্থক্য ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

بعثت الى الاسود والاحمر

আমাকে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সকলের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।

আমার উম্মতের মাঝে যেমন তুর্কী আসবে, তেমনি হাবশী আসবে। যেমন আরবী আসবে, তেমনি হিন্দি আসবে, চাইনিজ আসবে। আমাকে প্রতিটি অঞ্চল ও দেশের মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বেকার নবীগণ বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হতেন। সেজন্য তাদের এমন ইলম দেওয়া হতো, যা সেই কওমের চিন্তা-চেতনার মোতাবেক হতো। তাদের মেজাজ ও স্বভাব মোতাবেক হতো এবং তাদের মুজেযাত কওমের চিন্তা-চেতনা মোতাবেক দেওয়া হতো। এ কথায় তাদের ইলম ছিল নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট।

ঈসায়ী মিশনের প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা আ. বনী ইসরাইলদের নিকট আগমন করেছিলেন। তিনি নিজে বলতেন, আমি ইসরাইলী ভেড়াগুলো একত্রিত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ তাদের সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তাই কুদরতিভাবে হযরত ঈসা আ.কে এমন ইলম দান করা হয়েছিল, যা বনী ইসরাইলদের চিন্তা-চেতনার মোতাবেক ছিল। জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের চিন্তা-চেতনার প্রতি খেয়াল করা হয়নি। কারণ, তার দায়িত্ব ছিল শুধু বনী ইসরাইলীদের ইসলাহ্ করা। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীসমূহের প্রতি যে সমস্ত নবী আসবেন, তারা তাদের মুনাসিব ইলম ও কামালাত নিয়ে আসবেন। সুতরাং প্রত্যেক নবীকে তাঁর উম্মত মোতাবেক উলুম ও মাসায়েল দেওয়া হতো এবং মুজেযাও দেওয়া হতো।

মুসাবী মিশনের প্রেক্ষাপট

হযরত মুসা আ.-এর যুগ ছিল যাদুমন্ত্রের যুগ। মানুষ রশিকে সাপ বানিয়ে ফেলত। লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাত। তাই হযরত মুসা আ. তাদের চিন্তা-চেতনা মোতাবেক মুজেযা দেওয়া হয়েছিল, তাকে লাঠি দেওয়া হয়েছিল। তা মাটিতে ফেললে সাপ বনে যেত আর হাতে নিলে লাঠি হয়ে যেত।

হযরত ঈসা আ.-এর যুগে ডাক্তারি বিদ্যার জোর ও শোর ছিল। একেকজন ডাক্তার তৈরি হতো আর গ্যারান্টি দিত, আমি রোগীকে অবশ্যই ভালো করব। শ্বেতরোগ সুস্থ করব, জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করব।

তাই হযরত ঈসা আ.কে সে ধরনের মুজেযা প্রদান করা হয়েছিল যে, ডাক্তারগণ ঔষধ দ্বারা সুস্থ করত আর তিনি চোখে হাত বুলিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন। শ্বেতরোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। তাতে শ্বেতরোগ অদৃশ্য হয়ে যেত। আর তাঁর সর্বোচ্চ মুজেযা ছিল, তিনি মাটি দ্বারা পাখি নির্মাণ করে 'আল্লাহর আদেশে উঠে দাঁড়াও' বলতেন। ফলে তা আকাশে উড়তে থাকত। তাকে মৃতকে যিন্দা করা, শ্বেতরোগকে ভালো করা এবং জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করার মুজেযা দেওয়া হয়েছিল।

মোটকথা, এমন মুজেযা দেওয়া হয়েছিল, যেগুলো বস্তুর পর্যায়ে পৌঁছে ছিল। অতএব, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের চাহিদা মোতাবেক ইলম দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কওমের চিন্তা-চেতনা মোতাবেক ইলম দেওয়া হয়েছিল।

উম্মি নবী পাঠানোর পটভূমি

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেহেতু সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পাঠানো হয়েছিল, তাই তাকে জামেউল উলুম বানানো হয়েছিল। প্রত্যেক ধরনের চিন্তা-চেতনা তাঁর শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে যে, সেই চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী তরবিয়ত দেওয়া হবে। যদি হযরত আদম আ.কে ইলমে আসমা তথা সকল বস্তুর নামের ও কামের ইলম দেওয়া হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদম আ.কে সকল বস্তুর নাম শেখানো হয়েছে। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৩১]*

তাহলে হাদীস শরীফে এসেছে–

وَعُلِّمْتُ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا كَمَا عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

হযরত আদম আ.কে সকল বস্তুর নাম শিখানো হয়েছিল। আমাকেও সেই ইলম দান করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ আ.কে স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম দেওয়া হয়েছিল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিন্নভাবে স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম দেওয়া হয়েছে যে, তাতে স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে ভিন্ন একটি বিষয় সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজারো ব্যাখ্যাকারক তৈরি হয়েছে। অতএব, আম্বিয়া কেরামদের আ. মাঝে হযরত ইউসুফ আ.কে স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম দেওয়া হয়েছিল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার উসূল জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ফলে পৃথক একটি বিষয় সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই বিষয়ে বড় বড় আলেম ও ইমাম সৃষ্টি হয়েছেন, যারা উক্ত উসূল ও মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং তাকে অংশবিশেষ ইলম দেওয়া হয়নি বরং সামগ্রিক ইলম দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, হযরত ইউসুফ আ.কে স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম তথা যখন যে স্বপ্ন দেখা হতো, তখন তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন। কিন্তু ওই উসূল ও মূলনীতি যার দ্বারা স্বপ্ন ব্যাখ্যার পদ্ধতি জানা যাবে, তা পৃথক বিষয় আকারে ছিল না। কিন্তু জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মূলনীতি প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং পৃথক বিষয়ের রূপ ধারণ করেছে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর সামনে স্বপ্ন বলা হতো। তখন যে ব্যাখ্যা তার অন্তরে ইলকা করা হতো, তিনি তা-ই বলে দিতেন। আর সেই ঘটনা প্রকাশ পেত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল ব্যাখ্যা বলতেন, সাথে-সাথে সেগুলোর দলিল-প্রমাণ পেশ করতেন। ফলে আলেমগণ সেগুলোকে একত্রিত করে একটি ভিন্ন ও পৃথক বিষয়ের রূপ দান করেছেন।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম ইলমে মাকসুদা নয়। ইলমে মাকসুদা হলো আহকাম তথা বিধিবিধানের ইলম, যার উপর পরিচালিত হয়ে মানুষ সর্বকালীন কামিয়াবী অর্জন করবে। পরকালীন নাজাত লাভ করবে। সারাজীবন যদি কেউ স্বপ্নব্যাখ্যার ইলম অর্জন না করে কোনো বিষয়ের ইলম না শেখে, তাহলে কেয়ামত দিবসে তাকে এমন প্রশ্ন করা হবে না যে, তুমি কেন স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইলম শেখনি? কারণ, তা ইলমে মাকসুদার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু তারপরও কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে এমন ইলমের বুনিয়াদ আবিষ্কার হয়, যা ইলমে মাকসুদা নয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীস সেটিকে একটি পৃথক বিষয়ের অবয়বে রূপ দান করে। আর আলেমগণ আপন মেধা ও বুদ্ধি মোতাবেক ওই ফন ও বিষয়কে বিন্যস্ত করেন।

সারকথা, অন্যান্য নবীদের আ. বিশেষ ও নির্দিষ্ট ইলম দান করা হয়েছে। আর হযরত ইউসুফ আ.-এর বুনিয়াদই স্বপ্নের উপর হয়েছে। সেজন্য স্বপ্নের ইলম তাঁর উপর নাযিল হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ○

আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, এগারটি তারকা এবং চন্দ্র ও সূর্য আমাকে সিজদা করছে। *[সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪]*

এখান থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর নবুওয়তের সূচনা হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্য হলো তার পিতা-মাতা আর তারকা হলো তাঁর এগার ভাই। তারপর দীর্ঘ কাহিনী সংঘটিত হয়েছে। কেনানের কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেখান থেকে উঠানো হয়েছে। তারপর কেনানের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। তারপর মিসর রাজ্যের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর এগার ভাই সাহায্যকারী হয়ে সেখানে পৌঁছেন। তাদের তিনিই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পরিশেষে হযরত ইয়াকুব আ.ও সস্ত্রীক মিসর পৌঁছেছেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সম্মান প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাঁর সূচনা হয়েছিল স্বপ্ন দ্বারা। তাই স্বপ্নের ইলম তাঁকে পৃথকভাবে দান করা হয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা তার

নিকট নাযিল হতো। মোটকথা, সকল নবীকে যে সমস্ত উলুম দেওয়া হয়েছিল, তার সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল উলুমের পরিপূরক বানানো হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তিনি সর্বশেষে আগমন করেছেন। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যখন নিম্ন আদালতে রায় চলে এবং আপিল চলে, তখন সর্বোচ্চ আদালতে সর্বশেষ রায় হলে তারপর আর কোন স্থানে মামলা চলে না। ওখানে একেবারে সমাপ্ত হয়ে যায়।

খাতামুন নাবীয়্যিনের জন্য পরিপূর্ণতা আবশ্যক

কোন স্কুল বা কলেজের সকল শিক্ষকদের মধ্যে কিছু শিক্ষক প্রাথমিক স্তরের হয়ে থাকেন, যারা প্রাথমিক ইলম শিক্ষা দেন। তাদের উপর মাধ্যমিক পর্যায়ের উস্তাদরা থাকেন, যারা আরো উপরের ইলম শেখান। সর্বশেষ শিক্ষক যাকে প্রিন্সিপাল বলা হয়, তিনি সর্বোচ্চ শিক্ষক যিনি সর্বোচ্চ ইলম শিখান। তাই নিয়মমাফিক প্রিন্সিপালের এমন ইলম থাকা চাই, যা তার অধীনদের মাঝে রয়েছে। কিন্তু অধীনদের জন্য আবশ্যক নয় এত পরিমাণ ইলম রাখা, যা প্রধান শিক্ষকের মাঝে রয়েছে। তারা প্রাথমিক পর্যায়ের ইলম শেখান।

পৃথিবীতে হযরত আদম আ. এলেন। তাঁকে প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞান তথা শিশুদের জ্ঞান দেওয়া হলো। শিশুদের প্রথমে যা শেখানো হয়, তাহলো বস্তুর নাম যে এটি রুটি, ওটি লোটা, এটি জমিন, ওটি আসমান ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং সর্বপ্রথম ইলম হলো বস্তুর নাম, যা ব্যতীত বস্তুর মাঝে পার্থক্য করা যায় না। সে-কারণে সর্বপ্রথম নবী এসে বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদমকে সকল বস্তুর নাম শেখানো হয়েছে। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৩১]*

তারপর হযরত নূহ আ. এলেন। তিনি বস্তুর নাম জানতেন। তাই তাকে আরো উন্নত ইলম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি নামের পদবী এবং বস্তুর কর্মকে সামনে রেখে আল্লাহর মারেফত উম্মতের নিকট তুলে ধরেছেন, যেগুলোর নাম তিনি আগেই শিখেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝

হে মানবকূল! তোমরা কি লক্ষ করছ না যে, আল্লাহ সপ্ত আকাশকে কিভাবে স্তরে-স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? *[সূরা নূহ : আয়াত ১৫]*

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا○

আল্লাহ জমিন থেকে তোমাদের এমনভাবে দগত করেছেন যেমনভাবে বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়। জমিনের বিভিন্ন অংশ একত্রিত করে তোমাদের মানব অবয়ব বানিয়েছেন। *[সূরা নূহ : আয়াত ১৭]*

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জমিন থেকে লালন-পালন করেছেন এবং পরিপূর্ণ করেছেন। মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, হযরত নূহ আ. আসমান ও জমিনের নাম শেখাননি বরং নামওয়ালা বস্তুকে সামনে রেখে সেগুলো দেখিয়ে এদের সৃষ্টিকর্তার জাতের পরিচয় শিখিয়েছেন। মোটকথা, হযরত আদম আ. শুধু নাম শেখাতেন আর হযরত নূহ আ. নামের সুরত দেখাতে শুরু করেন। তারপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর যামানা এল। তিনি শুধু আসমান ও জমিনের সুরত ও আকৃতি দেখাননি। ইরশাদ হয়েছে–

وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ○

আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে আসমান ও জমিনসমূহের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। *[সূরা আনআম : আয়াত ৭৫]*

আসমান ও জমিনের নয় বরং তাকে মালাকুতের ইলম দেওয়া হয়েছে। মালাকুত হাকায়েককে বলে। অর্থাৎ আসমান ও জমিনসমূহের হাকিকত ও মূল আত্মা দেখানো হয়েছে, খুলে দেওয়া হয়েছে। অতএব, প্রথমজন শুধু নাম শিখিয়েছেন, দ্বিতীয়জন আকৃতি দেখিয়েছেন আর তৃতীয়জন বস্তুর হাকিকত দেখিয়েছেন যে, এই বস্তুর সুরতের মধ্যে এই হাকিকত লুকায়িত রয়েছে। গ্রহ ও উপগ্রহের আত্মার খবর দিয়েছেন। জমিনের আত্মা ও হাকিকতের খবর দিয়েছেন। যখন বস্তুর নাম জানা হয়েছে, সুরত ও আকৃতি জানা হয়েছে, জানা হয়েছে তার হাকিকত ও মাহিয়াত এখন জানা থাকা দরকার, এগুলোর বিধিবিধান কী? এগুলোর বৈশিষ্ট্য কী?

অতঃপর হযরত মুসা আ. এসে সেগুলোর আহকাম বর্ণনা করেছেন। তাঁর

ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, আমি তাকে তাওরাত দিয়েছি, যাতে প্রতিটি বস্তুর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বস্তুর বিধান তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

অতএব, যখন কোন বস্তুর নাম জানা হলো, আকৃতি জানা হলো, হাকিকতও জানা হলো এবং বৈশিষ্ট্য এবং রোগ-দোষও জানা হলো, এখন তার হুকুম জানার পর প্রয়োজন হলো তার ইল্লত (কারণ) ও রহস্য জানা, তার দলিল ও হাকিকত জানা।

উম্মি নবীর দীনের বৈশিষ্ট্য

তাই জনাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাকায়েকে শরঈয়্যাহর ইলম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুর নাম জানা, সুরত জানা, হাকিকত জানা এবং আহকামও জানা কিন্তু আহকামের হাকিকত জানা নেই। তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে, যাকে কুরআনুল কারীম বলে। তার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

تبیانا لکل شیی

তিব্‌য়ান বলা হয় দালিলিক দাবিকে, যা দাবি করা হবে তাতে ইল্লত লুকায়িত থাকবে। যে হুকুম পেশ করা হবে, তাতে হেকমত গোপন থাকবে। এগুলোকে মুজতাহিদগণ কাজে লাগিয়েছেন এবং ইল্লত ও রহস্য উদঘাটন করে ফিকাহ্ আবিষ্কার করেছেন এবং আহকাম উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং নবীদের উপর আস্‌লি শরীয়ত নাযিল হয়েছে আর উম্মতের রব্বানী আলেম ও ইমামদের উপর প্রত্যক্ষবাদী শরীয়ত নাযিল হয়েছে যে, তারা আসল শরীয়ত থেকে অনুসন্ধান করে প্রত্যক্ষবাদী শরীয়ত সৃষ্টি করবে– আহকাম উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করবে। অতএব, ইজতিহাদ শুধু হুকুমের উপর হয় না বরং হুকুমের ইল্লতের উপর হয় যে, যদি এই ইল্লত পাওযা যায়, তাহলে তার উপর এই হুকুম বর্তাবে। আর এই ইল্লত অন্য কোন স্থানে পাওয়া গেলে সেখানে এই হুকুম আরোপিত হবে। একে কিয়াস বলে।

যদি কোন পরিপূরক ইল্লতের কারণে হুকুম সম্মিলিত বা অংশীদারি করা হয় যে, যে হুকুম এখানে তা সেখানেও হবে। এ-কারণে মুজতাহিদ সৃষ্টি হয়েছেন। সেগুলো তাদের আংশিকভাবে জানা থাকত, তারা তার ওপর প্রথাগতভাবে আমল করতেন। কিন্তু এই শরীয়তে আহকাম দেওয়ার পাশাপাশি ইল্লাত ও রহস্যভেদ তথা হেকমতও দেওয়া হয়েছে, যাতে এক হুকুমের উপর কিয়াস তথা তুলনা করে হাজারো হুকুম সৃষ্টি করা যায়।

উম্মি নবীর ইলমের শান হলো জমইয়্যাত

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে সমস্ত আহকামের ইল্লত বয়ান করা হবে, সেগুলো পূর্ব থেকে অবগত থাকবে। যদি জানা না থাকে, তাহলে ইল্লত কোথা হতে বর্ণনা করবে? আর যে সমস্ত আহকাম জানা থাকবে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ব অবগতি থাকবে। অন্যথায় হুকুম বয়ান করবে কিভাবে? আর যখন বস্তুর ইলম হাসিল হবে, তখন অবশ্যই সেই বস্তুর সুরত ও আকৃতি জানা থাকবে। আর যখন সুরত জানা থাকবে, তখন সেগুলোর নামও জানা থাকবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের গভীরতা ও প্রশস্ততা কত এবং কী পরিমাণ সম্পূরক। আর এমন জামেউল উলুম ব্যক্তিত্বের উপর যে ইলম নাযিল করা হবে, সেগুলোর সুপ্রশস্ততা ও গভীরতা কেমন হবে। যেহেতু তিনি খাতামুন নাবীয়্যিন হিসেবে আগমনকারী ছিলেন, সেজন্য তার পবিত্র সত্তার মধ্যে পূর্ব যুগের সকল নবীর উলুম প্রকাশিত করা হয়েছে। একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট যে, তিনি উম্মি তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এমন গভীর ইলম পেশ করেছেন। অথচ প্রকাশ্য সুরতে এগুলো তার ইলম নয়। তাহলে একথা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তাকে ইলম প্রদান করেছেন এক পবিত্র সত্তা যে তিনি উম্মি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক উলুমের উৎসের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। তাঁর ইলমি সিফাত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক জাতে ইলম স্থানান্তরিত হবে।

অতএব উম্মিয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়তের সবচেয়ে বড় এবং বিশেষ দলিল। প্রকাশ্যভাবে উম্মি হওয়া একটি দোষ। কিন্তু তা উম্মতের জন্য। নবীর জন্য তা আযমতের দলিল।

একটি কথা পেশ করলাম। সময় অনেক হয়ে গেছে। এখন দোয়া করা যাক যে, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তেবার তাওফীক দান করেন এবং সবাইকে তার রেজামন্দি অর্জনের সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বয়ান : ২

বিপ্লবের পথনির্দেশ

সাহাবায়ে কেরাম কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআনুল কারীম গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁদের অন্তর পরিবর্তন হয়েছে, রূহ পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে জযবা।

অতঃপর তাঁরা যেখানেই পৌঁছেছেন, ওখানেই ইনকিলাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিসরা ও কায়সারের সিংহাসন উল্টে দিয়েছেন। সিংহাসন উল্টে দেওয়ার অর্থ হলো রাজ্য জয় করা। কায়সারের সাম্রাজ্য বিজয় হয়। রোমানরা পরাজিত হয়। রোমসাম্রাজ্য পদানত হয়। কিসরার সাম্রাজ্য বিজয় হয়। ইরানের উপর কর্তৃত্ব লাভ হয়।

রাজ্য বিজয় কোন বড় বিষয় নয়। কিন্তু বড় কথা হলো, তাঁরা যেখানেই পৌঁছেছেন, দেশ বদলে ফেলেছেন, তাহজিব ও তামাদ্দুন বদলে দিয়েছেন, ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছেন, পরিবর্তন করেছেন ভাষা। সকল জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এই পরিবর্তন ও ইনকিলাবের শান সাহাবাদের মাঝে কোত্থেকে এল? কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে এল। তারা কুরআনকে নিয়ে চলেছেন এবং তাকে জীবনের দস্তুর বানিয়েছেন। ফলে জগতের চিত্র পাল্টে দিয়েছেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا○

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ○ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ○ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ○ وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ○ وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ○ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ○ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ○ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ○ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ○ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ○ وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ○

নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী, যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী। সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। অতএব, তোমরা

কোথায় যাচ্ছ? এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ, তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। *[সূরা তাকভির : ১৯-২৯]*

বাস্তব অবস্থা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনারা কুরআনুল কারীমের তরজমা শুরু করে অনেক বড় একটি কল্যাণকর কাজ হাতে নিয়েছেন এবং অনেক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর বরকত ইহজগতে ও পরজগতে উভয় স্থানে প্রকাশ পাবে ইনশাআল্লাহ। যদি তা আপনারা পাবন্দীর সঙ্গে করে যান এবং একে ইস্তকামাতের (দৃঢ়তার) সাথে আগে বাড়েন।

বক্তার প্রভাব প্রকাশের মাধ্যম

কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক কালামে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থাকে। মুতাকাল্লিম তথা বক্তা যেমন হয়, কালামের প্রভাবও তেমন প্রকাশ পায়। কুরআনুল কারীম বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে প্রকাশ করে। তাঁর গুণাবলিকে প্রকাশ করে। তাঁর কর্মাবলিকে প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা দেখব, তাহলে সে যেন অন্ত রচক্ষু দ্বারা কুরআনুল কারীমকে তেলাওয়াত করে। তাহলে আল্লাহকে দেখতে পাবে।

ইবাদাতের উদ্দেশ্য

এমন কে আছে, যার অন্তরে আল্লাহ দেখার তামান্না নেই? তাঁকে দেখার জন্যই সকল ইবাদত করা হয়। আর এটি কোনো স্বভাবজাত তামান্না নয় বরং শরয়ী তামান্না। অর্থাৎ শরীয়তও এমন হেদায়েত প্রদান করে। ইরশাদ হয়েছে–

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাঁকে নিজ

চোখে দেখতে পাচ্ছ। যদি এমনটি না হয়, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু হবে যে, তুমি একথা একিন করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

এখানে আল্লাহর দিদারের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেওয়া হয়েছে। একথার সারনির্যাস হলো, ইবাদত করা হয় দেখার জন্য যে, আপন মাবুদকে নিজ চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করবে। এমন তামান্না প্রত্যেক ইবাদাতকারীর অন্তরে রয়েছে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দিদারের অনুশীলন করা হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যখন মানুষ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে তার দৃষ্টি থাকে চাটাইয়ের উপর। কিন্তু আসলে তার দৃষ্টি থাকে আল্লাহ পাকের পবিত্র চেহারার উপর। কিন্তু আজ নামাযী ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না, আমি আল্লাহর চেহারা দেখছি। তবে যখন কালবের মধ্যে উক্ত তামান্না জমতে-জমতে শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে এবং উক্ত কল্পনায় জীবন কেটে যাবে, তখন হঠাৎ ওই ঝলক চোখের সামনে ভেসে উঠবে, যে তামান্না নিয়ে মানুষ ইবাদত করে যাচ্ছে।

অতএব, ইবাদত করাই হয় দেখার জন্য। ইবাদতের উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে, আবেদ ও মাবুদ একজন অপরজনকে দেখবেন। উক্ত হাদীসে আল্লাহর দিদারের তদবির বলে দেওয়া হয়েছে যে, মনে-মনে এমন কল্পনা কর যে, আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত। আমার দৃষ্টি তাঁর চেহারা মোবারকে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর নামাযে কালামুল্লাহর তেলাওয়াত হয়। এতে আল্লাহ তায়ালার সিফাতে কামাল প্রকাশ হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

সকল প্রশংসা ওই সত্তার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকারী। তিনি রহমান ও রাহীম।*[সূরা ফাতেহা : আয়াত ১, ২]*

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ

যিনি কেয়ামত দিবসের অধিপতি। *[সূরা ফাতেহা : আয়াত ৩]*

যেদিন সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন একত্রিত হবে, আজও তাঁরই রাজত্ব। কিন্তু ওই দিন তাঁর রাজত্ব প্রকাশ পাবে সমস্ত বনি আদমের উপর। আল্লাহকে দেখার অনুশীলন করতে থাকলে যখন সারা জীবন উক্ত কল্পনায় কাটিয়ে দিবে, তখন একদিন-না-একদিন ওই বস্তু প্রকাশ হবে, যা অন্তরে

গচ্ছিত ছিল। মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস হলো, সে যে কল্পনা অন্তরে জমা করে, তা একদিন তার চোখের সামনে চলে আসে।

তেলাওয়াত সর্বোচ্চ সৌন্দর্য অর্জনের মাধ্যম

তেমনিভাবে যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত অবস্থায় আল্লাহর ধ্যান অন্তরে জমানো হয়, তখন তা জমে যায়। এমন একটি সময় আসবে, যখন অন্তরে জমানো বস্তু চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

এটি ফিতরতি বস্তু। জাগতিক বস্তু চল্লিশ দিন পর, একশো দিন পর এসে যায়। কিন্তু আল্লাহর দিদার যেহেতু সর্বোচ্চ সৌন্দর্য, তাই তাতে সারাটা জীবন ব্যয় করতে হবে। যদি সারাজীবন কল্পনা পুঁজি করা হয়, তাহলে ওই বস্তু সামনে জাহির হবে এবং আল্লাহর সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে।

এজন্য আমি আরজ করছি, যেব্যক্তি আল্লাহকে দেখতে চায়, সে যেন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যে, যখন কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করবে, তখন প্রতিটি হরফে আল্লাহর ধ্যান করবে এবং এভাবে তা অন্তরে মজবুতভাবে বসাবে। তাহলে দুনিয়াতে তাঁর ঝলক দেখতে পাবে এবং পরকালে দিদার লাভ হবে। সুতরাং আপনারা কুরআনুল কারীমের তরজমা শুরু করে অনেক মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক কল্যাণকর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

জীবনের বিধান

যদি স্বাভাবিকভাবে শুধু তরজমা শোনানো হয়, তাহলে সাওয়াব তো পাওয়া যাবে; কিন্তু যদি এমন ধ্যানে তরজমা করা হয় যে, আমার আল্লাহ কী বলেছেন, এটি কেমন কর্মপন্থা, যার উপর আমি চলব। অতএব এক তো শুধু তার অর্থ বোঝা আর দ্বিতীয় হলো অর্থ বোঝার পাশাপাশি অর্থকে কর্মপন্থা বানানো যে, এর উপর আমাকে চলতে হবে। কুরআনুল কারীম যেহেতু কানুনের কিতাব আর কানুন এজন্য নয় যে, মানুষ তা বারবার পাঠ করবে। বরং এজন্য পড়তে হবে যে, এতে সরকারের সংবিধান রয়েছে এবং সরকার পরিচালনার পলিসি রয়েছে, যাতে অন্যায় থেকে বাঁচতে পারে এবং কানুনের উপর সঠিকভাবে চলতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আপন কালাম নাযিল করেছেন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়। তেলাওয়াত তো প্রাথমিক স্তরের কাজ। আসল কাজ হলো এ কথা বোঝা যে, এতে কী বলা হচ্ছে, এই কালাম

কেন নাযিল করা হচ্ছে? এতে কাকে সম্বোধন করা হচ্ছে? আমি কিভাবে জীবন পরিচালনা করব। এটি তো আমার জীবনবিধান। এমন নিয়ত ও কল্পনা নিয়ে কুরআন পাঠ করলে কাইফিয়্যাত ভিন্ন হবে। এজন্য আমি আরজ করেছি, আপনারা অনেক কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যে, কুরআনের তরজমা শুরু করেছেন।

কুরআনের শব্দাবলি আল্লাহর কামালাতের প্রকাশস্থল

কুরআনুল কারীম সম্পর্কে হাদীসে নববীতে ইরশাদ হয়েছে–

تبرك بالقران فانه كلام الله وخرج منه

কুরআন দ্বারা বরকত অর্জন কর। কারণ, এটি আল্লাহর কালাম এবং তা আল্লাহর জাত থেকে বের হয়েছে।

কালাম বা কথা মুতাকল্লিম তথা বক্তার ভিতর হতে বের হয়ে প্রকাশ হয়। কালাম তার জযবা হয়ে থাকে, যাকে শব্দাবলির আবরণ পরিধান করিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমি কোন হাসির কথা বললে আপনারা হাসবেন। এটি শব্দের প্রভাবের কারণে হবে না। বরং তা ঐ জযবার প্রভাবে হবে, যা আমার অন্তরে পূর্ব থেকে ছিল যে আমি আপনাদের হাসাব। শব্দকে তো শুধু আড়াল বানানো হয়। যদি মন চায় আপনাদের কাঁদাব, তাহলে এমন কথা বলা হবে, যার কারণে চোখ থেকে পানি বের হতে থাকবে।

অতএব, তা শুধু শব্দের প্রভাবে নয় বরং ওই জযবার প্রভাবে, যা বক্তা ইচ্ছা করেছিল, শব্দকে আপনি পর্দা বানিয়েছেন আর জযবা অন্তরে পূর্ব থেকেই জড়িত ছিল। ফলে মানুষ ক্রন্দন করেছে। অতঃপর আপনার মনে জযবা উদয় হলো যে, অমুককে খুশি করবেন, হাসাবেন। তখন এমন কিছু কথা বললেন যে, সে অনায়াসে হেসে উঠল এবং খুশি প্রকাশ করল। এহেন অবস্থা শুধু শব্দ দ্বারা নয়; বরং ওই ভিতরগত জযবা, যা শব্দের আবরণ পরিধান করে তার অন্তরে প্রভাব ফেলেছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের শব্দাবলি নাযিল করলেন। এই শব্দাবলিতে ওই কামাল লুকায়িত রয়েছে, যা বক্তার ভিতরে ছিল। সেই কামাল প্রকাশ পায় এই শব্দাবলির মাধ্যমে। দুনিয়াতে কোন জযবা শব্দ ব্যতীত বুঝে আসবে না। সেইজন্য শব্দকে মধ্যস্থতাকারী বানানো আবশ্যক। আর এই শব্দাবলির ভিতরে আল্লাহ তায়ালা আপন কামালকে লুকিয়ে রেখেছেন এবং এই

শব্দাবলির মাধ্যমেই আপন কামালকে বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং তাদের অন্তরে সেই কামাল পৌঁছেছে তাদের নিয়তের কারণে। যদি আপনি তেলাওয়াত করেন আর খেয়াল করেন যে, এখানে কী বলা হচ্ছে এবং আমার অন্তরে কামালাত কিভাবে অবতীর্ণ হবে, তাহলে আরো শান বৃদ্ধি পাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

تبرك بالقران فانه كلام الله وخرج منه

কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল কর। কেননা, তা আল্লাহর কালাম এবং তা তাঁর জাত থেকে বের হয়েছে।

বক্তা যা বলে তা ভিতর থেকে বলে। শব্দ শুধু আড়াল মাত্র।

হাদীস শরীফের বাক্য خرج منه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি কামালাতের সাথে সম্পর্ক গড়ল, সে আল্লাহর বাতেন তথা ভিতরের সাথে সম্পর্ক গড়েছে। আর যখন বাতেন প্রকাশ পাবে, তখন জানতে পারবে, বান্দা আল্লাহর বাতেনের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করেছে। আল্লাহর কামালাতের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করেছে। সুতরাং কুরআনুল কারীম একটি বরকতময় বস্তু। পৃথিবীতে যত প্রকার বস্তু রয়েছে সবই আল্লাহর বরকতময় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। জমিন আল্লাহর তাবাররুক এবং দান, যা দ্বারা আমরা কর্ম সম্পাদন করে থাকি। এই আসমান ও চাঁদ-সুরুজও আল্লাহর তাবাররুক। এগুলো দ্বারা আমরা লাভবান হই। কিন্তু আসমান ও জমিন এবং চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি এগুলো আল্লাহর বাতেন হতে বের হয়ে আসেনি। তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, জগতের সকল বস্তুই এমন যে, আল্লাহর হুকুম দ্বারা আদম তথা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আল্লাহর ভিতর থেকে আসেনি। কিন্তু কুরআনুল কারীম তাঁর ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে। কুরআন হলো তাঁর কালাম। সেজন্য কুরআনের সাথে তায়ালুক স্বয়ং আল্লাহর বাতেন তথা ভিতরের সাথে তায়ালুক।

আল্লাহর রজ্জু এবং তা ধারণ করার কর্মপদ্ধতি

আপনাদের উপরে ওঠানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা একটি রশি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, যা দ্বারা আপনাদের টেনে উঠানো হবে। শায়েখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রহ. যিনি অনেক বড় সুফী সাধক ছিলেন। অনেক বড় মাপের ওলী ছিলেন। তিনি বলতেন, এটি শুধু তার দাবি নয় বরং কুরআন ও হাদীস

থেকেও তা বের হয়ে আসে যে, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যে ফাঁকা স্থান রয়েছে, তা জাহান্নামের এলাকা। এখানেই কেয়ামত দিবসে আগুন ও কষ্টদায়ক বস্তু প্রকাশ পাবে। এখন আমাদের একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, এই মুহূর্তে আমরা সবাই জাহান্নামে অবস্থান করছি। আল্লাহ তায়ালা উপর থেকে একটি রশি ঝুলিয়েছেন যে, যাকে বের করতে চান, সে ওই রশিকে ধারণ করবে। আমরা যখন উক্ত রশিকে টানব তখন রশি আমাদের নিকট এসে যাবে এবং আমাদের এই অঞ্চল থেকে বের করে নিবে।

বাস্তবে উক্ত রশি হলো কুরআনুল কারীম। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীম ইরশাদ হয়েছে–

واعتصموا بحبل الله جميعا

আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর।

এই ঝুলন্ত রশি, যা আরশ থেকে ঝুলানো হয়েছে এবং জমিনে এসে পড়েছে। যখন উক্ত রশিকে টেনে উপরে উঠানো হবে, তখন যারা উক্ত রশিকে ধারণ করবে, তারা জাহান্নামের এলাকা হতে উপরে চলে যাবে। অতএব কাফেরদের জাহান্নামে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হবে না। তারা তো জাহান্নামেই আছে। মুমিনদের জাহান্নাম থেকে ভাগতে হবে। আর ভেগে যাওয়ার পদ্ধতি হলো আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে। যখন রশিকে টেনে উঠানো হবে, তখন ধারণকারীগণ জাহানামের এলাকা থেকে উঠে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই রশি পাট দ্বারা পাকানো রশি নয় এবং রেশম সুতার রশি নয় যে, এতে হাত দ্বারা ধরা যাবে। এই রশি ইলম ও কামালাতের রশি। একে ধারণ করার অর্থ হলো, অন্তর দ্বারা ঈমান এনে একে অন্তরে জমা করতে হবে। তা হাত দ্বারা ধারণ করার বস্তু নয়, অন্তর দ্বারা ধারণ করার ব্যস্ত। যে ব্যক্তি একে অন্তর দ্বারা ধরেছে, সে পাকিয়ে গেছে, মিশে গেছে আল্লাহর রশির সাথে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, সে আল্লাহর বাতেন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ তাঁর সাথে মিশে যাবে।

আযমত ও মহব্বতের তাকাজা

মানুষ কাউকে দূর থেকেও দেখতে পারে। কিন্তু যদি এতটুকু নিকটে হয় যে, নিজের পার্শ্বে বসিয়ে দেয়, তাহলে দেখার সাথে-সাথে মিলনও নসীব হবে।

এই কারণে মানুষ যখন নিজের বড়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তখন শুধু দেখার উপর সন্তুষ্ট থাকে না। মন চায় মিশতে, মুসাফাহা করতে। এর অর্থ শরীরের সাথে মিশে যাওয়া। তারপরও আরো মন চায়, মুয়ানাকাও করবে, যাতে পরিপূর্ণরূপে তার সাথে মিশে যায়। অতএব, শুধু দেখার উপর সন্তুষ্ট থাকে না। বরং মিলনের জন্য আগে বাড়ে। আর মিলন এমন নয় যে, ছেড়ে দেবে বরং মুয়ানাকা করে মিশে যায়, জড়িত হয়ে যায়, যাতে তার প্রভাব ও আছর তার মাঝে পরিপূর্ণরূপে চলে আসে।

মানুষের স্বভাবজাত ও জন্মগত চাহিদা হলো, তার ভিতর যে বস্তুর যত পরিমাণ আযমত থাকবে, সে তার সাথে তত পরিমাণ মিশতে চাইবে। মহব্বতের তাকাজাও তাই। আল্লাহ তায়ালার এই কুরআন এজন্য নাযিল করেছেন যে, তাঁর কালামকে পড়ে দেখবে। এতে তাঁর কামালাত দেখতে পাবে, পড়তে পড়তে তা অন্তরে বসে যাবে। যখন অন্তর তাঁর কামালাতকে গ্রহণ করে নেবে, এ কথার অর্থ হলো তাঁর রশিকে অন্তরের হাতে মজবুতভাবে ধারণ করা। তারপর আল্লাহ যখন উক্ত রশিকে টান দেবেন, তখন সেও টানের সাথে চলে যাবে, মুলাকাত হবে, মুয়ানাকা হবে এবং আল্লাহ তায়ালার পাশে বসে যাবে।

কেয়ামত দিবসে গুণ হিসেবে বিভক্ত হবে

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামত দিবসে কিছু দল হবে বিভিন্ন গুণ হিসেবে। তন্মধ্যে কিছু থাকবে যাদের নিকট মন্দ আমল থাকবে। তন্মধ্যে যে আমল যার নিকট বেশি থাকবে, সেই হিসাবে দল বা জামাত হবে। উদাহরণস্বরূপ যিনাকারীদের একটি দল হবে, চোরদের একটি দল হবে। এমনিভাবে আরো বিভিন্ন দল হবে। আর কিছু থাকবে আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রিয় বান্দা। তাদের মধ্যে যার যে আমল বেশি থাকবে, সেই হিসেবে সারিবদ্ধ করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি আপন আমলে নামাযকে বেশি ভালোবাসত, তাকে নামাযীদের সাথে জামাতবন্দি করা হবে। যে রোযার প্রতি বেশি ভালোবাসা রাখত, তাকে রোযাদারদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। যে সদকাকে মহব্বত করত, তাকে দানশীলদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। প্রত্যেক জামাতে কোটি-কোটি মানুষ থাকবে। যার মধ্যে যে সিফাত প্রবল থাকবে, তাকে সেই অনুযায়ী দলবদ্ধ করা হবে।

তেমনিভাবে দুনিয়াতে যারা কষ্ট করেছে, তাদের জামাত ভিন্ন হবে। উদাহরণস্বরূপ অন্ধদের পৃথক জামাত হবে। বনি আদমের মধ্যে যারা অন্ধ ছিল তাদের একটি জামাত হবে। তাদের নেতা বানানো হবে হযরত শুয়াইব আ.কে। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর হাতে একটি সাদা পতাকা থাকবে। তা বাড়ির ন্যায় চমকাতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা অন্ধদের সম্বোধন করে বলবেন, দুনিয়াতে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। একটি বড় নেয়ামত থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছিলাম। কিন্তু তোমরা সবর করেছিলে, কোন প্রকার হাহুতাশ করনি। আজ তোমাদের চোখ খোলা। এই শুয়াইব নূরানী পতাকা নিয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা আমার চেহারা ও সৌন্দর্য দেখতে থাক। সর্বকালীন যিন্দেগীর জন্য তোমাদের চোখ খুলে দেওয়া হলো। আরো বলা হবে, তোমরা আরশের ডান পার্শ্বে এসে অবস্থান কর। তোমরা আমার মেহমান। তাদের সামনে নেয়ামত রাখা হবে। আল্লাহ তায়ালার কত বড় ইহসান যে, ময়দানে হাশর কায়েম হবে, সৃষ্টিজীবের হিসাব-কিতাব হতে থাকবে। অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। তারা আল্লাহর নিকট মেহমানের মর্যাদা পাবে আর বিভিন্ন নেয়ামত ব্যবহার করবে, উপভোগ করবে।

যখন উক্ত অন্ধদের জামাত এমন শান নিয়ে আগে বাড়বে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলে মেহমান বানাবেন, ঠিক তখন আলেমদের জামাত আগে বাড়বে এবং বলবে আমাদের তালকীন ও বলার দ্বারা অন্ধরা সবর করেছিল। আজ আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করে না আর তাদেরকে আরশের ডান পার্শ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অন্ধদের বলবেন, তাদের বসতে দাও আর তোমরা আরশের ডান পার্শ্বে চলে এসো। তারা আরশের ডান পার্শ্বে নেয়ামতসমূহে থাকবে। উলামারা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

তারপর ডাকা হবে ঐ সমস্ত লোকদের, যারা দুনিয়াতে কুষ্ঠরোগে লিপ্ত ছিল। দুনিয়াবাসীরা তাদের উচ্ছিষ্ট বানিয়ে রেখেছিল। তাদের কেউ ধরত না, স্পর্শ করত না। কিয়ামতের দিন তাদের দেহ চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের ইমাম বানানো হবে হযরত আউয়ুব আ.কে। তাঁকে সবুজ ঝাণ্ডা দেওয়া হবে। কারণ, তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এবং অনেক রোগ সয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন, তোমরাও আরশের ডান পার্শ্বে এসে পড়। তখনও আলেমগণ বলবেন, আমাদের বলার দ্বারাই তো তারা সবর করেছে এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেছে। আজ আমাদের কেউ

জিজ্ঞেস করে না। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তাদের বসতে দাও আর তোমরাও আগে বাড়। এমনভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে।

আলেমদের পরকালীন মাকাম

বিপদগ্রস্তদের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আলেমদের সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা কি স্রেফ নেয়ামত অর্জন করতে চাও? তোমাদের কি এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তোমরা শুধু নিজের লাভ তালাশ করবে? বরং তোমাদের পাঠানো হয়েছিল জগতকে হিদায়েত করার জন্য। এখানে দাঁড়িয়ে মানুষদের জন্য সুপারিশ কর। যখন সবাইকে ক্ষমা করা হবে, তখন আগে বাড়বে। তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি বরং জগদ্বাসীর কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষের উপকার করবে, কল্যাণ করবে। সেসময় আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পাবে। তারা শাফায়েত করবে, তাদের শাফায়েতে লাখ লাখ মানুষের নাজাত মিলবে। রাব্বুল আলামীন বলবেন, এখন তোমরা নিজের দায়িত্ব ও কর্ম পুরা করেছ। দুনিয়াতে হিদায়েত করেছ আর এখানে শাফায়েত করেছ। তোমরা কি এমনটি চাও যে তোমাদের কোন চাকরি মিলে যাক, কোন নেয়ামত পেয়ে যাও? এমনটি তোমাদের কাজ ছিল না। তোমাদের কাজ ছিল দুনিয়াবাসী সব পেয়ে যাক আর তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে থাক। তাদের দেওয়ার পর তোমাদের সাওয়াব ও প্রতিদান মিলবে।

যাহোক, তারা যে আরশের ডান পার্শ্বে স্থান পেয়েছে তা ওই যে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বলেছিলাম, তোমাদের আল্লাহর পার্শ্বে স্থান মিলবে। তখন তারা আল্লাহকে চোখে দেখেছিল, কবরে তার ঝলক দেখেছে, হাশরে তার তাজাল্লি দেখেছে। পরিশেষে আরশের ডান পার্শ্বে স্থান পেয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পার্শ্বে বসেছে।

কুরআনুল কারীমের তাজাল্লি প্রকাশের ব্যবস্থাপনা

কুরআনুল কারীমের প্রভাব এমন হবে যে, আপনি কুরআন পড়বেন, তা পাঠ করে তার ভিতরের বস্তুসমূহ অন্তরে জমাবেন। ফলে আল্লাহর কামালাত পয়দা হবে, তার আযমত দিলে বসবে, ঈমান দৃঢ় হবে। ঈমানের নূর ও বরকত অন্তরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তা উপলব্ধির রূপে প্রকাশ পাবে। তারপর তার চেয়ে আরো বেশি অনুভব হবে। আবার হাশরের ময়দানে

আরো বেশি তাজাল্লি হবে। তারপর আল্লাহ তায়ালার পার্শ্ব যে, আমার নিকট চলে এসো। তখন ওই সমস্ত বস্তু পূর্ণতা লাভ করবে, যেগুলো ইবাদাতের উদ্দেশ্য ছিল। যে মাবুদকে দেখবে, তাঁর নিকটে যাবে, তাঁর সাথে মিশবে, তার পার্শ্বে বসবে এমন তামান্না শুধু কুরআনুল কারীম পাঠের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

সুতরাং আপনারা কুরআনের তরজমা শুরু করিয়ে মূলত মুসলমানদের জন্য রাস্তা খুলেছেন যে, তারা আল্লাহকে দেখবে, তার সাথে মিলিত হবে, তার পার্শ্বে বসবে, তাঁর সাথে মিশে যাবে। আপনারা অনেক কল্যাণকর কাজ করেছেন।

কুরআনুল কারীম ইনকিলাবের কিতাব

কুরআনুল কারীম একটি ইনকিলাবী কিতাব। অন্তরকে পাল্টে দেয়, রূহকে পরিবর্তন করে ফেলে। যারা এতে হাত লাগায়নি তারা বুঝতে পারবে না, কুরআন কী। কারণ, তারা একে ব্যবহার করেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু ব্যবহার করা না হয়, ততক্ষণ তার উপকারিতা জানা যায় না। না তার কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন– অনেক মূল্যবান ঔষধ রয়েছে যদি তা ব্যবহার না করা হয়, তাহলে কী প্রভাব ফেলবে? উদাহরণস্বরূপ মধুকে বলা হয়েছে যে এতে আরোগ্য রয়েছে, শিফা রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি মধুকে ভয় পায়। সে মনে করে, মধু যেন আমার ঘরে প্রবেশ না করে, তাহলে তার জন্য মধু কী উপকার করবে? তেমনিভাবে যে কুরআনুল কারীম থেকে দূরে থাকে, তাকে শ্রবণ করে না, তার কাছে বসে না, তাহলে কি তার নূর প্রকাশ পাবে? যে একে শ্রবণ করবে, তেলাওয়াত করবে, অন্তরে বসাবে, তার থেকে কুরআনের নূর ও বরকত প্রকাশ পাবে। সে-ই দেখতে পারবে।

অতএব, কুরআনুল কারীম একটি ইনকিলাবি কিতাব, অন্তরকে পরিবর্তন করে, রূহকে বদলে দেয়, কায়া ও আকৃতিকে পাল্টে দেয়। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে অন্তর ও রূহসমূহে খারাবী ভরপুর ছিল। মানুষ শিরকে লিপ্ত ছিল, বিদয়াত ও অন্যায় কর্মে তথা চুরি, ডাকাতি, ব্যিভিচার ইত্যাদি অন্যায় কর্ম তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাদের না ছিল আকিদা সঠিক, না ছিল আমল সঠিক। সম্পদও হালাল ছিল না। এক কথায় পশুত্বের জীবন ছিল।

জাহেলী যুগে নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড ছিল রাত-দিন ডাকাতি করা, রাত-দিন মারামারি করা। গোত্রে-গোত্রে ঝগড়া ও যুদ্ধবিগ্রহ করা। তারা সর্বদা এহেন

জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকত। এই নাজুক পরিস্থিতির সময় কুরআন নাযিল হলো। যারা একে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করল এবং তার কল্যাণ লাভ করল, তাদের কায়া পুরোপুরি পাল্টে গেল। প্রথমে তাদের নাম ছিল 'জুহালায়ে মক্কা'। যখন কুরআন গ্রহণ করল, তখন তাদের নাম হয়ে গেল 'সাহাবায়ে কেরাম রা.'।

তারা 'জুহালায়ে মক্কা' নাম পরিবর্তন হয়ে 'সাহাবায়ে কেরামে' পরিণত হলো। অথবা তাদের যমানা ছিল যামানায়ে জাহেলিয়্যাত, এখন তা পরিবর্তন হয়ে খাইরুল করুন তথা পৃথিবীর সর্বোত্তম যামানায় রূপান্তরিত হলো। তারা ওই সকল মানুষ, যারা মূর্খতায় ডুবে ছিল। পরে তারাই আলেমদের উস্তাদ হলো। আরেফ বিল্লাহদের শায়েখ হলো। তারাই সারা জগতকে আলোকিত করেছেন। একেবারে কায়া পাল্টে দিয়েছেন। যারা এক পয়সার জন্য ডাকাতি করত, গর্দান কেটে ফেলত, পয়সার জন্য মরে যেত, আজ তাদের অবস্থা এমন হলো যে, হাজারো সম্পদ চোখের সামনে, হাতের লাগালে পেয়ে তাকিয়েও দেখছে না।

একবার হযরত আলী রা. খেলাফতের ধনভাণ্ডারে গেলেন, সেখানে স্বর্ণ ও রূপার স্তূপ ছিল। বাইতুলমালে লাখ-লাখ টাকা সঞ্চিত ছিল। তিনি স্বর্ণ-রূপাকে সম্বোধন করে বললেন–

يادنيا غرى غيرى

হে দুনিয়া! অন্য কাউকে ধোঁকা দাও, আমি তোমার ধোঁকায় পড়ব না।

তিনি তৎক্ষণাৎ ধনভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ককে আদেশ দিলেন সম্পদগুলো দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করতে। সারারাত সম্পদ বণ্টন হলো। তাঁরা ওই মানুষ ছিলেন, যারা এক পয়সার জন্য জান দিত। আজ ধনভাণ্ডার পড়ে আছে। আর একে সম্বোধন করে বলছেন, আমি তোমাদের অনুরাগী নই, আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিব না।

এই আমূল পরবর্তন কোথা হতে এল? এই কুরআনই তাদের অন্তরকে বদলে দিয়েছিল। আত্মাকে পাল্টে দিয়েছিল। প্রথমে সম্পদের মহব্বত ছিল। এখন কামালের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে মাখলুকের মহব্বতে ছিল। এখন খালেকের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে। এখন তারা তার মহব্বতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, ডুবে গেছে। তারা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেল।

হযরত জাবের রা. লাখপতি সাহাবি ছিলেন। তিনি একদিন ঘরে তাশরিফ

রাখলেন। তাঁর মুহতারামা বিবি লক্ষ করলেন, তিনি অত্যন্ত পেরেশান। এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন যে, আজ আপনি পেরেশান কেন। তিনি বললেন, আজ ভাণ্ডারে অনেক সম্পদ জমা হয়েছে। অন্তরে ভারী বোঝা মনে হচ্ছে যে, এত সম্পদ কোথা হতে আমার মাথার বোঝা হলো। তাই আমি চিন্তিত। তাঁর স্ত্রীও সাহাবী ছিলেন। তিনি বললেন, এতে চিন্তার কী আছে। আল্লাহর নামে গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিন। একথা শুনে তিনি ভাণ্ডারে গেলেন এবং খাজাঞ্চিকে ডেকে বললেন, গরিবদের মাঝে অর্থ বিতরণ কর। ইয়াতিম ও বিধবাদের সাহায্য কর। সারা রাত মদিনার অলিগলিতে অর্থ বণ্টন হলো। সকাল বেলা হিসাব লাগানো হলে দেখা গেল সারারাত ছয় লাখ দিনার বণ্টন হলো। সকাল বেলা তিনি হাসি মুখে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। বিবির হাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, তুমি অনেক উত্তম তদবির বলেছ। এখন আমার অন্তর হালকা হয়েছে।

অতএব, তাদের পূর্বেকার অবস্থা ছিল এমন যে, তাদের অন্তর হালকা হতো যখন সম্পদ বেশি হতো আর আজ হালকা হচ্ছে সম্পদ শেষ হওয়ার কারণে। এটি কায়া পরিবর্তন নয় তো কী? ইনকিলাব নয় তো কী? তাদের অন্তর বদলে গেল।

মহিলাদের মাঝে ইনকিলাব

সম্পদের মহব্বত সবচেয়ে বেশি মহিলাদের হয়ে থাকে। তাদের থেকে এই রোগ পুরুষদের মাঝে ছড়ায়। নারীরা না হলে পুরুষদের মাঝে উক্ত রোগ ছড়াত না। মহিলাদের ভিতর সম্পদের মহব্বত এজন্য হয় যে, তারা জন্মের পর থেকে স্বর্ণ-রূপার জেওরের আওয়াজের মাঝে লালিত-পালিত হয়। একটু বড় হলে কর্নে ছিদ্র করা হয়। তখন তাতে দোল ঝোলে। নাক ছিদ্র করা হয়, নাকে নোলক ওঠে। হাত ও পায়ে স্বর্ণ-রূপার জেওর লাগে। গলায় ও কপালে জেওর ঝোলে। জন্ম থেকেই স্বর্ণ-রূপার মহব্বতে পড়ে। সেজন্য তাদের অন্তরে সম্পদের মহব্বত বসে যায়। সে সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

এমন মহিলা যে রাত-দিন অলংকারের ঝনঝন ধ্বনিতে লালিত-পালিত হচ্ছে, সে কি পূর্ণ আকল রাখে? *[সূরা যুখরুফ : আয়াত ১৮]*

ফলাফল এমন হয় যে, যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয়, তাহলে স্বামী নিজের দলিল-প্রমাণ পেশ করে। আর স্ত্রী মুরগীর একপা তাড়াতে থাকে। এক বুলি বুলতেই থাকে– কিছুই বুঝতে চেষ্টা করে না। কোন দলিল ও প্রমাণের তোয়াক্কা করে না। আপন কথার উপর স্থির থাকে। তাদের মাঝে কথা বলার শক্তি থাকে না। কারণ, জ্ঞান নেই। আর জ্ঞান এজন্য নেই যে, সে সম্পদ তথা স্বর্ণ-রূপার মাঝে মগ্ন থাকে। ইলম নূরানী বস্তু আর সম্পদ হলো কালো বস্তু। কালোর সঙ্গে নূর একত্রিত হতে পারে না। কালো চোখ দ্বারা দেখা যায়। আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন। বর্তমানে তো স্বর্ণ-রূপার মুদ্রা নেই। এখন সবই কাগজের। কিন্তু যখন স্বর্ণ-রূপার পয়সা ছিল, তখন পঞ্চাশ টাকা গণনা করলেই হাত কালো হয়ে যেত। আঙ্গুল কালো হয়ে যেত। স্বর্ণ-রূপার মধ্যে কালি লেগে থাকত। গণনা করতে-করতে হাত-পা কালো হয়ে যেত।

এজন্য মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ

যখন মহিলারা অলংকারাদির মাঝেই লালিত-পালিত হয়, তখন তাদের ভিতর ইলম ও কালামের শক্তি কোত্থেকে হবে।

তারা তো না বুঝে শুধুই ঠেলতে থাকবে। কোন দলিল-প্রমাণের তোয়াক্কা করবে না। অন্যজন লাখ দলিল পেশ করুক; সে আপন কথার উপর অটল থাকবে। কারণ, তাদের সম্পদের প্রতি মহব্বত বেশি থাকে। কিন্তু কুরআনুল কারীম মহিলাদের অন্তরকেও বদলে দিয়েছে। তাদের অন্তরে স্বর্ণ-রূপার মহব্বতের স্থলে সেগুলোর প্রতি ঘৃণা তৈরি করেছে।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রা.-এর ভাগিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. মক্কার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দুই বস্তা স্বর্ণ-রূপা এবং অলংকার তাঁর খালার নিকট হাদিয়া পাঠালেন। এখানে অনুমেয় যে, কত হাজার এবং লাখ টাকা হাদিয়া দিয়েছিলেন যে, দুই বস্তা ভরপুর ছিল। এক পার্শ্বে স্বর্ণ অপর পার্শ্বে রূপার সামান নিয়ে খালার বাড়িতে এলেন। হযরত আয়েশা রা. বললেন, আমি এতো সম্পদ দিয়ে কী করব। এগুলো গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দাও। তিনি সেগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিলি করতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই বস্তা শেষ হয়ে গেল। শেষ হওয়ার পর বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনার ঘর সম্পদ হতে খালি; আপনি কিছু রেখে দিতেন।

তিনি বললেন, আহমক! আগে কেন বলনি। তাহলে তো দু-চার টাকা আমিও রাখতে পারতাম।

অবস্থা এমন হলো যে, মনে এই বিষয়টিও নেই যে, এই মুহূর্তে তো আমি নিজেও দরিদ্র। আমাকে কিছু রাখার প্রয়োজন ছিল। তিনি এত পরিমাণ অমুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছিলেন যে, ধন-দৌলত তো দূরের কথা এতটুকুও মনে নেই যে, আমারও টাকার প্রয়োজন, আমারও কিছু রাখার দরকার ছিল। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর স্মরণ হলো।

মহিলাদের অন্তরে সম্পদের মহব্বত বেশি থাকে। এমন পরিবর্তন ছিল কুরআনুল কারীমের সৃষ্টি করা। কুরআন তাদের অন্তরকে এত পবিত্র বানিয়ে দিয়েছিল যে, এতটুকুই স্মরণ ছিল না যে, তাঁর নিকট টাকা-পয়স নেই। তিনিও দরিদ্র। এটি কুরআনেরই ইনকিলাব ছিল। অতএব, কুরআনুল কারীম দুনিয়াতেও ইনকিলাব সৃষ্টি করে, আখেরাতের সৃষ্টি করে। দুনিয়াতে তো অন্ত রে কুফর ও পাপের স্থলে ঈমানের স্বাদ ও মজা সৃষ্টি করে। আর আখেরাতে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে পৌছাবে, ফিৎসাসমূহ থেকে বের করে নিরাপদ জায়গায় পৌছাবে। ইহকালে ইনকিলাব সৃষ্টি করে, পরকালেও করবে। কবরেও ইনকিলাব সৃষ্টি করবে।

কুরআনুল কারীমের বরযখে ইনকিলাব সৃষ্টি করা

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সূরা মুলক সম্পর্কে আদেশ এই যে, ঈশার নামায পর একে তেলাওয়াত করে ঘুমাও। এর সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি আযাবকে দূরকারী, মসিবতকে বাধা প্রদানকারী, আযাব থেকে নাজাত প্রদানকারী। অতএব, সূরা মুলকের বৈশিষ্ট্য হলো নাজাত দেওয়া, আযাবকে দূর করা এবং বাধা প্রদান করা।

এ-কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতে সূরা মুলক তেলাওয়াত করে শয়ন কর। কেননা, শয়ন ও মরণ বরাবর। শয়নকারী কেমন যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যু সহজ হওয়ার জন্য বললেন যে, সূরা মুলক তেলাওয়াত কর। এটি কবরজগতেও নাজাত দিবে। হাশর ময়দানেও মুক্তি দিবে। এটি শরীয়তের হুকুম। যদি কেউ হাফেয হয়, তাহলে মুখস্থ পড়ে নেবে। হাফেয না হলে দেখে-দেখে পাঠ করবে।

মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার, ঈশার ওযু তো থাকেই। পড়ে শুয়ে যাবে। এতে

বরকত হবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোওয়ানো হবে আর আযাবের ফেরেশতা চতুর্দিক ঘেরাও করবে, তখন সূরা মুলককে এক ধরনের আকৃতি দেওয়া হবে। সে আকৃতি ধারণ করে বলবে, খবরদার! তোমরা আগে বাঁচবে না; এই আযাবকে ফেরাও। তখন আযাবের ফেরেশতারা বলবেন, আমাদের তো আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন। আপনার বলার দ্বারা কিভাবে বিরত হব। সে বলবে, আমি আল্লাহর কালাম। ফেরেশতারা বলবেন, তা তো ঠিক আছে যে, আপনি আল্লাহর কালাম। কিন্তু এখানে তো আমাদেরকে কালামওয়ালা আদেশ করেছেন। তাহলে আযাব থেকে আমরা কিভাবে বিরত থাকব। তখন এই সূরা রাগান্বিত হয়ে যাবে।

তখন আযাবের ফেরেশতা বলবেন, আপনি আল্লাহ নন; আমাদেরকে বাধা দিবেন না। আমরা আপনার কথা দ্বারা বিরত থাকতে পারব না। আমরা তো অর্ডারের গোলাম। সূরা মুলক বলবে, এক মিনিট থাম। তখনই উপরে উঠবে এবং আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবে। পৌঁছে অনেক রাগের সাথে বলবে, হে আল্লাহ! হয় আমাকে আপনার কালাম হতে বের করে দিন, আমি কুরআনের সূরা থাকব না। আর যদি থাকি তাহলে এর কী অর্থ হতে পারে যে, ফেরেশতারা আমার হুকুমের তামিল করে না? আমি তো আপনার কালাম। আমি তাকে অর্ডার দেই, তুমি আযাবকে ফিরাও; কিন্তু সে অর্ডার মানেনি। হয় আমাকে কুরআন থেকে বের কবে দিন। আর রাখতে হলে এর কোন অর্থ হতে পারে না যে, আমার হুকুম চলবে না।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, রাগ করার অধিকার একমাত্র আমার। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি অনেক রাগান্বিত হয়েছ। সূরা মুলক বলবে, আমারও অধিকার রয়েছে রাগ করার। আমি কোন সাধারণ বস্তু নই। আমি আপনার কালাম। কী কারণে আমার অর্ডার নামা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি ওই মৃত ব্যক্তিকে তোমার উপর সোপর্দ করে দিলাম। তুমি যা ভালো মনে কর করো। তখন সে অর্ডার নিয়ে আসবে এবং আযাবের ফেরেশতাকে বলবে, খবরদার! আগে বাড়বে না; এমনটি অর্ডার হয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে, তখন ফেরেশতারা মুখ মলিন করে চলে যাবে। যেমনভাবে লজ্জিত ব্যক্তি চলে যায় যে, আমাদের কোনো কথা চলে না। তারা মুখ মলিন করে চলে যাবে এবং আযাবের ফেরেশতা হতে কবর খালি হয়ে যাবে।

হাদীসে শরীফে এসেছে, এই সূরা মৃত ব্যক্তির মুখের উপর নিজের মুখ রাখবে যেমন কেউ চুমু দেওয়ার সময় রাখে এবং বলবে, কেমন মোবারক মুখ যে আমাকে তেলাওয়াত করেছিল। তারপর সিনার উপর মুখ রাখবে এবং বলবে, কেমন বরকতময় সিনা, যাতে আমি সংরক্ষিত ছিলাম। অতঃপর পাগুলোতে মুখ রাখবে এবং বলবে, কেমন মোবারক পা, যা দ্বারা দাঁড়িয়ে আমাকে তেলাওয়াত করেছিল। তখন মৃত ব্যক্তিকে বলবে, তুমি আরাম ও নিরাপদে থাক, তোমার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করবে না; কিছু করতে হলে আমি করব। কোন চিন্তার কারণ নেই।

অতএব কুরআনুল কারীম দুনিয়াতে কায়া পাল্টে দেয়। তখন অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। কবরজগতেও কায়া পাল্টে আযাবকে বাধা দিবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর ডান পার্শ্বে পৌঁছে দেবে। সুতরাং কুরআন মাজীদে এক ধরনের ইনকিলাবি মাদ্দা ও ধাতু রয়েছে যে, অন্তরকে বদলে দেয়, রূহকে পরিবর্তন করে ফেলে, নাপাককে পাক বানিয়ে ফেলে। এমন ইনকিলাবি ধাতু কুরআনের ভিতর রয়েছে।

মহা ইনকিলাব

পৃথিবীতে কত বড় ইনকিলাব কায়েম হয়েছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করলেন, তখন মানুষ পরিবর্তন হয়ে গেল। যারা মক্কার জাহেল ছিল, তারা সাহাবায়ে কেরাম বনে গেলেন। যুগ পাল্টে গেল। জাহেলিয়্যাতের পরিবর্তে তার নাম হয়ে গেল সর্বোত্তম যুগ। তার সাহাবায়ে কেরাম এমন মাকামে পৌঁছলেন যে, তাঁদের ব্যাপারে উম্মতের স্বচ্ছ আকিদা হলো– 'সমস্ত সাহাবা মুত্তাকী, পবিত্র, পুণ্যবান এবং অন্তরে পূর্ণ তাকওয়া বহনকারী।'

হযরত হাসান বসরী রহ.কে কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রা. উত্তম, না হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. উত্তম। আমিরে মুয়াবিয়া সাহাবি ছিলেন আর উমর ইবনে আ. আযিয ছিলেন তাবেঈ। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি। তবে সাহাবায়ে কেরাম রা.কে দেখেছেন। কিন্তু এত বড় মাপের আদেল ও ইনসাফগার ছিলেন যে, লোকেরা তাকে দ্বিতীয় উমর বলতেন। অর্থাৎ হযরত উমর রা.-এর যুগ ফিরে এসেছিল। তার খেলাফত যুগে আদল ও ইনসাফ সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। এত আদল ও ইনসাফ সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন তিনশত রাকাত নফল নামায

পড়তেন। আর ইলমি ব্যস্ততা ভিন্ন। অতএব, হযরত উমর ইবনে আ. আযিয রহ.-এর মাকাম অনেক উঁচু। আর হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রা. থেকে তাঁর খেলাফতকালে কিছু ইজতিহাদী ও চিন্তাগত ভুল সংঘটিত হয়েছিল। এরই ভিত্তিতে লোকেরা হযরত হাসান বসরী রহ.কে জিজ্ঞেস করেছিল, হযরত উমর ইবনে আ. আযিয রহ. উত্তম, না হযরত মুয়াবিয়া রা.?

হযরত হাসান বসরী রহ. উত্তর দিলেন, যদি আমিরে মুয়াবিয়া রা. ঘোড়ায় আরোহণ করেন আর ঘোড়ার নাকে কিছু পানি এসে যায় আর সেই পানিতে কিছু ধূলিবালি জমা হয়, সেই ধূলি হাজারো দরজা উত্তম উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. থেকে। কারণ, উমর ইবনে আ. আযিয একজন তাবেঈ। আর আমিরে মুয়াবিয়া রা. হলেন সাহাবী। কোন ব্যক্তি যতই মর্যাদা লাভ করুক না কেন কিন্তু সাহাবীর ধূলি-ময়লায়ও পৌঁছতে পারবে না।

সাহাবাদের ইনকিলাবের নমুনা

সাহাবায়ে কেরাম রা. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়া কুরআন গ্রহণ করেছেন। ফলে অন্তর বদলে গেছে, রূহ পরিবর্তন হয়েছে। জযবা পাল্টে গেছে। অতঃপর তারা যেখানেই পৌঁছেছেন, সেখানেই ইনকিলাব কায়েম করেছেন, আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন। কিসরা ও কায়সারের সিংহাসন উল্টে দিয়েছেন। সিংহাসন উল্টে দেওয়ার অর্থ হলো দেশ বিজয় করা। কিসরার রাজ্য জয় হলো, রোমানরা অধীন হলো, কায়সারের রাজ্য জয় হলো। ইরানের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এমনটি কোন বড় কাজ নয়, বড় কথা নয়। বড় কাজ হলো এই যে যেখানে সাহাবারা পৌঁছেছেন, তারা দেশ বদলে দিয়েছেন, তাহজিব ও তামাদ্দুন পাল্টে দিয়েছেন। ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, পরিবর্তন করেছেন ভাষা। সকল বস্তুতে পরিবর্তন এনেছেন।

আজ মিসরকে আরব রাষ্ট্র বলা হয়। শাম ও ইরাককে আরব রাষ্ট্র বলা হয়। অথচ এগুলো আরব রাষ্ট্র ছিল না। ইরাক খোরাসানের অধীনে ছিল। এতে আরবী ভাষা ছিল না। অন্য ভাষা ছিল। মিসর কিবতিদের দেশ ছিল। তাতে কিবতি ভাষ ছিল। শাম খ্রিস্টানদের দেশ ছিল। তাদের ভাষা ছিল রোমান। ফিলিস্তিনি ভাষা ছিল।

এমনটি ছিল সাহাবাদের শান। তাঁরা ইরাকে পৌঁছে ধর্ম পাল্টে দিলেন, ভাষা বদলে দিলেন। মিসরে পৌঁছে ধর্ম পাল্টে দিলেন, ভাষা বদলে দিলেন।

তাহজিব ও তামাদ্দুন পরিবর্তন করলেন। এই ইনকিলাব ও পরিবর্তনের শান তাদের মাঝে কোথা হতে এল? তা কুরআনের মাধ্যমে এসেছে। তাঁরা কুরআন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকেই জীবন বিধান বানিয়েছেন, কর্মপদ্ধতি স্থির করেছেন। ফলে বিশ্ব পাল্টে দিলেন।

খারাপ ইনকিলাব

আজ মানুষ কুরআনুল কারীম থেকে যতই দূরে সরে যাচ্ছে, ততই ফাসাদ ও অন্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং খারাবীর ইনকিলাব চলে আসছে। মানুষ ভালো থেকে মন্দের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। ইলম হতে মূর্খতার দিকে যাচ্ছে। তাহজিব থেকে বদতাহজিবের দিকে ইনকিলাব হচ্ছে। কল্যাণকর ও সুন্দর ইনকিলাব কুরআনুল কারীম সৃষ্টি করে। আর খারাব ইনকিলাব কুরআন পরিহার করা সৃষ্টি করে।

কুরআন ছেড়ে দিলে বিপরীত ইনকিলাব আসবে। তাহজিব থেকে বদতাহজিব পয়দা হবে। ভদ্রতা বদলে অভদ্রতার দিকে যাবে। ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে মূর্খতার দ্বারা। উত্তম চরিত্র দূর হয়ে বদচরিত্র সৃষ্টি হবে। কেননা, ইলম, আখলাক ও কামালাত এগুলো কুরআনই শিক্ষা দেয়। যখন মানুষ তার শিকড়ের সাথে মিশে না থাকবে, তখন কামালাতের পূর্ণতার শাখা কোথা হতে প্রকাশ পাবে? যাহোক কুরআনুল কারীম-এ বরকতও আছে, হেদায়েতও আছে, আছে নূর। আর ইনকিলাব যখন আসে, তখন কায়া পাল্টে দেয়।

জিন জাতির মাঝে ইনকিলাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে জিন ও শয়তান জাতি আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারত এবং ফেরেশতাদের কথোপকথন শ্রবণ করতে পারত। তাতে কিছু মিথ্যা সংযোজন করে তাদের মুরিদ ও অনুসারীদের মাঝে তাবলীগ করত। এগুলো ছিল তাদের পেশা ও দৈনন্দিন কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত লাভের সময় তাদের এহেন কর্মকাণ্ড বন্দ করে দেওয়া হয়। তখন কেউ আসমানে যেতে চাইলে তাকে আগুনের বোম তথা উল্কাপিণ্ড মেরে ভস্ম করে দেওয়া হয়। ফেরেশতা তাদের আসমানের নিকট পৌঁছতেই দেয় না। তখন জিন জাতিরা এই বস্তুটি অন্বেষণ করছিল যে, কোন কারণে আমাদেরকে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। তারা মনে করত, কোনো ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু কেমন

ঘটনা তা জানতে পারছিল না। এর সন্ধানে বের হলো এবং জিন্নাতদের প্রতিনিধিদল মক্কায় পৌছল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করছিলেন। তারা তা শ্রবণ করল এবং বুঝে নিল, এই কালাম নাযিল হওয়ার কারণে আমাদের রাস্তা বন্ধ হয়েছে, যাতে আমরা এর মাঝে বিঘ্ন ঘটাতে না পারি। তখন তারা নিজ কওমে প্রত্যাবর্তন করে বলল–

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝
يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝

আমরা আজ এমন কালাম শ্রবণ করে এসেছি, যা সৎ পথ প্রদর্শন করে, যা কামালাতের দিকে নিয়ে যায়। ফরে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে শরীক করব না। *[সূরা জিন : আয়াত ১-২]*

উক্ত কালাম শ্রবণ করে আমাদের পরিপূর্ণ তাওহীদ অর্জন হয়েছে। আর তা ওই কালাম, যার কারণে আমাদের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, জিন্নাতদের মাঝে মুশরিকও ছিল। তারা কুরআন শুনে তাওবা করেছে যে, এখন আমরা শিরক করব না। আমরা আজ জানতে পারলাম, তাওহীদ এত পরিপূর্ণ, যাকে কুরআন নিয়ে এসেছে।

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝

আমরা তাওবা করছি তা থেকেও যে, আমরা বিশ্বাস করতাম, আল্লাহর স্ত্রী রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালার কোন স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। *[সূরা জিন : আয়াত ৩]*

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, তাদের মধ্যে ঈসায়ী আকিদার জিন ছিল, যারা তিন খোদার দাবিদার ছিল। তা থেকেও তারা তাওবা করল।

অতএব, কুরআনুল কারীমের আওয়াজ কর্ণে পড়ার দ্বারা ইনকিলাব পদা হলো। কুফর ছেড়ে ঈমান গ্রহণ করল। শিরক পরিহার করে তাওহীদ গ্রহণ করল। অভদ্রতা ত্যাগ করে ভদ্রতা গ্রহণ করল।

সাহাবাদের মাঝে কুরআনুল কারীমের ইনকিলাবের একটি ঝলক

এ কুরআনুল কারীম মানুষের অন্তর বদলে দেয়। যদি একে ধারণ করে, তাহলে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আর পরিহার করলে মন্দ ও অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। ফিতনার প্রতি ধাবিত করে। ফলে পরস্পর একজন অপরজন থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না। অতএব, কুরআন সৃষ্টি করে, আত্মত্যাগ হামদর্দী, মহব্বত, খিদমত, আনুগত্যের জযবা, আপন লাভের উপর অপরের লাভকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি জযবা সৃষ্টি করে, যা স্বার্থপরতা দূর করে নিঃস্বার্থতা সৃষ্টি করে এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিতে পারে; কিন্তু আপন ভায়ের ক্ষতিকে মেনে নিতে পারে না।

বদর যুদ্ধে কিছু সাহাবা আহত হয়ে পড়ে আছেন। সৈনিকদের মাঝে এমন কিছু সৈনিক থাকেন, যারা সৈনিকদের প্রয়োজনাদী পূরণ করেন। পট্টি বাঁধেন, পানি পান করান ইত্যাদি। তারা এসে পট্টি বাঁধলেন। একজন আহত সাহাবীর ভীষণ পিপাসা অনুভব হলো। তিনি বললেন, পানি! তখন এক ব্যক্তি পানি নিয়ে তাঁর মুখে ধরলেন। এমন সময় পাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, পানি! তিনি বললেন, প্রথমে ওকে পান করাও; তারপর আমি পান করব। তিনি তার নিকট গেলেন এবং পানির পাত্র মুখে লাগালেন। তখন তৃতীয় একজন আওয়াজ দিলেন পানি! তিনি বললেন, প্রথমে ওকে পান করাও; তারপর আমি পান করব। ওখানে পৌঁছার পর চতুর্থজন আওয়াজ দিলেন পানি। তিনি পান করতে পারেননি। তখন পঞ্চমজন আওয়াজ দিল পানি! ওখানে পৌঁছার পর ষষ্ঠজন আওয়াজ দিলেন। এভাবে সাতটি আওয়াজ এল।

সপ্তমজন পর্যন্ত পৌঁছার পর দেখা গেল, তিনি দুনিয়া ছেড়ে পরপারের যাত্রী হয়ে গেছেন। তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তির নিকট ফিরে এলেন। ততক্ষণে তিনিও শহীদ হয়ে যান। তারপর পঞ্চম ব্যক্তির নিকট এলেন। তিনিও পরপরে চলে গেলেন। এমনিভাবে ফিরে আসতে থাকেন আর দেখতে থাকেন সবাই মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। এভাবে সাতজনই পিপাসা নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁরা পছন্দ করলেন না, আমি পানি পান করব আর আমার ভাই পিপাসিত অবস্থায় পড়ে থাকবে। তারা মৃত্যুকে পছন্দ করলেন; কিন্তু অপর ভাইয়ের পিপাসা পছন্দ করলেন না।

তারা ওই মানুষ ছিলেন, যারা এক পাই সম্পদের জন্য অন্যের গলা কেটে

ফেলত। আজ তাদের মধ্যে এমন পর্যায়ের নিঃস্বার্থতা ও হামদর্দী সৃষ্টি হয়েছে যে, মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছেন; কিন্তু অন্যের পিপাসাকে মেনে নেননি।

কুরআন বড় ও মহান ইনকিলাবের উৎসস্থল

এটি ওই বিশাল ইনকিলাব, যা কুরআনুল কারীম সাহাবাদের মাঝে সৃষ্টি করেছে। তারা মাটিকে রসায়ন বানিয়েছেন। স্বর্ণ-রূপার পরিণত করেছেন এবং এমন বানিয়েছেন যে, আসল কায়া ও রূপ বদলে দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীম সম্পর্কে বলা হয়েছে, বরকত অর্জন করো কুরআন থেকে। কেননা, তা আল্লাহর বাতেন তথা ভিতর থেকে বের হয়েছে। তা আল্লাহর সৃষ্টি করা বস্তু নয়। কালামুল্লাহ তার সৃষ্টি করা বস্তু নয় বরং তা তার থেকে বের হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর কালাম নিজে-নিজে তাঁর ভিতর হতে বের হয়েছে। সেজন্য কালাম মাখলুক নয়। মাখলুকের মাঝে রূহ বনে কালাম ভরে আছে। যার ফলে বস্তু তার মূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সুস্থ আছে। সেজন্য বলা হয় কালামুল্লাহ থেকে বরকত অর্জন কর। কেননা, তা আল্লাহর কালাম। আর তা আল্লাহর থেকে বের হয়ে আসছে আল্লাহর সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি তো আমরা ও আপনারা।

আল্লাহ তায়ালা মাখলুকাত হতে তাদের ভিতরের বস্তু বের করে দিয়েছেন, যাতে তাদের মধ্যে কালামুল্লার বরকতে তাহজিব সৃষ্টি হয়, ভদ্রতা সৃষ্টি হয়। এই হিসেবে দুটি জগত হলো, একটি সৃষ্টিজগত যেগুলো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অপরটি রূহের জগত। যা তাঁর আদেশে, তাঁর কালাম দ্বারা তাদের মধ্যে রূহ প্রবেশ করেছে।

অতএব, কুরআন কারীম বাস্তবে আল্লাহর রূহ, যার দ্বারা জাতিসমূহ যিন্দা হবে। যারা কুরআনকে গ্রহণ করেছে, তারা যিন্দা হয়েছে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. ওই রূহকে গ্রহণ করেছেন। সে-কারণে তাঁরা এমন যিন্দা হয়েছেন যে, তাঁরা লাখো-কোটি মানুষ যিন্দা করেছেন।

আজ আমরা ওই রূহকে বের করে দিয়েছি। ফলে প্রাণহীন অবস্থায় পিছে পড়ে আছি। যার মনে চায় মারছে। যার মন চাচ্ছে আঘাত করছে। যার মন যা চাচ্ছে তা-ই করতে পারছে। কারণ, আমাদের মাঝে আসল আত্মা নেই, আসল রূহ নেই। যেমনিভাবে ইসলাম সুউচ্চ; তাকে কেউ নিচু করতে পারে না, তেমনিভাবে কুরআনও সুউচ্চ; তাকে কেউ নিচু করতে পারবে না।

তার রূহ যার ভিতর প্রবেশ করবে, সে উঁচু হয়ে যাবে। যার থেকে বের হয়ে যাবে, সে নিচু হয়ে যাবে, লাঞ্ছিত হবে।

সঠিক ইনকিলাবের আশায় উল্টো পথে দৌড়ঝাঁপ

আজ কুরআনের সেবা করা আবশ্যক হয়ে গেছে। মানুষ ধারণা করে, কিছু সম্পদ হস্তগত হলে কটি বিল্ডিং-এর মালিক হলে কিছু অর্থকড়ি হাতে এলেই আমরা উন্নতি লাভ করে ফেললাম। অথচ এগুলো উন্নতির সুরত নয়। এগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ইনকিলাবের সময় ঘরবাড়ি পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়, অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়, দোকানপাট বিক্রি হয়ে যায়। হাটবাজার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি এগুলোর উপর শান ও শওকত জড়িত হয়, তাহলে এসব নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি ভিতরে রূহ ভরপুর থাকে, তাহলে লাখো বাজার পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক তাতে কিছু আসে যায় না। তারপর হাজারো বাজার প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে মুমিন ব্যক্তির সামান্য ফিকির ও চিন্তা জাগবে না। না পুড়ে যাবার, না সম্পদ লাভ হওয়ার। এ ব্যাপারে যতটুকু তদবির করবে, তা দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রথম তদবির হলো মুসলমান মুসলমান হবে। আর এর অর্থ হলো, কুরআনের রূহকে নিজের মাঝে টেনে নিবে।

কিতাবি ইনকিলাবের শিক্ষাপদ্ধতি

যাহোক যে ধারা আপনারা চালু করেছেন, তা অত্যন্ত মোবারক ধারা। কিন্তু একে প্রথাগত বানাবেন না। বরং পড়ানোর পাশাপাশি ছাত্রদের থেকে শুনতে হবে। অর্থাৎ উস্তাদরা কখনও-কখনও ছাত্রদের থেকে পরীক্ষা নিবে যে, গতকাল আমি কি বলেছিলাম। অমুক আয়াতের উদ্দেশ্য কী। এ আয়াতের উপর আমল করেছ কিনা। কারণ, শুধু পড়া ও পড়ানো যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে সাথে তরবিয়াত প্রয়োজন। তারপর এগুলোকে জীবনব্যবস্থা বানানো জরুরি।

ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার করতে পারে না, যতক্ষণ না একে জীবনের নিযাম বানানো হয় এবং আমল করা হয়। আপনি কুরআনের অনুবাদ পড়ালেন, আহকাম বোঝালেন, আখলাক বলে দিলেন। কিছু দিন পর পরীক্ষা নিলেন, যাচাই করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কতটুকু আমল করেছ, কতটুকু করনি। আমলের সুরত বলে দিলেন, যেমন হাদীসসমূহে অনেক দোয়া রয়েছে, কুরআনে অনেক দোয়া রয়েছে। সেগুলো শিখিয়ে দিন।

তারপর শুনুন। এতে সামাজিকতার ইসলাহ হবে। চরিত্র ভালো হবে। পরিবেশ সুন্দর হবে। এজন্য শুধু তরজমা পড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়।

কিতাবী ইনকিলাবের তরবিয়ত পদ্ধতি

আমি তো বলি, তরজমার উস্তাদ ছাত্রদের আমল দেখবে এবং তরবিয়ত করবে। যদি না দেখা হয়, তাহলে ইলম হাসিল হয়ে যাবে। আর তা মসিবত রূপ ধারণ করবে। আজিমতের সাথে তরবিয়ত করতে থাকবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের শুধু তালিমই দিতেন না যে, কুরআনের অর্থ বলে দিবেন এবং বুঝিয়ে দিবেন। তিনি আমলের মশক ও চর্চা করাতেন। আমলের নেগরানীও করতেন। সবার প্রতি লক্ষ রাখতেন।

রাসূল সা.-এর শিক্ষাপদ্ধতি ও আমলি হেকমত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক গোত্রের লোকেরা উপস্থিত হলো। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ঈমান গ্রহণ করতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হও। তারা বলল, একটি শর্তের সাথে। আমরা ফযর ও ঈশার নামায পড়ব না। বাকি তিন ওয়াক্ত পড়ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শর্ত গ্রহণ করলেন। তারা মুসলমান হয়ে চলে গেল। তারা ঈশা এবং ফযর ব্যতীত বাকি তিন ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করতে থাকে।

উপস্থিত লোকেরা এই ভেবে হতবাক যে, যেমনভাবে তিন ওয়াক্ত নামায ফরজ, তেমনি দুই ওয়াক্তও ফরজ। নবীজী এমন শর্ত কিভাবে মেনে নিলেন। এক মাস পর তাদের অন্তরের মধ্যে এমন খেয়াল উদয় হলো যে, ফরজ তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আমরা তো তিন ওয়াক্ত আদায় করছি। দুই ওয়াক্ত আদায় করছি না। এতে আমরা নিজেরাই গোনাহগার হচ্ছি। তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে উপকার কী হলো?

এই ভেবে তাঁরা এক বা দেড় মাস পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতেনী নূর দ্বারা বুঝে নিয়েছিলেন যে, এরা তাদের শর্তের উপর থাকবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়বে। সেজন্য তিনি তাদের শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। এটি রাসূল রা.-এর তরবিয়তি হেকমত

ছিল। তালিমের ব্যাপারে সবাই সমান। তালিমের সময় তো সবাইকে লক্ষ করে বলা হয়, ভাই! যোহর, আসর, মাগরিব যেমনভাবে ফরজ তেমনিভাবে ঈশা-ফজরও ফরজ। কিন্তু তারপর আমলের ব্যাপার। আর আমলের মধ্যে তরবিয়ত প্রয়োজন। আর তরবিয়তের মাঝে হেকমত প্রয়োজন হয়। তালিম তো এমন যে, যেমন ডাক্তার ডাক্তারি গ্রন্থ পড়ায় এবং চিকিৎসা হয় চেম্বারে। শিক্ষার সময় সবাইকে একই বিষয় পড়াবে। কিন্তু চিকিৎসার সময় প্রত্যেকের প্রেসক্রিপশন পৃথক-পৃথক লেখেন। যেহেতু প্রত্যেকের মেজাজ ও তবিয়ত ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে, রোগ ভিন্ন হয়, তাই তালিম হিসেবে সবাই বরাবর। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মেজাজ ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মেজাজের রেয়াত করতে হয়। তাদের মেজাজ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতে হয়। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরুব্বী ছিলেন; সেজন্য মানুষের মেজাজ বুঝে তাদের শর্তকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর বাতেনি নূর দ্বারা বুঝে ফেলেছিলেন, তারা তাদের শর্তের উপর অটল থাকবে না।

সেজন্য তিনি তাদের কথাকে ডিনাই করেননি। আর পরিশেষে হয়েছেও তা-ই যে, সব নামাযই পড়তে লাগল। এমনটি ছিল তাঁর তরবিয়তি হেকমত।

আমি আরজ করছি, তরজমা পড়ানেওয়ালা তালিম হিসেবে সবাইকে এক মাপে পড়াবেন। কিন্তু তার মাঝে তরবিয়তের শান থাকা চাই। আর তা হবে তালিম থেকে পৃথক।

প্রত্যেকের মেজাজকে এক সপ্তাহ, দু-সপ্তাহ পর্যন্ত যাচাই করবে, নিরীক্ষণ করবে যে, আমল করছে কিনা? যদি না করে, তাহলে তার প্রতিবন্ধক দূর করবে। এভাবে তরবিয়ত হলে সুমানুষে পরিণত হবে। এই কারণে শুধু ইলম যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না ইলম ব্যবহারের পদ্ধতি বলা হবে এবং আমল করিয়ে তার অনুশীলনী না হবে। তখন প্রমাণিত হবে, কুরআনুল কারীম ফায়দা দিয়েছে এবং কিভাবে সে কায়া বদলে দিয়েছে।

মোবারকবাদ প্রদান

যাহোক, এ কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে, আপনারা কালামুল্লাহর তরজমার সূচনা করেছেন। এটি অত্যন্ত মোবারক পদক্ষেপ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

خيركم من تعلم القران وعلمه

পড়নেওয়ালা এবং পড়ানেওয়ালা উভয়ই উত্তম।

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ

কুরআনুল কারীমে ডান-বাম ও সামনে-পেছনে কোন দিক থেকে বাতিল আসতে পারবে না। *[সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ৩২]*

কুরআন বাতিল থেকে মুক্ত। শুধুই হক আর হক। সেজন্য কুরআন যার মধ্যে প্রবেশ করবে, তার মধ্যে বাতিল প্রবেশ করতে পারবে না। সেও হকের উপর জমে থাকবে। অতএব, আপনারা খায়ের ও কল্যাণের কারখানা খুলেছেন। পড়ানেওয়ালারাও উত্তম, শ্রবণকারীরাও উত্তম। তারপর তার পাশাপাশি যদি আমল করে, তাহলে তার প্রভাব ভিতরে প্রবেশ করবে। তারপর তার ফায়দা প্রকাশ পেতে থাকবে।

এ কয়েকটি কথা অন্তরে এসেছিল; তা পেশ করলাম। আল্লাহ তায়ালা এগুলের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন। এগুলোর বরকত ও ফায়দা দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকাশ হোক। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বয়ান : ৩

কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা

হাশরের ময়দানে আদম আ.-এর সমস্ত সন্তানাদি একত্রিত হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোটি-কোটি মানুষ একত্রিত হবে। সমাবেশ হবে। প্রধান হবেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। এতে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই থাকবে। তখনও হিসাব-কিতাব শুরু হয়নি। এ সময়ে একটি শিশুর পিতাকে, যিনি সন্তানকে কুরআনুল কারীম হিফজ করিয়েছিলেন, তাজ পরানো হবে। তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই একত্রিত থাকবে। তাজ পরাবেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। এর থেকে বড় গৌরব ও সম্মান একজন হাফেজের জন্য আর কী হতে পারে?

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا۝

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • الٓمّٓ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

অন্ধকার আলয়ে আলোকিত চেরাগ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের দিন। কার, আমাদের কওমের কিছু সন্তান হাফেযে কুরআন হয়েছে। তাদের মাথার পাগড়ি বাঁধা হয়েছে।

তাদের সনদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সিনায় তাঁর কালাম মোবারক ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের কালাম কোন বান্দার বক্ষে চলে আসা সেটি অনেক বড় কল্যাণের ব্যাপার। আল্লাহ পাকের বরকতময় সত্তা এবং তাঁর সিফাত কালাম মুতলাক নূর আর বান্দা হলো মুতলাক অন্ধকার। এহেন অন্ধকার আলয়ে এমন উজ্জ্বল বাতি জ্বলে ওঠা এবং নূরে মুতলাকের ক্রেন তাতে ঘোরা এবং অন্তর খুলে যাওয়া এগুলো মানুষের বড় কারামাত। আর কুরআনুল কারীম একটি উত্তম ও মহান বরকত এবং সৌভাগ্য ও কল্যাণকর বস্তু।

হায়াতের উৎসস্থল

গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে, কুরআনুল কারীম একটি হায়াত এবং একটি জীবন। সে পৃথিবীকে যিন্দা করেছে। জাতি-গোষ্ঠীকে যিন্দা করেছে এবং আরব জাহানকেও যিন্দা করেছে। তাদের মধ্যে জীবনের আত্মা প্রদান করেছে কুরআনুল কারীম। সেদিকে ইশারা কুরআনে এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ

হে পয়গম্বর! আপনার নিকট আমি ওহী প্ররণ করেছি এবং ওহীর মাধ্যমে আপন রূহ আপনার ভিতর ঢেলেছি। *[সূরা শূরা : আয়াত ৫২]*

উদ্দেশ্য হলো কুরআনুল কারীম।

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না কিতাব কি জিনিস। আপনি অবগত ছিলেন না ঈমান কি বস্তু। আমি এই ওহী এবং রূহকে নূর বানিয়ে আপনার ভিতর প্রেরণ করেছি। যার ফলে সকল উলুম আপনার অন্তরে উদ্ভাবিত হয়েছে। *[সূরা শূরা : আয়াত ৫২]*

এখানে কুরআন সম্পর্কে দুটি কথা বলা হয়েছে। একটি হলো এই যে, এটি

আল্লাহর রূহ এবং তার প্রকারভেদ হলো আল্লাহর ইলম এবং কামাল। অন্য শব্দে ইলমকে রূহ বলা হয়েছে।

আমরা সবাই জানি, রূহ হলো একটি বাতেনী বস্তু। আর এটিই বদনের জীবন। মূলত দেহের কোন পৃথক জীবন নেই। যিন্দেগী হলো রূহের। রূহের কারণে দেহ যিন্দা হয়। যেদিন রূহ বের হয়ে যায়, সেদিনই এ দেহ ফেটে-ছিঁড়ে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে।

অতএব, বাস্তবে জীবন হলো রূহের। আর দেহের জীবন এই রূহের আকৃতি আল্লাহর কালাম। অতএব, কুরআনুল কারীম যে-রূহকে বলা হয়েছে, তাহলো রূহে খোদাওন্দী। হাকিকতে তা একটি হায়াতের ভাণ্ডার এবং জীবনের উৎসস্থল। এ রূহে খোদাওন্দী যখন আরবে পৌঁছল, তখন ওই জাতি যিন্দা হলো, প্রাণ ফিরে পেল, যারা বহু পূর্বপুরুষ থেকে মরা জাতি হিসেবে চলে আসছিল। পৃথিবী যাদেরকে তুচ্ছ ও অপদার্থ মনে করত, কেউ তাদেরকে উটের পেশাব-পায়খানা নিয়ে খেলোয়াড় মনে করত। কেউ তাদেরকে আরবের জাহেল বলে সম্বোধন করত। কেউ মক্কার মূর্খ বলত। বিভিন্ন তুচ্ছ ও নিম্নমানের উপাধি দ্বারা তাদের স্মরণ করা হতো। কিন্তু যখন কুরআন নামক রূহ তাদের ভিতর প্রবেশ করল, তখন তারা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হলো, সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আরেফ বিল্লাহ হলো, যাদের নাম জুহালায়ে আরব তথা মূর্খের জাতি ছিল, তাদের নাম সাহাবায়ে কেরাম হয়ে গেল।

পূর্বে তাদেরকে তুচ্ছতার সাথে স্মরণ করেছে তো এখন তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করা হয়। এই রূহে খোদাওয়ান্দীর কারণে পূর্বে যে যুগের নাম ছিল যমানায়ে জাহেলিয়াত, এখন তার নাম হলো খাইরুল কুরুন বা সর্বোত্তম যুগ। সুতরাং যুগের মধ্যেও প্রাণ এল, স্থানের মধ্যেও জীবন এবং জাতির মধ্যেও এল এবং ব্যক্তির মধ্যেও যিন্দেগী এল, এমন যিন্দেগী যে জগতকে যিন্দা করল।

সুপার পাওয়ার তথা পরাশক্তিগুলোকে পরাস্ত করার বুনিয়াদী কারণ

পৃথিবীর প্রাণহীনতা দূর করে সারা পৃথিবীতে প্রাণ ও নবজীবন ছড়িয়ে দিল। আর মুর্দার জাতি যারা ইতিপূর্বে পার্শ্ব ফেরাতে সক্ষম ছিল না, তারা আজ শক্তি পেয়ে তখনকার বিশ্বের পরাশক্তি কিসরা ও কায়সারের গর্ব ও অহংকারকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। আর তার কারণ এছাড়া ভিন্ন

কিছু ছিল না যে, সাহাবাদের দৈহিক শক্তিমত্তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং দুনিয়া থেকে বাজে প্রথা ও অশ্লীল কথন মিটানো উদ্দেশ্য ছিল, যা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কিসরা ও কায়সারের সাম্রাজ্যের নির্যাস ছিল প্রভুত্ব করা। ওখানে যারা আসত এবং বসবাস করত, তাদেরকে নিজেদের রাজা-বাদশাহকে সিজদা করতে হতো। কেউ কেউ প্রকাশ্যে দাবি করে বসেছিল যে, আমি মাবুদ এবং খোদা। আর কেউ কেউ কার্যকরীরূপে প্রজাদের দ্বারা ওই কর্ম সম্পাদন করেছে, যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাতে বুঝতে পারে যে, সে একজন খোদা।

সুতরাং প্রত্যেক প্রজা এসে সিজদা করত এবং ফরিয়াদ করত যে, আমাদের সকল হাজত ও প্রয়োজনাদী আপনার সাথে সংযুক্ত। অতএব, যে আল্লাহর শানে বলা যায়, সেগুলো কিসরা ও কায়সারের শানে বলা হতো। প্রজাদের গোলাম মনে করত। তাদের গোলামীর অর্থ শুধু এই ছিল যে, নিজেদের রক্ত-ঘামের উপার্জন দ্বারা কয়েকজন বাদশাহকে আরাম-আয়েশ করানো আর নিজেরা বলদের মতো ক্ষেত-খামারে লেগে থাকা আর তাদের মেহনত থেকে কিছু ব্যক্তির লাভ হওয়া। তাদের মাঝে সাম্য ছিল না, ছিল না ন্যায়বিচার ও ইলম।

এহেন নাজুক ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাহাবাদের যুদ্ধাভিযান রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য ছিল না। তারা তখ্তের খাহেশ করতেন না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওই শক্তি ও কর্তৃত্বকে মাটির সাথে মিশে ফেলা, যা আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা এবং তার বান্দাদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা প্রতিষ্ঠা করার পথে প্রতিবন্ধক।

তখনকার বিশ্বে কিসরা ও কায়সারে রোম নামে দুটি বড় সাম্রাজ্য ও পরাশক্তি ছিল, যা আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করতে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল। তখন পৃথিবীতে শুধু এ দুটি হুকুমতই ছিল। তাঁরা মনে করত, যতক্ষণ না এই দুই হুকুমতকে নিঃশেষ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গুণাবলি পৃথিবীতে প্রসারিত হবে না, ছড়িয়ে পড়বে না। মানবজাতির মধ্যে প্রভুত্ব ও বন্দেগীর ভিন্নতা থাকবেই; এই আদল ইনসাফ ও সমতা ইসলাম নিয়ে এসেছে।

এতে সবচেয়ে বড় বাধা হলো কিসরা ও কায়সারের হুকুমত। সেজন্য সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবী থেকে কিসরা ও কায়সারের কর্তৃত্বকে নিঃশেষ করেছেন। বড় বড় রাজ্যের এবং দেশের সিংহাসনকে ওল্টে দিয়েছেন তথা পদানত করেছেন। যখন সেখানে সমতা সৃষ্টি করেছেন, ইসলাম ও দীন প্রচার ও প্রসার করেছেন, তখন যারা গোলাম ও দাস ছিল, তারা আল্লাহর বান্দা

হলো। সবার মধ্যে সমতা কায়েম হলো। তাদের মধ্যে নবজীবন ফিরে এল। অতএব, কুরআনুল কারীম নিজেকে রূহ বলেছে এবং আল্লাহ পাকও রূহ বলেছেন। আর মূলত রূহ হলো হায়াতের খনি, হায়াতের উৎসস্থল। এতে প্রমাণিত হলো, কুরআন হলো যিন্দেগী। আর যে জাতির মাঝে তা প্রবেশ করবে, তারা জীবিত হয়ে যাবে। আর যাদের থেকে বের হয়ে যাবে, তারা মুর্দা বনে যাবে।

হাফেযে কুরআনের বাতিল হতে হেফাযত

গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে সিনার মধ্যে কুরআন থাকবে, বাতিল তার কাছেও ঘেষতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদ্ধতিতে ইরশাদ হয়েছে–

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করে আর ঈমান এনেছে মুহাম্মদের উপর নাযিল হওয়া কুরআনের উপর।' *[সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২]*

বলা হয়েছে–

وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ

তা আল্লাহর পক্ষ হতে হক ও সত্য বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। *[সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২]*

এখানে ইতিবাচক হিসেবে কুরআনকে হক বলা হয়েছে। সত্যিকারের হক কুরআনই।

অন্যস্থানে নেতিবাচক হিসেবে বলা হয়েছে–

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝۴۲

এটি এমন কালাম, যার আগে-পিছে, ডানে-বামে বাতিল তথা মিথ্যা উপস্থিত হতে পারে না। *[সূরা হা-মীম সিজদা : আয়াত ৪২]*

এটি হকই। ভিতরেও হক বাহিরেও হক। বাতিল তার ভিতরে আসতে পারে

না, পাশেও আসতে পারে না। কুরআনুল কারীম বাতিল থেকে পবিত্র ও মুক্ত এবং জাতিগতভাবে হক এবং সম্পূর্ণই হক। এমন হক ও সত্য যদি কারো সিনায় প্রবেশ করে, তাহলে তাতে বাতিল কোথা হতে আসবে?

দ্বিতীয়ত, যেহেতু তা হক, তাহলে এতে বাতিল আসতে পারবে না। অতএব, যে বাচ্চারা আজ তাদের সিনায় কুরআনুল কারীমকে বহন করেছে, বাস্তবে শাব্দিক হিসেবে তারা বাতিল থেকে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে গেছে। কাল যখন তার অর্থ পড়বে, তখন অর্থের দিক থেকেও বাতিল হতে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, একটি গুণ তো এই ছিল যে, আল্লাহর নৈকট্য পেয়েছে, দ্বিতীয় সিফাত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্য হয়েছে। তৃতীয় গুণ হলো, হকের দেহ পেয়েছে। বাতিল তার আশপাশে আসতে পারবে না। কারণ, তার ভিতর কুরআন রূহের রূপ ধারণ করে প্রবেশ করেছে ও ছড়িয়ে পড়েছে। আর তা সম্পূর্ণই হক। তার ধারেকাছে বাতিল আসতে পারবে না, দূর থেকে পলায়ন করবে।

হাফেযে কুরআন অমর

যদি ওই দিক লক্ষ করা হয় যে, কুরআন হলো হায়াত আর আপনি এই হায়াতকে নিজের ভিতর বহন করলেন। এ কথার অর্থ হলো, আপনি যিন্দা-মুর্দা হতে পারেন না। মৃত্যু দেহের উপর প্রভাব ফেলবে আর দেহ তো পূর্ব থেকেই বাতিল। মূলত জীবিত হলো রূহ। আর রূহ অনন্তকাল যিন্দা থাকবে, মরবে না। অতএব, হাফেয ও কারী মরণশীল নয়। তাদের রূহ জারি এবং দায়েমী। হাফেয মরে না, ক্বারী মরে না, মরে না আলেম। মরে তাদের দেহ। তাদের রূহ জীবিত থাকে। তাদের রূহের ফয়েজ ও বরকত পৃথিবীতে পৌঁছতে থাকে। সেজন্য বাস্তবে মউত তাদের পাশে উপস্থিত হতে পারে না। মউতের আসল অর্থ হলো, দেহের খাওয়াদাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। আর রূহ খাওয়াদাওয়ার যোগ্য। রূহের খাদ্য পরকালে মিলবে, ইহকালেও মিলছে। এখানে তাদের খাদ্য হলো ইলম ও মারেফত। আলমে বরযখেও তাদের খাদ্য ইলম ও মারেফত। জান্নাতেও তাদের খাদ্য সর্বোচ্চ ইলম ও মারেফত।

অতএব, সর্বস্থানে সে যিন্দা। দেহ এখানে খাদ্য পাচ্ছে। কিন্তু কখনও অসুস্থতার কারণে বঞ্চিত হচ্ছে। কবরে পৌঁছে বঞ্চিত হবে, হাশরে পৌঁছে মাহরুম হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ তার সাথে না মিলিত হবে, ততক্ষণ তার

মূল্য বাড়বে না। অতএব, দেহের এখানেও যিন্দেগী নেই, কবরে নেই এবং পরকালেও নেই– এক কথায় কোথাও নেই। আর রূহ এখানেও যিন্দা, কবরেও যিন্দা, পরকালেও যিন্দা। আর রূহের খাদ্য হলো কুরআনুল কারীম, যা দ্বারা অনন্তকাল জীবন লাভ হবে। এর অর্থ হলো হাফেযে কুরআন মরে না, সে যিন্দাই থাকবে। তার জন্য মৃত্যু নেই। এক ধরনের উপলব্ধিগত মৃত্যু রয়েছে যে, দেহ অকর্মা হয়ে যাবে, রূহ তাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু রূহ যা নিয়ে যাবে, তা স্থির থাকবে। তার সাথে কায়েম থাকবে, দূরে সরে যাবে না। আর তা হলো কুরআন, যা হলো রূহ। অতএব, হাফেযে কুরআনের শান হলো বাতিল তার পাশেও আসবে না। যে পরিমাণ সে কুরআন বহন করেছে। সেই পরিমাণ হায়াত তার জন্য দায়েমী বনে যাবে। আর সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদৃশ্য বনে যাবে এবং আল্লাহর নিফাত ও তার সম্বোধন মিলবে। তার মতো অন্য কেউ কি এমন সৌভাগ্যবান? সেজন্য তার প্রভাব এমন হবে।

হাফেযে কুরআনের পিতাকে মুকুট পরিধান করানো

হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, কেয়ামত দিবসে হাফেযে কুরআনের পিতাকে নূরের তাজ পরিধান করানো হবে। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যেখানে জগতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বনী আদম একত্রিত হবে, সেখানে তাজ পরানো হবে, যার আলোতে সমস্ত হাশর ময়দান আলোকিত হয়ে যাবে। ঘোষণা হবে, তিনি ওই ব্যক্তি যিনি তার সন্তানকে হাফেযে কুরআন বানিয়েছিলেন। আজ তাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে। তাকে ইজ্জতের মুকুট পরিধান করানো হচ্ছে। দুনিয়াতে যদি কাউকে তাজ পরিধান করানো হয়, তাহলে তা বিশাল ইজ্জতপূর্ণ কাজ। এর চেয়ে বড় ও মহান কোন গৌরব ও ইজ্জতের বস্তু নেই। কিন্তু যদি কোন বাদশাহর মুকুট পরিধান করানো হয়, তাহলে দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা একত্রিত হয় এবং বাদশাকে মুকুট পরিয়ে ঘোষণা করে, আজ হতে তিনি আমাদের বাদশাহ। এতে দেশবাসীর গৌরব বাড়ে। এতে প্রত্যেক প্রদেশের ও অঞ্চলের লোকেরা একত্রিত হয় না। বরং আপন আপন দেশের লোক একত্রিত হয়ে তাজ পরিধান করানো হয়। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে সবাই চতুর্পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাজ পরিধান করায়; কিন্তু বর্তমান যুগের যারা আসছে তারা তো ছিল না তারা তো পরে আসছে। তারা শরীক ছিল না। অতএব সবাই একত্রিত হয়নি; তাই অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ।

আর হাশরের ময়দানে বনি আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সবাই একত্রিত হবে। কোটি-কোটি মানুষের সমাবেশ হবে। অনুষ্ঠান হবে। প্রধান হবেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। ফেরেশতাগণ সাহায্যকারী হবেন। সমাবেশের সকল পার্শ্বে তাদের বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকবে। উপরে ও নিচে সর্বত্রই পাহারা দিবে। মধ্যস্থলে থাকবে আদমসন্তান। উক্ত সমাবেশে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই অংশগ্রহণ করবে। তখনো হিসাব-কিতাব কায়েম হবে না। তখন যারা তাদের বাচ্চাদের হাফেযে কুরআন বানিয়েছিল, তাদের তাজ পরিধান করানো হবে। তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই উপস্থিত থাকবে। তাজ পরাবেন স্বয়ং আল্লাহপাক।

অতএব, একজন হাফেযে কুরআনের জন্য এর চেয়ে গৌরবময় এবং মর্যাদাপূর্ণ মাকাম আর কী হতে পারে! হাফেযদের জন্য যা মর্যাদা আছে তা তো থাকবেই। তাদের মাতা-পিতা পর্যন্ত এমন প্রভাব পড়বে যে, তাদের বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হবে। তাদের মুকুট পরানো হবে। সকল মানুষের আলোচনা হতে থাকবে যে, ভাই! ওরা ওই সমস্ত ব্যক্তি, যারা নিজেদের সন্তানদের হাফেযে কুরআন বানিয়েছিল। যাহোক স্বয়ং কালামের প্রতি লক্ষ করো। তা সম্পূর্ণই হক। তার পার্শ্বে বাতিল আসতে পারবে না। যে ঘরের সন্তানের বুকে কুরআন এসেছে, তার মর্যাদা এতো হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সদৃশ্য লাভ হয়েছে। তার আল্লাহর সিফাত ও উপাধি মিলেছে যে, আজীবন হায়াত পেয়েছে। তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে যে, তার মাতাপিতা পর্যন্ত পৌঁছেছে। মাতাপিতাকে তাজ পরানো হচ্ছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছে। সুতরাং কুরআনের প্রভাব দুনিয়া থেকে কবরে। ওখান থেকে পরকাল পর্যন্ত সর্বত্রই সর্বোচ্চ প্রভাব।

কুরআনুল হাকীমের সর্বকালীন হুকুমত

অতঃপর এমন নয় যে, কুরআনের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং জান্নাতেও তার প্রভাব জারী থাকবে। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হাফেযে কুরআনকে বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক, উন্নতি লাভ করতে থাক আর জান্নাতের দারাজাত অর্জন করতে থাক। তার বদলা ও প্রতিদান এমন হবে। কেননা, হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, কুরআনে পাকের যতগুলো আয়াত রয়েছে, জান্নাতের ততগুলো স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দরজাতে বিস্তারিত বর্ণনা তো লাখ

লাখ থাকবে। কিন্তু প্রকার হিসেবে কুরআনের আয়াতপরিমাণ সংখ্যা রয়েছে। এখন দেখা যায়, কুরআনের কোন আয়াত চার হরফের রয়েছে। তাতে চিন্তা করলে তা থেকে হাজারো প্রকারের দরজা বের হবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখা হলে দেখা যাবে, আহকাম ভিন্ন বের হবে, সূক্ষ্মতা ভিন্ন বের হবে, ইল্লত বের হবে, হেকমত বের হবে। অর্থাৎ কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একই আয়াতের মাঝে অনেক কামালাত ও ইলম রয়েছে।

অতএব. কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ইলম ও কামালাতের ভিন্ন-ভিন্ন আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ইজমালিভাবে দেখলে দেখা যাবে, ইলমের প্রকারভেদ এতো পরিমাণ যত পরিমাণ আয়াত রয়েছে। আর জান্নাতের স্তরসমূহ এত পরিমাণ, যত পরিমাণ কুরআনের আয়াত আছে। অতএব, হাফেযে কুরআনকে বলা হবে তেলাওয়াত করতে থাক, তোমার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী জান্নাতের দরজা উপার্জন করতে থাক। অতঃপর প্রত্যেক দরজার বিস্তারিত বিবরণ আলাদা-আলাদা। যেমনভাবে আয়াতের মধ্যে তাফসিল তথা বিশদ বর্ণনা রয়েছে লাখো উলুম ভরপুর আছে, তেমনিভাবে জান্নাতের দরজাসমূহেও রয়েছে। অতএব, যে দরজার জান্নাত অর্জন করবে, তার নেয়ামতসমূহের তাফসিল এত পরিমাণ হবে যে, কোন সীমা নেই। অনন্তকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে; কিন্তু সে ভ্রমণ করতে থাকবে এবং নেয়ামতরাজি উপার্জন করতে থাকবে। সুতরাং কুরআনের হুকুমত স্রেফ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, শুধু আলমে বরযখে নয়, হাশরে নয় বরং জান্নাতে অনন্তকাল জারি থাকবে। কারণ, তা আল্লাহর কালাম– আমাদের কালাম নয়।

কুরআনুল কারীমের প্রভাব অনন্তকাল বহাল থাকার কারণ

আমাদের কালাম যখন ফাযা তথা খোলা প্রান্তরে আসে, তখন তা হারিয়ে যায় না, নিঃশেষ হয়ে যায় না। ফাযা একে বেষ্টন করে নেয়। আর আল্লাহর কালাম যখন চলে, তখন তা ফাযাকে বেষ্টন করে ফেলে। সমস্ত ফাযাকে ঘিরে ফেলে। সমস্ত ফাযা তার মহল তথা অবস্থানস্থল বনে যায়। অতএব, পার্থক্য এতটুকু যে, কালামুল্লাহ্ ফাযাকে ঘিরে ফেলে আর আমাদেরকে ফাযা ঘিরে ফেলে। যাকে রেডিও জব্দ করে দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছায়। যদি ফাযাতে সংরক্ষিত না হতো, তাহলে রেডিও কোথা হতে পেশ করত। আমরা যা কিছু বলি তা সবই ফাযাতে সংরক্ষিত হয়। যেমনটি কুরআনুল কারীম ইরশাদ করেছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨

সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। *[সূরা ক্বাফ : আয়াত ১৮]*

কোন শব্দ, কোন হ্যাঁ আপনার মুখ থেকে উচ্চারণের সাথে-সাথে নথিভুক্ত করনেওয়ালা নথিভুক্ত করে নেয়, সংরক্ষণ করে নেয়। প্রতিটি শব্দ সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি উচ্চারণ সংরক্ষিত আছে। আওয়াজ মাহফুজ আছে। সবকিছুকে কেয়ামত দিবসে প্রকাশ করা হবে। আমল হোক, অবস্থা হোক, কথা হোক, কথার আওয়াজ হোক, সময় হোক সব জিনিসই সংরক্ষিত আছে। যাহোক আমাদের মুখ থেকে যে আওয়াজ বের হয়, তা হারিয়ে যায় না। তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ থেকে যে কালাম হয়েছে, তা হারিয়ে যাবে? আমাদের কথাকে তো ফাযা বেষ্টন করে সংরক্ষণ করে। আর আল্লাহর কালাম বের হয়ে সমস্ত কায়েনাতকে ঘিরে ফেলে। তাহলে তা কিভাবে হারিয়ে যাবে? তা তো হারিয়ে যাওয়ার বস্তু নয়। যার মধ্যে উক্ত কালাম প্রবেশ করবে, ইনশাআল্লাহ সে হারাবে না। আখেরাত পর্যন্ত তার প্রভাব ও বরকত চলতে থাকবে।

হাফেযে কুরআনের সুপারিশের অধিকারী হওয়া

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, একজন হাফেযে কুরআনকে অধিকার দেওয়া হবে যে তোমার প্রিয়ভাজন বা আত্মীয়-স্বজন হতে দশজনের জন্য শাফায়েত কর। চাই তারা মাতা-পিতা হোক, ভাই-বোন হোক। তোমার অধিকার আছে দশজনের সুপারিশ করার, যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ কর। যদি কারো ঘরে পাঁচজনকে হেফয করানো হয়, তাহলে পঞ্চাশজন মানুষের সুপারিশের অধিকারী হবে। যদি পরিবারে পঞ্চাশ জন মানুষ না থাকে, তাহলে অন্যদের কাজে আসবে। ঘরওয়ালাদের তো ক্ষমা করা হবেই বাকি শাফায়েত অন্যদের পর্যন্ত পৌছবে।

কাউকে সুপারিশের অধিকার দেওয়া তা তার জন্য অনেক বড় ইজ্জত ও আযমতের বিষয়। এর মানে সে নিজে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও ক্ষমার অধিকারী। যখন তোমাকে অধিকার দেওয়া হবে অন্যদের শাফায়েত করার জন্য, তখন দশজনের জন্য সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। এমনিভাবে আলেম, শহীদদের অধিকার দেওয়া হবে। কারো সাতজনের, কারো দশজনের, কারো আরো বেশিজনের। এখন যদি ঘরের সবাই

হাফেয হয়, তাহলে তাদের সুপারিশ কোথা পর্যন্ত পৌঁছবে অনুমান করে দেখুন।

অনন্তকাল মাথা উঁচু থাকা

যাহোক যে সমস্ত পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের হাফেয বানিয়েছে, তারা দুনিয়াতেও বঞ্চিত হবে না, আখেরাতেও হবে না। এখানেও তাদের জন্য বরকত আছে, ওখানেও তাদের জন্য বরকত রয়েছে। বাচ্চা এখনও সাত বছরের। যখন তাকে পেশ করা হয়, তখন প্রথমে মাতাপিতার নাম পেশ করা হয় যে অমুক সাহেবের ছেলে, যে কুরআনুল কারীম হিফয করেছে। তখন পাবলিক বুঝবে ইনি পিতা আর সে হলো তার ছেলে। তার পিতার ইহসান, যিনি তার সন্তানকে হাফেয বানিয়েছেন। অতএব, দুনিয়াতে শিরোনাম হলো। আখেরাতেও সুপ্রসিদ্ধ হবেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের নিকট। সন্তান ও পিতামাতা উভয়ে উভয় জগতে শিরোনাম হবে।

কুরআনুল কারীমের আযমত

যাহোক কুরআনুল কারীমের হাজারো সাইড ও দিক রয়েছে, যেগুলো হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আরো দিক বর্ণনা করার সময় নেই। সবগুলো বর্ণনা একসাথে করা সম্ভব নয়। এখানে দু-চারটি উল্লেখ করেছি যে, এগুলো কুরআনের সাইড, যার দ্বারা কুরআনের আযমত প্রকাশ পায়। এ ছেলেদের পাগড়ি পরিধান করিয়ে কয়েকটি বিষয় যেহেনে এসেছে যে, বড় সৌভাগ্য এই ছেলেদের। আল্লাহ তায়ালা এদের এই ফযিলত প্রদান করেছেন। আর তাও কোন ফযিলতের নয় যে, একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি এখানে এসে চেয়ারে বসে বাচ্চাদের পাগড়ি বেঁধেছে। আর আপনারা মানপত্র পাঠ করে প্রশংসা করেছেন। অথচ তা অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি। আমি বলি, মিথ্যা বাড়াবাড়ি। আর যদি মিথ্যা বলে থাকেন, তাহলে আপনারা মুক্ত। কারণ, আপনারা তো আপনাদের ধারনা মতে সত্য কথা বলেছেন।

মহব্বতের নজর

কিন্তু আমি বলি, আপনারা একজন অনুপযুক্ত ভাইকে মহব্বতের নজরে দেখেছেন। আর মহব্বতের নজরে কোন জিনিস খারাপ মনে হয় না। তার

দোষও ভালো মনে হয়। এখানে সব মুহিব্বীন বসে আছে। মহব্বত ও ইখলাসের নজরে যখন তারা দেখতে লাগল, তখন দোষী ব্যক্তির দোষ গোপন হয়ে গেল। আর তার সবকিছু ভালই দেখা গেল। সবকিছুই ভাল দেখতে লাগল। অথচ ওই ভাল ও প্রশংসা কোথায় আর আমি কোথায়? সরলতা হতে আমি বলি যে, আপনারা তো আপনাদের প্রশংসা করলেন। কারণ আপনারা আপনাদের প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। আপনারা আপনাদের প্রশস্ত মনের প্রমাণ পেশ করলেন যে, আপনারা আপনাদের একজন নালায়েক ভাইকে অনেক উঁচুতে তুললেন। আপনাদের মধ্যে প্রশস্ততা ছিল। তাই আপনারা করতে পারছেন। অতএব, আপনারা প্রশস্ততার প্রমাণ দিলেন। তাহলে কৃতজ্ঞতা কেন আমি জ্ঞাপন করব। এখানে আপনারা আপনাদের কামাল তথা গুণাগুণ প্রকাশ করেছেন। আপনাদের শুকরিয়া আদায় করার প্রয়োজন নেই।

বরকতের উপর বরকত

আমি বলি, আপনারা আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন না। আমরা আপনাদের শুকরিয়া আদায় করব না। আমরা সবাই মিলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। তিনি আমাদেরকে এত অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাদেরকে একস্থানে একত্রিত করেছেন। আমাদের সন্তানদের হাফেয বানিয়েছেন। তাদের মাথায় পাগড়ি বাধার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের সনদ প্রদান করার তাওফীক দিয়েছেন। আমরা কুরআনুল কারীমের তালিমকে আগে নিয়ে যাব। এগুলো আল্লাহ তায়ালার কত বড় নেয়ামত, যা আমাদের তাওফীক প্রদান করেছেন।

অতএব, আমাদের পরস্পর শুকরিয়া আদায় ব্যতীত আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করব যে, আল্লাহ আমাদের সমবেত করেছেন। মুসলমানদের সমাবেশ এটি। এটি একটি পৃথক নেয়ামত ও বরকত। আর সমাবেশ হয়েছে কুরআনের জন্য; তা বরকতের উপর বরকত, উঠল বরকত।

অতএব এত নেয়ামত এবং এত বরকত আমাদের দান করেছেন যিনি, তিনিই হলেন প্রকৃত শুকরিয়া পাওয়ার উপযুক্ত।

তিনি ইজ্জতওয়ালা, তিনি শুকরিয়া পাওয়ার হকদার, হাম্‌দ ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। অতএব, আমরা সবাই মিলে তাঁর হাম্‌দ ও প্রশংসা করব এবং দোয়া করব যে, আল্লাহ তায়ালা যেন মাদরাসাকে আরো মজবুত করেন এবং

সুপ্রশস্ত করেন। তার উস্তাদগণ ও আমাদের কারী সাহেবের হায়াতকে দীর্ঘ করেন আর তাদের আত্মত্যাগ ও ইকলাসে আরো বরকত দান করেন। আর আমাদের এই প্রদেশ ওং এলাকার লোকদের আরো বেশি মাদরাসার প্রতি মনোনিবেশ করার তাওফীক দেন। আমীন।

বয়ান : ৪

অল ইন্ডিয়া আহ্নাফ কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ

ইমামের মেধা ও চেতনাগত বৈশিষ্ট্য তার উসূল আবিষ্কার থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ওই বৈশিষ্ট্য তার উসূলের অধীনে উদ্ভাবিত শাখাগত মাসয়ালাতেও সুস্পষ্ট হয়। পরিশেষে সেই বৈশিষ্ট্যের রং ওই ব্যক্তিদেরকে তারবিয়াত করে, যারা তার আবিষ্কৃত ফিকহের উপর আমল করে। সারকথা হলো, একজন ফিকাহর মুকাল্লিদ সুস্পষ্টত ফিকাহর শাখাগত মাসয়ালার তাকলিদ করলেও প্রকৃত দৃষ্টিতে সে ওই উসূল ও মূলনীতির তাকলিদ করে, যার উপর উক্ত ফিকাহর ভিত্তি রচিত। আর এই কর্মপদ্ধতিতে সে কুল্লিয়াত তথা সমষ্টি ও সম্পূর্ণের উপর আমল করে, যা এই জুযইয়্যাতকে কাজে লাগায়। সুতরাং দুই ফিকাহর উপর আমলকারী উদাহরণস্বরূপ এমন জুযয়ী মাসয়ালা নির্বাচন করে, যা প্রকাশ্যভাবে একটি অপরটির বিপরীত নয়। এমতাবস্থায় উভয় ফিকাহর তাকলিদ করতে থাকে। তাহলে প্রকাশ্যভাবে জুযয়ী মতানৈক্যে পতিত হলো না। কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টিতে সে কুল্লিয়াতি বৈপরীত্যের শিকার হয়েছে, যা ওই জুযইয়্যাতের খসড়ার প্রস্তুতকারী। সেগুলোর মধ্যে মিশে আছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ○

কৃতজ্ঞতা ও ভূমিকা

মুহতারাম হযরাত!

আমি এ-কল্পনা করে লজ্জিত এবং শর্মিন্দা হচ্ছি যে, সভাপতির নামে আমার মতো অনুপযুক্তকে এমন এক স্থানে এনে বসানো হয়েছে, যা কোনো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত ছিল। আর এজন্য উক্ত পদমর্যাদাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলাম, যা আমি অপত্তির ভাষায় প্রকাশও করেছিলাম। কিন্তু সেই আবেদন

অনুমোদন হয়নি। পরিশেষে জামাতবদ্ধ আদেশের অবাধ্যতাকে বেয়াদবি মনে করে উক্ত পদমর্যাদাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। আজ আমি পুঁজিবিহীন অবস্থায় তথা নিঃস্ব হাতে আপনাদের সামনে উপস্থিত। ওই সম্মানিত বুযুর্গদের ইখলাস এবং আত্মত্যাগের বরকতে, যারা নিজেদের সভাপতিত্বের দৌলতকে নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় আমার মতো অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সভাপতিত্বের মসনদে বসিয়েছেন। আমি আশাবাদী ওই শক্তিমান ও সামর্থ্যবান আল্লাহর উপর, যিনি রসমে (প্রথাগত) হাসানাহর মধ্যে সত্যিকারের হাসানাহ দিতে পারেন। যিনি ভাল সুরতের ডাইশে ভাল সীরাত ঢেলে দিতে পারেন। তিনি এই রসমি সম্মানকে বাস্তব ও প্রকৃতির অগ্রদূত বানিয়ে দিবেন এবং কনফারেন্সের বুযুর্গদের ইজ্জত বৃদ্ধির বর্তমান সুরতকে আসল সুরতে বদলে দিবেন। আল্লাহর নিকট তা কঠিন নয়।

এ কারণে আমার আকলি ও শরয়ী দায়িত্ব যে, আমি ওই সমস্ত বুযুর্গদের ইখলাসপূর্ণ শুকরিয়া আদায় করব, যারা আমাকে পুঁজিবিহীন হালতে কবুল করেছেন–

জনাব! এ-সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, হানাফিয়্যাহ বা ফিকহে হানাফীর দাওয়াত ও তাবলীগ করা অথবা হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করা অথবা গাইরে হানাফীদের দাবি রদ ও খণ্ডন করা। কারণ, এই ফিকহী মাসলাক পৃথক কোন শরীয়ত নয় যে, তার দাওয়াত ও তাবলীগের সিলসিলা হ্রাস করে, অন্যদের মাযহাবকে রদ ও দোষারোপ করতে হবে। অথবা অন্যদের মাযহাবকে বাতিল প্রমাণিত করতে হবে। এগুলো ইজতিহাদী মাসলাক– স্রেফ আমলের সহজ পথ, যা পথ চলার জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দান নয় যে, যা লড়াই করার জন্য বানানো হয়েছে।এবং বিদ্যমান নাযুক যুগও নয় যখন মুসলমানদের মাঝে হাজারো ঝগড়া বিদ্যমান।

খুতবা রচনার উদ্দেশ্য

এ-সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নীতিগতভাবে ইজতিহাদ ও তাকলিদ সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা এবং সুস্থ বুদ্ধির আলোকে কিছু কথা পেশ করে শুধু এতটুকু তুলে ধরা যে, কোন গ্রহণযোগ্য এবং সনদপ্রাপ্ত অর্থাৎ শরয়ী ইজতিহাদের তাকলিদ করা কোন প্রকার নিন্দনীয় বিদয়াত নয় যে, তা ভর্ৎসনাযোগ্য এবং তা পালন করাকে তুচ্ছ কল্পনা করা হবে। বরং এই

মাসলাকগুলো এমন রাস্তা, যা পূর্বসূরী থেকে আজ পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে দীনি পথ হিসেবে চলে আসছে। আর উম্মত নিজেদের দীন হেফাজতের জন্য এ-ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি তালাশ করবে না।

এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাকলিদ অস্বীকারকারীগণ কেমন এবং তারা কেমন হুকুমের যোগ্য। আমি প্রথমে কয়েকটি বাক্য তারপর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরজ করব। যেগুলোর ভুল ও শুদ্ধতার ফয়সালা আলেমদের হাতে ন্যস্ত। সঠিক হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল হলে তা আমার পক্ষ থেকে। সবার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং সংশোধনের আশা করি।

আল্লাহর কাজ ও তাঁর কালাম

এ-পৃথিবীর হায়াত, চাকচিক্য ও সৌন্দর্য স্রেফ দুটি বস্তুর কারণে। এমনকি পৃথিবীতে বাসযোগ্যই দুটি বস্তু। একটি আল্লাহর কাম, অপরটি তাঁর কালাম। আল্লাহর কর্মসমূহের কারণেই বিশ্বজগতে সৃষ্টিজগত তৈরি হয়েছে। আর তাঁর কালাম দ্বারা বিশ্বজাতির শরয়ী নেযাম কায়েম হয়েছে, যাকে আলমে আম্‌র বলে।

সুতরাং সৃষ্টিজগত হোক অথবা আম্‌র জগত হোক উভয়ের মধ্যে তাঁরই জাত ও সিফাত এবং ইলম ও আমলের পূর্ণতার বিকাশস্থল এবং সৃষ্টিকরণ ও আইন প্রবর্তনের রং-বেরঙের প্রদর্শনস্থল ওই বাতেনী জাতের কথা ও কর্মসমূহের সৌন্দর্য প্রকাশ করছে।

তাকভিন ও তাশরি-এর উৎপত্তি ও পুনরুত্থান একই জাত

এ কারণে তাকভিনি বা সৃষ্টিকরণ নিযাম তাঁর থেকে সূচনা হয়ে তাঁরই হাতে নিঃশেষ হবে এবং শরয়ী বা আইনী নেযামও তার থেকে সূচনা হয়ে তাঁরই হাতে শেষ হবে। অর্থাৎ তাকভিন ও তাশরি এবং আমর (হুকুম)-এর সূচনা এবং শেষ তিনিই– শুধুই তিনি। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে উৎপত্তিস্থল হওয়ার ব্যাপারে কালামে পাকে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন–

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

তিনিই সৃষ্টির সূচনাকারী। *[সূরা রূম : আয়াত ২৭]*

অতঃপর উক্ত আয়াতের সাথে-সাথে সৃষ্টির পুনরুত্থান হওয়ার ব্যাপারে এভাবে

সুস্পষ্ট করেছেন যে–

ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

অতঃপর তিনিই যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিবেন। আর তা তাঁর নিকট অতিসহজ কাজ। *[সূরা রূম : আয়াত ২৭]*

এতে প্রমাণিত হয়, জগতের সূচনা ও শেষ শুধু তারই হাতে, এতে অন্য কারো দখল নেই। তেমনিভাবে আলমে আমর সম্পর্কে নিজের সূচনাকারী হওয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর উভয়ের মাঝে তার আমর বা আদেশ অবতীর্ণ হয়। *[সূরা তালাক : আয়াত ১২]*

অন্য আয়াতে নিজে আমরের (আদেশের) প্রত্যাবর্তনস্থল এবং আমরের পুনরুত্থানকারী হওয়ার এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে–

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

আর আল্লাহর দিকেই সমস্ত আমর ফিরে যাবে। *[সূরা হাদীদ : আয়াত ৫]*

এতে সুস্পষ্ট হয় যে, শরীয়ত নাযিল করা এবং পরিশেষে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়া শুধু তাঁরই কাজ। এতে কোনো সৃষ্টি বা কোন মানুষের অংশিদারি নেই। অতএব, সৃষ্টিকরণে তাঁর কোন শরীক এবং অংশীদার নেই। আর তাঁর শরয়ী আইনে এবং নির্মাণে তাঁর কেউ অংশীদার ও সাথী নেই।

ان الحكم الا لله

হুকুম একমাত্র আল্লাহর।

তাকভিন ও তাশরির মূলনীতিও এক

এতে অতি সহজে বোধগম্য হয় যে, তাকভিন এবং তাশরিকে কাজে লাগানোর জন্য একই মূলনীতি হবে।একই ফিতরাত থেকে সৃষ্টি। তিনিই

উভয়ের সূচনা এবং সমাপ্তি। তিনি উসূলকে যখন সৃষ্টির মাঝে ব্যবহার করেছেন, তখন সৃষ্টিজগত পরিপূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়েছে। আর যখন শরয়ী বিধানকে কাজে লাগিয়েছেন, তখন শরয়ী জগত তৈরি হয়ে পূর্ণতায় পৌছেছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার ধীরে চলা ও ক্রমান্বয়ে চলার গুণ অথবা প্রভুত্বের সিফাতের উসূল, যার অর্থ কোনো বস্তুকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছানো। যখন তাকভিনের সঙ্গে সংমিশ্রণ হলো, তখন ধীরে-ধীরে সৃষ্টিজীবের নেযাম পরিপূর্ণ হয়ে বিবদমান অবস্থায় এল, যা আজ আসমান ও জমিন, পাথর ও বৃক্ষ, প্রাণী ও মানুষ এবং সারা জগতের আকৃতিতে আমাদের সামনে উপস্থিত। আর এই ক্রমান্বয়ের উসূল যখন শরয়ী বিধানের সাথে পরস্পর মিলিত হলো, তখন ধীরে-ধীরে শরয়ী নিযাম কামেল ও পরিপূর্ণ হয়ে বর্তমান সুরতে প্রকাশ পেল, যা আজ ইসলাম নামের অবয়বে আমাদের মাঝে উপস্থিত।

সৃষ্টিগত নিযামের এই ক্রমান্তর গঠন এবং ধীরে কাজ করার সময়ের দিকে কুরআনুল কারীম নিম্নের আয়াতে প্রদর্শন করেছে–

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। *[সূরা ইউনুস : আয়াত ৩]*

এ-আয়াতের বিশদ বর্ণনা অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসসমূহে রয়েছে। কত দিন এবং কী-কী তৈরি হয়েছে আর তিনি কার্য পূরণকরণে কতটুকু সময় নিয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে আয়াত দ্বারা এতটুকু সুস্পষ্ট হয় যে, সমগ্র কায়েনাত ছয় দিনে নির্মাণ করা হয়েছে। আর এ-আয়াতের সাথে যখন নিম্নের আয়াতকে মিলানো হয় যে–

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

আর আপনার পালনকর্তার একদিন হাজার বছরের সমান যেদিন তোমরা গণনা কর। *[সূরা হজ্জ : আয়াত ৪৭]*

তাহলে ফলাফল এমন বের হবে যে, পূর্ণ বিশ্বজগত সৃষ্টির সম্পূর্ণ সময় হলো

ছয় হাজার বছর। অপরদিকে শরয়ী নিযামের ধীর গতির উন্নতি ও পূর্ণতার দিকও কুরআন বর্ণনা করে আল্লাহর শিক্ষার প্রথম অবতরণস্থল এবং খেলাফতে রব্বানীর প্রথম ব্যক্তি হযরত আদম আ.কে বলেছেন। তাঁর ইলমি খেলাফত বিষয়ে, যা আলমে আমরের সূচনা সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদম আ.কে সকল বস্তুর নাম শিখানো হয়েছে। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৩১]*

হযরত আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখানো হলো।

আর খেলাফতে নবুওয়ত সম্পর্কে যা আলমে আমরের সর্বশেষ খড়ি তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, হযরত আবুযর গিফারী রা.-এর হাদীসে, যা ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেছেন। হযরত আদম আ.কে সর্বপ্রথম নবী আর মুকাম্মাল নবী বলা হয়েছে, যার উপর আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। *[মিশকাত বাবু বাদউল খালক]*

মোটকথা, নবুওয়ত প্রাসাদের নির্মাণ হযরত আদম আ. থেকে সূচনা হয়েছে। তিনি নবুওয়ত ও ইলমে নবুওয়তের সর্বপ্রথম কেন্দ্র, যার থেকে আলমে আমরের সূচনা হয়েছে। আর নবুওয়ত প্রাসাদের সর্বশেষ ইট, যার দ্বারা নবুওয়ত প্রাসাদ পূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে–

ختم بي البنيان وختم بي الرسل

আমার দ্বারা নবুওয়ত প্রাসাদকে পূর্ণ করা হয়েছে এবং রাসূল আগমনকে খতম করে দেওয়া হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين

সুতরাং আমি ওই ইট, যার দ্বারা নবুওয়ত প্রাসাদ পূর্ণ হয়েছে। আর আমি খাতামুন নাবিঈন বা সর্বশেষ নবী। *[মিশকাত]*

অতএব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইলমে নবুওয়ত এবং খতমে নবুওয়তের সর্বশেষ মার্কায ছিলেন, যার উপর আলমে আমরকে সমাপ্ত করে তাকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআনুল কারীম হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী এবং বিদায় হজ্বের দিন ধীরগতি সম্পন্ন দীনের সর্বশেষ ফলাফলের ঘোষণা দিয়েছে নিম্নের শব্দাবলির মাধ্যমে।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করেছি। *[সূরা মায়েদা : আয়াত ২]*

যদি ইতিহাসবিদদের এ অভিমতকে ইখতিয়ার করা হয় যে, হযরত আদম আ.-এর ছয় হাজার বছর পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ শুরু হয়েছে। তিনি সপ্তম হাজারের শুরুতে প্রেরিত হয়েছেন, জন্মলাভ করেছেন। (এ অভিমতকে কিছু সাহাবীর বর্ণনা এবং হাদীস ও প্রমাণ করে যা ইবনে জাবির তাবারী রহ. আপন ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন)। এতে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টিজগতের ন্যায় আলমে আমর তথা শরয়ী বিধানের সম্পূর্ণতাও দু-হাজার বছরে হয়েছে এবং যেমনভাবে তাকভিন ও তাশরির মধ্যে ধীরগতি ও ক্রমনীতির বিধান এক ছিল।

সারকথা, আল্লাহ তায়ালার ছয় দিন অথবা দুনিয়ার ছয় হাজার বছর সময়ে মাখলুকাত এবং মাশরুয়াতের নিযামকে সম্পূর্ণ করে এমন পর্যায়ে পৌছানো হয়েছে যে, আজ তাতে কম করার সুযোগ নেই, বেশি করার সুযোগ নেই, সংযোজন ও বিয়োজন ও রহিতকরণের সুযোগ নেই।

لا تبديل لخلق الله

আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন হয় না।

অর্থাৎ যেমনভাবে জগতের মূল ধাতু চতুষ্টয় পানি ও মাটি, বাতাস ও আগুন। অতঃপর মূল পদার্থ সৃষ্টিগত প্রজনন জড় দার্থ, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত অতঃপর উচ্চতর এবং নিম্নতর। তারপর উচ্চতর ও নিম্নতর পদার্থের সকল শ্রেণী ও জিন (জাতি), মানুষ, বাঘ, ছাগল, বৃক্ষ, পাথর এবং সাগর, মরুভূমি, জিন, ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ, কাপড়-পোশাক, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ইত্যাদির সমষ্টিগত অবয়ব যাকে বিশ্ব বলে এখন কোন প্রকার কম ও বেশি গ্রহণ করবে না। তেমনিভাবে দীনের উসূল ও ভিত্তিগত মৌলিক নিয়মাবলি ও

নিয়ম-কানুন এবং সকল সুস্পষ্ট আকাঈদ ও আহকাম বিধানাবলির সমষ্টিগত অবস্থা অবয়ব যাকে ইসলাম বলে। তাতে কোন প্রকার কম ও বেশি এবং সংযোজন ও বিয়োজন সম্ভব নয়।আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পাবে না।

ইজাদ ও ইজতিহাদ

তবে হ্যাঁ, যেমনভাবে তাকবীন জগতের মূল ধাতু এবং তার নিম্নতর ও উচ্চতর ভাণ্ডার দ্বারা চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন-নতুন দুর্লভ বস্তু আবিষ্কার করা যায় এবং সেগুলোতে লুকায়িত শক্তিসমূহে অনুসন্ধান করে জগতকে নতুন-নতুন অসাধারণ কার্যাবলি প্রদর্শন করা যায়, সেগুলোর নির্ধারিত সীমা নেই, তেমনিভাবে শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েল এবং নিয়ম-কানুন ও কুল্লিয়াতের গোপন ও অদৃশ্য উলুম ও রহস্যসমূহকে অনুসন্ধান করে দীনের আধুনিক শাখা মাসায়েল দুর্লভ ও সূক্ষ্মতা এবং হাকিকত ও মারেফত সৃষ্টি করা যায়। কুরআনের শানের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

لا تنقضی غرائبه

কুরআনের আশ্চর্য বিষয়াবলি পরিসীমা নেই।

এহেন তাকভিনি আবিষ্কারের নাম ইজাদ আর শরয়ী উদ্ভাবনের নাম ইজতিহাদ। ইজাদের কোন সীমা নেই, ইজতিহাদেরও কোন সীমা নেই। এটি ভিন্ন বিষয় যে, ইজাদাত যেমনভাবে প্রত্যেক যুগের চিন্তাধারা এবং প্রয়োজন মোতাবেক হয় আর আবিষ্কারকদের জন্মগত তবিয়ত ওই ইজাদাত ও আবিষ্কারের দিকে ধাবিত হয়, যেগুলো যুগের প্রয়োজন হয়। আর যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন তবিয়তের দৌড়ঝাঁপও শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে শুধু ইজাদাত থেকে ফায়দা উঠানো হয়। তেমনিভাবে ইজতিহাদের রং ও প্রত্যেক যুগের চিন্তাধারা এবং সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মুজতাহিদীনদের অন্তর জন্মগতভাবে ওই উদ্ভাবনের প্রতি ধাবিত হয়, যেগুলো ওই যুগের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজন পুরো হওয়ার পর ইজতিহাদের ওই সময় ফিরে আসে না। যুগ তার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এখন স্রেফ সেগুলো থেকে ফায়দা উঠানো বাকি থাকে।

ইজতিহাদের প্রকারভেদ

যদি মূল দীনের ইজতিহাদ করে ইল্লত ও কুল্লিয়াত এবং আবিষ্কারের মূলনীতি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে মুজতাহিদের দেমাগ স্বয়ংক্রিয় ও কুদরতিভাবে সেদিকে পরিচালিত হবে। আর যদি কুল্লিয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসায়েল ও কানুন আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়, তাহলে মুজতাহিদের দেমাগ ওই দিকেই মনোনিবেশ করবে।

তারপর যদি ওই আবিষ্কৃত মাসায়েলকে বাস্তবতার উপযোগী করে প্রাধান্য ও ফতোয়া নির্বাচন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে ইজতিহাদ সেদিকে যাবে। কিন্তু এমনটি অবশ্যই যে, ইজতিহাদের কারণে কোন মাসয়ালা যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর তবিয়তগতভাবে পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন বাকি থাকবে না। সেজন্য কুদরতিভাবে পরবর্তী মুজহাহিদদের দেমাগ সেদিকে ধাবিত হবে না। ইজতিহাদের মাধ্যমে অর্জন করা মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার চেষ্টা করা মন চায় না, হাসেল করা জিনিসকে কেউ হাসিল করতে চায় না। কারণ, হাসিল করা জিনিসে শুধু উপকার উঠানো অবশিষ্ট থাকে। তাকে কেউ হাসিল করে না।

মুজতাহিদের কাজ হলো হাকিকত উদঘাটন

উপরের আলোচনা থেকে আপনারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একজন মুজতাহিদের কাজ শুধু ভাসা-ভাসা তথা প্রকাশ্য বিষয়কে দেখা নয় বরং সেগুলোর গভীরে প্রবেশ করে সেগুলোর বুনিয়াদ তথা উৎস অনুসন্ধান করা। আবিষ্কার জগতের বস্তুসমূহের জাহেরী সুরত থেকে অতিক্রম করে সেগুলোর অদৃশ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের সন্ধান করবে, যাতে সেগুলোর বাতেনী কুল্লিয়াত এবং অভ্যন্তরীণ প্রশস্ততার দ্বারা নিজের ইলমকে সুপ্রশস্তত করে কোন কিছু আবিষ্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আর মুজতাহিদ শরয়ী মাসায়েল ও সুস্পষ্ট বিধানের তথা নস্ এর প্রকাশ্য সুরত অতিক্রম করে সেগুলোর বাতেনে প্রবেশ করবে, যাতে ইল্লাতে কুল্লিয়াত এবং সম্পূরক আসরার বা রহস্যের অনুসন্ধান করে সেগুলো শাখাগত মাসয়ালাসমূহকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য বানাতে পারেন।

সারকথা হলো, জুযইয়্যাত থেকে কুল্লিয়াত পর্যন্ত পৌঁছা এবং কুল্লিয়াত থেকে নতুন নতুন জুযইয়্যাত উদ্ভাবন করা ওই দুই প্রকার মানুষের কাজ। শুধু প্রকাশ্য জুযইয়্যাতকে মুখস্থ করা তা মূলত হেফয হবে, ইলম অর্জন হবে না।

অথবা নিম্নমানের ইলম অর্জন হয়ে– উচ্চমানের নয়।

উদাহরণস্বরূপ তাকভিন কর্মের ধারাবাহিকতায় জগতের অসংখ্য জুযইয়্যাত ও এককগুলি, যায়েদ, আমর, বকর, বৃক্ষ,প্রস্তর এবং জল ও স্থলকে দেখে নেওয়া অথবা শুনেই জেনে নেওয়া কোন উল্লেখযোগ্য ইলম নয়। এমন ইলম সাধারণ হতে সাধারণ মানুষের হতে পারে। এমনকি এটি ইলম নয় বরং উপলব্ধি। চাই চোখ দ্বারা অনুভব করুক বা কর্ণ দ্বারা অনুভব করুক। তবে এতটুকু অবগত হওয়া যে, জায়েদ কোন কুল্লিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তার হাকিকতের গঠন কোন-কোন কুল্লি থেকে হতে পারে এবং তার মাহিয়্যাত তথা মূল ধাতুতে কোন কোন কুল্লিয়াত অংশীদার। ফের কুল্লিয়াতের সাথে জুয়্যীর কেমন সম্পর্ক। এগুলো হলো হাকিকী ইলম যা হিস্ তথা উপলব্ধির স্তর হতে উচ্চতর।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, যায়েদ এবং যায়েদের মতো জগতের জুযইয়্যাত বিক্ষিপ্ত এবং সম্পর্কহীন নয়। বরং প্রতিটি জুযইয়্যাতের মধ্যে অনেক কুল্লিয়াত প্রবেশ করে। কারণ, এই সমস্ত জুয্ইয়্যাত ও আফরাদ এককে সংকুচিত ও একত্রিত করে কোন না কোন শ্রেণী বা জাতিতে অন্ত র্ভুক্ত হয়। তারপর সকল শ্রেণী একত্রিত হয়ে কোনো জিন্সে (জাতিতে) অন্ত র্ভুক্ত হয়। অতঃপর সকল জিন্স একত্রিত হয়ে কোন জিন্সে আলী তথা জিন্সুল আজনায (সর্বোচ্চ জাতিতে)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আর জগতের সৃষ্টিগত বিন্যাস ও শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করে অনুমিত হয় যে, জগতের সকল জুয্ একত্রিত হয়ে কুল্লিয়াতের দিকে এবং একক কুল্লি ছড়িয়ে জুয্ইয়্যাতের প্রতি দৌড়াচ্ছে। সুতরাং এই একক যায়েদ প্রকাশ্যে তো একক ব্যক্তি। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে সে একটি পৃথক জাহান, যাতে ধারাবাহিকভাবে হাজারো কুল্লিয়াত ও উমুমাত (ব্যাপকতা) স্থান করে নিয়েছে আর তার ব্যক্তিত্বের গঠন ও পূর্ণতা দান করছে।

এই জুযয়ী ব্যক্তি যায়েদের উপর ইনসান কুল্লি যাতে যায়েদের মতো লাখো মানুষ শামিল রয়েছে। তারপর ইনসান কুল্লির হাকিকতে অথবা তার উপর হায়ওয়ান, যাতে হায়ওয়ান প্রাণীর মতো লাখো প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত আছে। অতঃপর নামি তথা বর্ধনশীল কুল্লির আসল দেহ, যাতে নামির সাথে লক্ষ লক্ষ বেনামি এবং অপ্রসিদ্ধ জড়পদার্থ শামিল রয়েছে। তারপর মুতলাক দেহের উপর হলো জাওহার (মূল ধাতু), যাতে দেহবিশিষ্ট বস্তুর সাথে অগণিত দেহহীন মুজাররাদাতও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর জাওহারের উপর হলো ওজুদ বা অস্তিত্ব, যা কুল্লির কুল্লি এবং জিন্সের জিন্স। তার

অধীনে জাওহাবের সঙ্গে অপ্রাকৃত ও অস্থায়ী বস্তু এসে যায়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার মাহিয়্যাত ও শাখা-প্রশাখাগত জুযইয়্যাত ওই মধ্যমপন্থী কুল্লিয়াত থেকে অতিক্রম করে ওজুদের মধ্যে একত্রিত হয়, যা সকল বস্তুর মূলের মূল।

এমনিভাবে এক জায়েদের নির্মাণের মধ্যে কি পরিমাণ কুল্লিয়াত নিজেদের চেষ্টা করে লাগিয়েছে। এর অনুমান এভাবে করা যায় যে, ওজুদ জাওহারের পোশাক পরিধান করেছে। জাওহার দেহের জুব্বা গায়ে দিয়েছে। দেহ নামি তথা বর্ধনশীল বস্তুর চাদর গায়ে জড়িয়েছে আর নামি প্রাণীজগতের মধ্যে কদম রেখেছে। আর হায়ওয়ান মানবতার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে এবং ইনসান সকল ব্যক্তিত্বের সাথে জায়েদকে জগতের সামনে প্রকাশ করেছে। অতএব, আসল ও কুল্লিয়াতের সমষ্টি তার জুযইয়্যাতের এত পরিমাণ কুল্লিয়াত অন্ত র্ভুক্ত। বরং তার মাধ্যমে নিজে সদৃশ্য হয়ে প্রকাশ হচ্ছে।

একজন সাধারণ মানুষ স্রেফ জায়েদকে দেখে নেবে। কিন্তু একজন চিন্তাশীল গবেষক শুধু যায়েদকে দেখার উপর সন্তুষ্ট থাকবে না। তার গভীর দৃষ্টি ওই অদৃশ্য কুল্লিয়াত ও রহস্য পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যার দ্বারা যায়েদের অস্তিত্ব গঠিত হয়েছে এবং সে বর্তমান অবয়বে মানুষের নজরে আসার যোগ্য হয়েছে। যে সাধারণ ব্যক্তি যার শুধু কপালের চুমু ছিল তাকে কি চক্ষুষ্মান বলা হবে? আর যে গোপন চোখে জায়েদের সকল গোপন রহস্যকে দেখে ফেলেছে, তাকে চক্ষুষ্মান বলা হবে। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, জায়েদের অবয়ব দেখে ফেলা ইলম নয় বরং তার সমগ্র হাকিকত আয়ত্ত করা এবং যায়েদ ব্যক্তির সাথে ওই কুল্লিয়াতের সম্পর্ক জানার নামই ইলম, যা সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শরীয়ত চূড়ান্ত পর্যায়ে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত

তেমনি শরীয়তের মাঝে একই অবস্থা যে, শরীয়তের লাখ লাখ মাসয়ালা এবং এর বিবদমান অবস্থা শুধু দৃশ্যত ও বাহ্যত সম্ভব নয়। বরং পূর্ণ শরীয়ত নিজের বাহ্য মাসায়েল এবং বাতেন ও অদৃশ্য প্রমাণাদি, সাথে-সাথে তামাম শাখা এবং আসল অনুপাতে এমন পর্যায়ে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত যে, তা একটি সোজা জিনিসের মতো, যাতে সকল উসুল ও শাখা এবং জুয্ইয়্যাত ও কুল্লিয়াত ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত আছে।

শরীয়তের এমন কোন জুয্ ও শাখা নেই, যা কোন না কোন কুল্লির সাথে

সম্পর্কযুক্ত নয়। প্রতিটি ফরজ শাখা কোন না কোন উসূল সাথে সাথে সম্পৃক্ত আছে। তারপর প্রতিটি উসূল কোন না কোন আসল উসূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পরিশেষে সমগ্র উসূল ও কুল্লিয়াতকে একত্রিত করে কোন বিশুদ্ধ মূলের সাথে জড়ানো হয়েছে, যার ফলে পুরো শরীয়ত একটি আশ্চর্যজনক নিযাবের অধীন এবং এমন একটি বৃক্ষের আকৃতিতে দেখা যায়, যার সকল শাখায় শাখায়, ডালে ডালে ফলসহ একটি মূলের উপর ক্রমোন্নতি হচ্ছে। আর সর্বদা আপন উপকার প্রার্থীদের নিজ ফল ও ফুল দ্বারা ঐশ্চর্যশালী ও লাভবান বানাচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে–

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ○

পবিত্র বাক্য হলো ওই পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার শিকড় মজবুত অনেক নিচ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং শাখা আকাশের সাথে। অর্থাৎ অনেক উঁচু। সে তার পালনকর্তার নির্দেশে প্রতিনিয়ত ফল দান করে। *[সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ২৪]*

সুতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহে শাখাগত আহকাম বর্ণিত হয়েছে, যা যায়েদ, উমর ও বকরের মতো ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর গঠন (খসড়া) ওই উসুল ও কুল্লিয়াত, ইল্লাত ও রহস্য হেকমত করে, যা ওই জুযইয়্যাতের মধ্যে তথা শাখাগত আহকামে গোপন থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক জুযের মধ্যে একটি ইলমে কুল্লি থাকে এবং প্রত্যেক ইলমে কুল্লির মধ্যে কোন না কোন হেকমত, মুসলেহাতে কুল্লিয়া গোপন থাকে। তারপর প্রত্যেক মুসলিহাত-যুক্তিসিদ্ধতার সম্পর্ক কোন না কোন শানে কামালের সাথে থাকে। অতঃপর শানে কামালের সম্পর্ক কোন না কোন সিফাতে ইলাহীর সঙ্গে থাকে, যার দ্বারা ব্যক্তি ইনসানের অসম্পূর্ণ সিফাত, উক্ত জুয়্যী-শরীয়তের পূর্ণতার মাধ্যমে কামাল তথা পূর্ণতার প্রভাব গ্রহণ করে এবং তারপর এই সিফাতে কামাল আল্লাহ তায়ালার বরকতময় জাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, কামালাতের উৎসমূলই উপস্থিত।

তেমনিভাবে সমস্ত শরীয়ত পরিশেষে ওই মধ্যবর্তী উসুল ও কুল্লিয়াত এবং শান ও সিফাতসমূহ থেকে অতিক্রম করে আপন ওজুদ ও অস্তিত্বের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ শরীয়তের সকল আমর (আদেশ) ও নাহী (নিষেধ), যা আফরাদের স্থলে, আপন আপন ইল্লতের অধীনে যা আন্ওয়া শ্রেণীর স্থলে। তারপর সকল আন্ওয়া একত্রিত ও সমষ্টি হয়ে দুটি জিন্সের (জাতের)

অধীনে চলে আসে। তা হলো মারুফ ও মুনকার। অতএব সকল মামুরাতে উৎসগিরি হলো মারুফ আর সকল মানহিয়াতের উৎসস্থল হলো মুনকার। এ-বিষয়টিকে কুরআনুল কারীম এভাবে সুস্পষ্ট করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

সে সময় লোক যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ-রাসূলের যিনি উম্মি নিরক্ষর নবী যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাজে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিল লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে আমরে বিল মারুফ করেন এবং নাহি আনিল মুনকার করেন। *[সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭]*

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আদেশকৃত বস্তু হলো মারুফ আর নিষেধকৃত বস্তু হলো মুনকার। এখন যে বস্তুর মধ্যে মারুফিয়্যাত থাকবে, তাই আদেশকৃত হবে। আর যে বস্তুর মধ্যে মুনকারিয়ত থাকবে, তাই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এজন্য মামুরে যিহনিই মূলত মারুফ ও মুনকার যে, যেহেনই মূলত ভালো ও মন্দ। মোটকথা, মানসিক কর্ম দুটি বস্তু, যাতে মারুফিয়াত ও মুনকারিয়াত পাওয়া যায়। এদের ভাল ও মন্দ সত্তাগত হয় না বরং অন্যের কারণে ভাল ও মন্দ হয়। সুতরাং এ মারুফ ও মুনকারের উভয় জিন্‌স আল্লাহ তায়ালার সিফাতে আদলের অধীনে চলে আসবে। আর আল্লাহর আদেশের তাকাজা হলো, মারুফাত পালনযোগ্য আর মুনকারাত পরিহারযোগ্য।

অতএব, দীনের অধিকার এ-সিফাতে আদল জিন্‌সে আলী তথা সর্বোচ্চ শ্রেণীর স্থলে। আর প্রকাশ থাকে যে, আদল হলো তার অস্তিত্বের অংশ। অর্থাৎ কামালের ওজুদ (অস্তিত্ব)। সেজন্য সকল আমর ও নাহী পরিশেষে ওজুদে ইলাহীর সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর এমনিভাবে পুরো শরীয়ত বরকতপূর্ণ সত্তার সাথে জড়িত হয়। উক্ত বিষয়টিকে সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য করার জন্য নিম্নের উদাহরণগুলোতে চিন্তা-ফিকির করতে হবে।

তানযিমে শরীয়তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

ولا تقربوا الزنا

যিনার কাছেও উপস্থিত হয়ো না।

সাথে-সাথে তার ইল্লাত (কারণ) বলে দিয়েছেন।

انه كان فاحشة

কারণ যিনা হলো অশ্লীল কর্ম।

সুতরাং প্রকাশভাবে لا تقربوا হুকুম যিনার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাস্তবে ফুহ্শ্ (অশ্লীল) এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ফুহ্শের কারণেই যিনাকে হারাম করা হয়েছে। যদি তাতে ফুহ্শ এর শান না হতো, তাহলে তা কখনও হারাম হতো না। আর এ-ব্যাপারটি অন্যস্থানে সুস্পষ্টও করেছেন এভাবে–

وينهى عن الفحشاء والمنكر

আল্লাহ তায়ালা ফুহ্শ ও মুনকার হতে বাধা দেন।

অতএব হুকুমের আকৃতি এমন হলো যে, যিনা ফুহ্শ কর্ম আর ফুহ্শ হারাম। অতএব যিনা হারাম।

সুতরাং মূলত ফুহ্শ হলো হারামের জিন্স (মূল)। আর সে কারণে যিনা হলো হারামের জুয বা একক। একথার নতিজা হলো ফুহ্শের ইল্লতে কুল্লিয়া যে সমস্ত কর্মে পাওয়া যাবে, সে-সকল কর্ম হারাম বনে যাবে। কিন্তু একথা জানানো যে, অমুক জুযইয়্যাতের মধ্যে ফুহ্শ রয়েছে অথবা নেই এটা সবার কাজ নয়। এখান থেকে মুজতাহিদদের কাজের সীমানার সূচনা যে, কোন কর্মের মধ্যে ফুহ্শের শান প্রমাণ করে তাতে হারাম হওয়ার বিধান সম্পৃক্ত করা। এ-গুলো মুজতাহিদ দেমাগের কর্ম, যাদের শরীয়তের সাথে স্বভাবগত ও রুচিগত সম্পর্ক রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা ওই যোগ্যতা কুদরতিভাবে তাদের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। অতঃপর ফুহ্শ হারাম হওয়ার ইল্লতও রয়েছে। যার কারণে ফুহ্শের মধ্যে অবৈধতা আসে আর তা আল্লাহ তায়ালা সিফাতে হায়া।

ইরশাদ হয়েছে–

ان الله حيى وستير

নিশ্চয়ই আল্লাহ লাজুক ও গোপনকারী।

সিফাতে হায়ার জন্মগত তাকাজা হলো, তাঁর বান্দাদের মাঝে যাতে ফুহ্শ প্রকাশ না হয়। অতএব, জুযয়ী হুকুম অর্থাৎ যিনার হুরমত (অবৈধতা) ফুহ্শ হুরমত থেকে সৃষ্টি। আর হুরমাতে ফুহ্শ আল্লাহ তায়ালার হায়া সিফাত হতে বের হয়েছে। এজন্য যিনার সাথে আরো সমস্ত ফাহেশার হুরমাতের

ইল্লাতে কুল্লি আল্লাহ তায়ালার একটি কামাল সিফাত হতে বের হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্বের একটি অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে হায়া হাল পর্যায়ে পৌছেছে এবং সে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যভাবে তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে এবং তার মাঝে ও সৃষ্টি জীবের মাঝে হায়ায়ে কামেল তথা পরিপূর্ণ হায়ার জন্য মজবুর হয় অপরদিকে অন্তরে ইজতিহাদের রুচি রাখে এবং দেমাগে পূর্ণ আকল বৃদ্ধি, তাহলে নিঃসন্দেহে সে এই হায়া এবং এর তাকাজার দ্বারা হুরমাতে ফুহ্শ এবং এর তাকাজা দ্বারা হুরমাতে যিনা অতঃপর হরমাতে যিনার তাকাজা দ্বারা সাধারণত যিনার আহ্বানকারী প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন সুরতে আকৃতিতে প্রকাশ পায়।

এগুলো জেনে হুরমাত হারামের হুকুম আরোপ করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, এ ইজতিহাদের কারণে শরীয়তের পরিধি কী পরিমাণ সুপ্রশস্ত হলো। আর শুধু যিনার হুকুম দ্বারা কত পরিমাণ আহকাম সৃষ্টি হলো, যা মুজতাহিদের দীনদারী ও আমানতদারী এবং ফিকহী অভিজ্ঞতা ইজতিহাদের ফলাফল। সুতরাং এমন আহকাম যাতে ইল্লতে কুল্লিয়া প্রকাশ্য নসে বিদ্যমান, তাতে মুজতাহিদের কাজ হলো কিয়াস (তুলনা করা) করা যে, ইল্লতের মিল থাকার কারণে অন্যান্য মাসয়ালাতে কিয়াস করে হারাম হওয়ার হুকুম লাগানো এবং আহকামের পরিধি সুপ্রশস্ত করা।

আর কখনও নস্-এর মধ্যে শুধু হুকুম উল্লেখ থাকে। আর তা ইল্লত বা কারণ হুকুমের মাঝে গোপন ও উহ্য থাকে। কিন্তু যে বস্তুগুলোর উপর এ-নস্ হুকুম আরোপ করে, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে কিছু গুণ থাকে, যা হুকুমের মধ্যে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ হুকুমের ইল্লাত ওই গুণাবলিতে মিশে থাকে। মুজতাহিদের গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাকে ওই গুণাবলি থেকে পরিষ্কার করে বের করে আনে। আর হুকুমের ইল্লাত প্রকাশ হওয়ার কারণে জুয্য়ী হুকুম কুল্লির মর্যাদা লাভ করে অন্যান্য জুয্ইয়্যাতে পৌছে যায়। এভাবে একজন মুজতাহিদের ইজতিহাদী নূর দ্বারা উক্ত জুয্য়ী হুকুম একটি সুপ্রশস্ত পরিধি সৃষ্টি করে। ফলে শরীয়তের ব্যাপকতা ও সুবিন্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ সুদের হাদীসসমূহে শুধু ছয় বস্তুর যথা– গম, ভুট্টা/যব, খেজুর, লবণ, স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে সুদ গ্রহণ করা হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু হুরমতের কারণ এবং ইল্লাত কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। এজন্য মুজতাহিদগণ মনোনিবেশ করেছেন যে, হুকুমের হেকমত বা হুরমাতকে উক্ত ছয় বস্তুর মধ্যে বিশেষিত করার কারণ কী হতে পারে? অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতা সুদ হারাম হওয়ার জন্য উক্ত ছয় বস্তুকে কেন নির্দিষ্ট করেছেন? আসহাবে যাওয়াহের

যারা কিয়াস অস্বীকারকারী তাদের ব্যতীত সকলেই উক্ত বস্তুগুলোর গুণাবলিতে নিজেদের ইজতিহাদী শক্তি দ্বারা চিন্তা-গবেষণা করে এমন কিছু সমষ্টিগত গুণাবলি বের করেছেন, যেগুলো হুকুমের ইল্লাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট গুণ হলো পরিমাণও একই জিন্স (জাত)। ইমাম শাফী রহ.-এর মতে, খাদ্য জাতীয় এবং স্বর্ণ-রূপাতে মূল্য এক হওয়া। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে খাদ্য ও গুদামজাতযোগ্য সম্পদ। ইমাম আহমাদ রহ. ইমাম আয্মের মতকে গ্রহণ করেছেন।

যাহোক, প্রত্যেকে একটি করে ইল্লাত উদ্ভাবন করেছেন, যার উপর সুদ হারাম হওয়ার ইল্লাত পরিবেষ্টিত। এখন যেখানে যেখানে তাদের উদ্ভাবন করা ইল্লাত পাওয়া যাবে, সেখানে সেখানে তারা তাদের ইল্লাত অনুযায়ী সুদের হুকুম লাগাবেন। এমন স্থানে মুজতাহিদদের কাজ হলো প্রথমে ইল্লাত উদ্ভাবন করা, তারপর হুকুমের কিয়াস নির্ধারণ করা।

৩. কখনও নসের মধ্যে স্রেফ হুকুম ব্যতীত কোন ইল্লাত থাকে না। নস্ বা হুকুম কোনোটার ইল্লাত থাকে না। আবার তার মধ্যে এমন কোন সিফাত ও বৈশিষ্ট্যও থাকে না, যা দ্বারা হুকুমের ইল্লাত উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণ শুধু নিজেদের ইজতিহাদী রুচির মাধ্যমে আগে বাড়েন এবং সাধারণ শরয়ী কায়দা কানুন এবং শরীয়তের আবিষ্কারের সাহায্যে যেগুলোর উপস্থিতিতে ওই শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ততা এবং তার ইজতিহাদী শক্তির গঠন তৈরি হয়, তা দ্বারা ইল্লাত উদ্ভাবন করেন। আর জুয্য়ী হুকুম ইল্লাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করে তারপর উক্ত ইল্লাত থেকে বিভিন্ন অধ্যায়ের আহকাম, কিয়াসের সাহায্যে প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

ঘরসমূহে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। *[সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৯]*

ইজতিহাদী রুচি দ্বারা এর কুল্লি ইল্লাত, যা থেকে উক্ত বিধানের সৃষ্টি।

একথা তো সুস্পষ্ট যে, ঘরের গেট বা দরজা থাকা অবস্থায় ওয়াল টপকিয়ে প্রবেশ করা অত্যন্ত অসুন্দর, অযোগ্যতা, অভদ্রতা এবং নীতিহীন কাজ। অতএব, এখানে মূলত নিষেধ করা হয়েছে অভদ্রতা ও অসুন্দরতাকে। যেহেতু এই অসুন্দরতা ঘরে ওয়াল ভেঙ্গে অথবা লাফ দিয়ে প্রবেশ করার মধ্যে পাওয়া। তাই নিষেধ করা হয়েছে। তা নিষেধ হওয়ার ইল্লাত হলো

অসুন্দরতা। আর তা নিষিদ্ধ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার জামাল এবং আদল সিফাতের তাকাজায়। কারণ, জামাল অর্থ প্রকৃত সমতা এবং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। আর আদল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে জায়গামত স্থাপন করা। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বেঢঙা, অসুন্দরতা এবং নীতিহীনতা তার বিপরীত। সেজন্য আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেননি। আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। সুতরাং যার মেধাশক্তিতে প্রকৃত সমতাকরণের ক্ষমতা পরিপূর্ণ রয়েছে অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তায়ালার সিফাতে জামাল দ্বারা সুসজ্জিত এবং তার চরিত্রে চরিত্রবান অপরদিকে আল্লাহ প্রদত্ত ইজতিহাদী যোগ্যতাও রাখেন, তাহলে তিনি এমন কুল্লিয়াত উদ্ভাবন করার পর স্রেফ ওই জুযয়ী হুকুমের উপর তুষ্ট থাকবেন না, যা আয়াতে রয়েছে। বরং প্রতিটি অধ্যায়ে, এহেন প্রতিটি কর্মকে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় আখ্যা দিবেন, যেগুলোর মধ্যে অসুন্দরের ইল্লাত ও কারণ পাওয়া যাবে। তবে এ কথা জানা যে, এই ইল্লাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা সবার কাজ নয়। আর প্রত্যেকের অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, ইল্লাত উদ্ভাবনের উপর শাখাগত হুকুম প্রশস্ততা লাভ করা মৌকুফ। অতএব, যদি ইল্লাত কুল্লি হয়, তাহলে তার অর্থ হবে এমন যে, মুজতাহিদের উপর একটি কুল্লি আবিষ্কার হলো, যাতে অনেক অজানা জুযইয়্যাত জানা যাবে। প্রকাশ থাকে যে, এ কোনো অভিযোগযোগ্য বিষয় হবে না যে, তিনি কেন কুল্লিয়াত বানালেন। কারণ, তিনি তো তা নিজ হাতে বানাননি। বরং তিনি বলেন, তা নিজেই বিদ্যমান। কেননা, ইলমের যত পরিমাণ গোপনীয়তা বৃদ্ধি পাবে, তত পরিমাণ কুল্লিয়াত আসবে। অতএব মুজতাহিদের কামাল আর যোগ্যতা হলো ওই গোপনীয়তা প্রকাশ করা। আর কুল্লিয়াত পেশ করা তার জন্য কোনো দোষের কিছু নয়। কোনো অসম্পূর্ণতা নয়।

উলুম উন্মোচিতকরণে নবী ও উম্মতের মাঝে পার্থক্য

তবে এখানে এতটুকু পার্থক্য বুঝে নেওয়া উচিত যে, নবীদের উপর ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইল্লত ও কুল্লিয়াত উন্মোচিত হত। তারপর সে সম্পর্কিত আহকাম তথা বিধিবিধান উন্মোচিত হতো, প্রকাশ পেত। অর্থাৎ তাদের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মেধায় প্রথমে উদ্দেশ্য ও কুল্লিয়াত আসবে। অতএব, মুজতাহিদের কামাল আর যোগ্যতা হলো ওই গোপনীয়তা প্রকাশ করা। আর কুল্লিয়াত পেশ করা তার জন্য কোনো দোষের কিছু নয়। কোনো অসম্পূর্ণতা

নয়।

কারণ, প্রথমে এর সম্পর্ক বিশেষ শক্তির অধীনে আল্লাহ পাকের প্রথম জগতের সঙ্গে। তারপর জাত থেকে সিফাতসমূহের দিকে, অতঃপর সিফাত থেকে কর্ম ও আহকামের দিকে আসেন। কিন্তু মুজতাহিদ ও উম্মতের মুহাদ্দিসদের আলোকিত অন্তরে প্রথমে দরস ও তাদরীস (লেখাপড়া) এবং বর্ণনার মাধ্যমে আহকামের জুযইয়্যাত একত্রিত হয়। তারপর ইলম ও আমলের অনুশীলন, তাযকিয়ায়ে নাফস, অন্তর পবিত্রকরণের বরকত এবং সর্বকালীন যিকির ও ফিকির এবং সর্বদা চিন্তা-গবেষণার দ্বারা ইল্লাত ও কুল্লিয়াত উন্মোচিত হয়। ফরে তাদের জন্য উদ্ভাবন ও কিয়াস এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত হবে। কারণ উম্মতের সম্পর্ক প্রথমে আল্লাহপাকের জাতের সঙ্গে হয় না। বরং যুগের নবী এবং তার আনীত শরীয়তের ইত্তেবার সাথে হয়। অর্থাৎ প্রথমে আহকাম সামনে আসে। তারপর সেগুলোর উপর আমলের বরকতে উলুম ও রহস্যভেদ উন্মোচিত হয়। তা হাদীস থেকে বোঝা যায় যে–

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم

যে নিজ ইলমের উপর আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ইলমের অধিকারী বানান, যা এখনও তার নিকট ছিল না।

আর সেই ইলমে ওহাবী তথা আল্লাহ প্রদত্ত ইলম দ্বারা রহস্যভেদ ও কুল্লিয়াত আল্লাহর সিফাতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। তারপর জাত ও সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে।

সারকথা হলো, উক্ত কাইফিয়্যাত বা ব্যবস্থাপনায় উম্মতের মাঝে সমষ্টিগত দীন প্রথমে মুজতাহিদীন এবং গভীর ইলমের অধিকারী আলেমদের মেধায় সন্নিবেশিত হয়। তারপর তারা পরিপূর্ণ বিন্যাস ও তানযিমের সাথে সেই ইলমকে আকৃতি দান করে উম্মতের সামনে রাখেন। ফলে দুনিয়াবাসীর দীনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায় এবং শরীয়তের ওই সহজতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যার দাবি কুরআন ও হাদীসের স্থানে-স্থানে রয়েছে।

যাহোক কোন জুয়্যী মাসয়ালার মাধ্যমে কুল্লি মাসয়ালা অনুসন্ধান করা, তারপর উক্ত কুল্লির অধীনে অন্যান্য জুযইয়্যাত নিয়ে আসা এবং ওই সংকলিত কর্মের মাঝে বিন্যাস এবং সম্পর্ক জানতে পারা একজন ফকীহের কাজ। অর্থাৎ ফকীহ কখনও জাহের হতে বাতেনের দিকে যায়, যখন প্রকাশ্য জয় থেকে তার গোপন ইল্লাত বের করে এবং কখনও বাতেন থেকে

জাহেরের দিকে আসে। যখন কুল্লিয়াত থেকে জুযইয়্যাতের দিকে ফিরে আসে। আর তা প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাগমন এবং সর্বসাধারণ এবং আলেমদের তত্ত্বাবধানে উজ্জ্বল হয়। সেজন্য মুজতাহিদ ফকীহদের দৃষ্টিতে শরীয়ত, ব্যক্তিগত রায় দ্বারা কার্যকরী হয়। কোন অবুঝ একে দোষারোপ করার জন্য কিয়াস বলে। অপর রায় দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ইত্যাদিরা মনে করে এ রায় ও কিয়াস শুধু আকল দ্বারা হয় না। আর তা শুধু চিন্তাশক্তির ফলে হতে পারে না যে, একে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ বলা হবে। বরং তা ওই রুচিশক্তির ফলে হয়, যা শরীয়তের ইলম ও আমলের চর্চার দ্বারা সত্যবাদী জযবা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়।

সুতরাং এ হস্তক্ষেপ স্বয়ং শরীয়তেরই মূল শরীয়তের মধ্যে হয়, কোন ব্যক্তির নয়। কিন্তু তা প্রকাশ হয় ব্যক্তির মাধ্যমে। যেমনভাবে তামাম আসমানি শরীয়ত প্রকাশ হয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে, কিন্তু তা হয় তো নবীদের যবান ও কালবের উপর। অতএব, তা দোষের বস্তু নয়, কোন অবাক ও আশ্চর্য বস্তু নয়। নবীদের পর উম্মতের মাঝে মুজাদ্দিদ হয়ে থাকে, যার সংবাদ নবীগণ দিয়ে গেছেন। শরীয়তের ভাষায় যাকে মুকাল্লিম বলা হয়। আম্বিয়া আ. ব্যতীত, যাদের নিকট কাশফে ইলাহী এবং উলুমে শরীয়ত, ইলহামের মাধ্যমে পৌছানো হয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুজাদ্দিদ বলে। যাহোক এই মুজাদ্দিদাতের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম এবং আল্লাহর সাথে সকল কুল্লিয়াতি সম্পর্ক উন্মোচিত হয়। ফলে পুরো শরীয়তের সম্পর্ক ওই কুল্লিয়াতের সাথে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

নির্যাস কথা হলো, সৃষ্টিগতের ন্যায় আলমে আমর তথা বিধানজগতের কর্মাবলিও সম্পর্কহীন নয়; বরং শরীয়তের প্রতিটি জুস্-অংশ আপন শ্রেণীগত উসূর ও ইল্লত, তারপর উচ্চতর জিন্স মারুফ ও মুনকার, তারপর আরো উচ্চতর জিন্স সিফাতে ইলাহী এবং তারপর জিন্সের জিন্স আদল-ইনসাফ এবং তাতেও উচ্চতর পরিবেষ্টনকারী ইলমে মুহীত্ব এবং তার চেয়ে উচ্চতর সীমাহীন ওজুদ ও অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক হয়, তারপর বরকতময় সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমনিভাবে তাকভিনি জুযইয়্যাত যায়েদ, আমর, বকর ইত্যাদির সর্বশেষ প্রত্যাবর্তনস্থল দেহ ও জাওহার (মূল ধাতু) থেকে অতিক্রম করে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তেমনি শরীয়তের সকল মাসায়েলের উৎস ও মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে পরিশেষে ওই জাত প্রকাশ হয়।

অতএব, তাকভিনি ও তাশরিয়ী উভয়ের উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল এক জাতে পাক আল্লাহ তায়ালা। যেমনটি কুরআনের দাবি যা প্রথমে বর্ণনা করা

হয়েছে। এতে এও সুস্পষ্ট হয় যে, যেমনভাবে পুরো কায়েনাত হক তায়ালার জামাল গুণের আয়না, যার মধ্যে তাঁর কর্মাবলি প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে পুরো শরীয়ত হক তায়ালার গুণের আয়না, যার মধ্যে তার বর্ণনা এবং ইলমি গুণাবলি প্রকাশ পায়।

কিতাব ও সুন্নাহর নুসুসের জাহের ও বাতেন

সুতরাং আমর ও নাহির এ দীর্ঘ ধারাবাহিকতা হতে শুধু আমর ও নাহী অথবা নম্সমূহের হুকুম জেনে নেওয়া পরিপূর্ণ ইলম নয়। বরং দীর্ঘ সিলসিলার মধ্য থেকে জুযইয়্যাতের উচ্চতর ইল্লাত ও কুল্লিয়াত এবং তারপর এগুলো উচ্চতর শান ও সিফাতের সাথে সেগুলোর সম্পর্ক এবং সম্পর্কের অবস্থা অবগত হওয়া এবং ওই হুকুমের নেসবত এবং অবস্থার নেসবতকে উন্মোচিত করা। আর এগুলোর মারুফিয়্যাত ও মুনকারিয়্যাতের অবস্থা জেনে সিফাত ও প্রকারভেদ ওয়াজিব, ফরজ, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নির্ধারণ করা ইলমের পূর্ণতা, যা গভীর ইলমের অধিকারী এবং ইলমের জগতে যারা মুরুব্বী তাদের অংশে অর্জন হয়েছে, তাদের লাভ হয়ে থাকে।

নুসুসের এ-ক্রমাধারা হুকুম ও ইল্লাত অথবা প্রকাশ্য মর্ম এবং গোপন মর্মকে যেভাবে আয়াতে শাজারা শরীয়তের শব্দাবলিকে শাজারা বা বৃক্ষের সাথে সদৃশ্য দিয়ে পেশ করেছে যে, যেমন বৃক্ষের মধ্যে উসূল (মূল) ও ফুরু (শাখা) থাকে, ফুরু প্রকাশ্য থাকে আর উসূল গোপন ও উহ্য থাকে। আর ফুরুতে উসূলই কার্যকারক হয়ে থাকে। অর্থাৎ ফুরু মূলত উসূলের প্রদর্শনস্থল; যার আকৃতিতে উসূলের শক্তি প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে নিম্নের হাদীসগুলো জাহের ও বাতেন ব্যক্ত করছে। কুরআনী নুসুস সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ–

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআনুল কারীমকে সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। প্রত্যেক আয়াতের দুটি ধারা একটি জাহের অপরটি বাতেন। আর প্রত্যেক ধাপে রয়েছে মর্ম জানার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। (অর্থাৎ প্রকাশ্য

মর্মের জন্য আরবী উলুম এবং গোপন মর্মের জন্য বোধশক্তি)।

উক্ত হাদীসে প্রকাশ্য ও বাতেনী আয়াত উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক অবগতির কথা বলা হয়েছে। অবগতি বলা হয় জানালা ও উঁকি মেরে দেখার স্থানকে। যেমনিভাবে জানালা ও উঁকি মেরে দেখার স্থানসমূহের দ্বারা ওই বস্তুসমূহ দেখা যায়, যেগুলো তার বিপরীত হয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, তেমনিভাবে আয়াতের প্রকাশ্য মর্ম অর্থাৎ শাব্দিক অর্থ জানার জন্য আরবী বাতায়ন যে আরবীর প্রকাশ শ্রেণীভেদ এবং বাক্যের গঠনপদ্ধতির উপর পূর্ণ অবগতি, পরিভাষা এবং প্রবাদ বাক্য দ্বারা জানা যায়। ফাসাহাত ও বালাগাতের তথা শব্দ ও অর্থ অলংকারের গভীর জ্ঞান, শব্দ উচ্চারণ এবং সেগুলো পরিচয়ের অবগতি লাভ করা, সেগুলোর সাহায্যে আয়াতে কুরআনীর সঠিক মর্ম প্রকাশ পেতে পারে, উন্মোচিত হতে পারে। তবে শর্ত হলো, সুস্থ অভিরুচি থাকতে হবে, সুস্থ রুচিবোধ দ্বারা সজ্জিত হতে হবে।

কিন্তু আয়াতের বাতেন অর্থাৎ গোপন অর্থ এবং গোপন আহকাম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। সেগুলো অবগতস্থল এবং বাতায়ন ও ইল্লত ও আহকাম। সেগুলোর উপর মুজতাহিদগণ নিজেদের বোধশক্তি ও ইজতিহাদী রুচি দ্বারা অবগতি অর্জন করতে পারে। ওই ইল্লতের জানালার মাধ্যমে ওই সমস্ত গোপন আহকাম উন্মোচিত হয়, যেগুলো ওই ইল্লাতের বিপরীত অর্থাৎ সেই ইল্লাতের মর্ম হয়, চাই তা নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী। অর্থাৎ বাতেনী আয়াত নিকটবর্তী হোক যেমন হুকুমের ইল্লাত বা দূরবর্তী হোক যেমন সাধারণ কুল্লিয়াত অথবা সর্বোচ্চ দূরবর্তী হোক যেমন হক তায়ালার সিফাত, যা আসল ইল্লাত। কারণ, আল্লাহর হক বা বান্দার হক উভয়ের আসল দাবিদার হলো আল্লাহর সিফাত। যেমন– আল্লাহর প্রভূত্বের সিফাত ও আযমত, ইবাদত ও সম্মানের প্রার্থনাকারী। আল্লাহর চক্ষুষ্মান হওয়া বান্দার লজ্জা অবলম্বন এবং অশ্লীলতা পরিহার করার দাবি করে। আর আল্লাহর জামিল গুণ হওয়া বান্দার ইশ্‌ক ও মহব্বতের দাবি করে। আল্লাহ মালিক ও বাদশা হওয়া বান্দা থেকে সম্পদ ব্যয় এবং সদকা খয়রাত চায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, যে ব্যক্তিই ওই সমস্ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ইল্লাতের উপর অবগতি লাভ করবেন, তিনি আলেম ও হাকীম উপাধি পাওয়ার হকদার হবেন। আর 'যাকে হেকমতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণ দেখা হয়েছে।' বাক্যের সম্বোধিত ব্যক্তি বলা হবে।

যাহোক উপরের হাদীস যে ইলম, এর গোপন স্তরকে বাতেনী আয়াত দ্বারা আর এই আয়াতে হেকমত দ্বারা আর আয়াতে শাজাবার মধ্যে আসল ও শিকড় দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর যেমনিভাবে ইলমের এ-গভীর স্তর আয়াতে কুরআনীতে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে নবুওয়তের কালামের মধ্যেও পাওয়া যায়। হাদীসেরও দুটি ধাপ রয়েছে– জাহের ও বাতেন। তাও সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধভাষীর কালাম। হাদীস সম্পর্কে স্বয়ং হাদীসপ্রণেতা ইরশাদ করেছেন যে–

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এমন বান্দাকে সতেজ ও উজ্জ্বল করেন, যে আমার কথা শোনে এবং তা আয়ত্ব করে এবং স্মরণ রাখে আর অপরজনের নিকট পৌঁছায়। কেননা, কতক পৌঁছানেয়ালা ইলমকে নিজে বোঝে না। আর কতক এমন ব্যক্তিদের পৌঁছায়, যারা পৌঁছানেওয়ালা হতে বেশি সমঝদার হয়।

এ-হাদীসে কিছু ছাত্র উস্তাদ থেকে উত্তম হওয়া বলা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শুধু বাহ্য অর্থ অবগত হিসেবে ছাত্র উস্তাদ হতে উত্তম হওয়া অর্থহীন। কারণ, উত্তমতার মাপকাটি হলো বাতেনী হাদীস তথা গোপন মর্ম এবং গোপন রহস্য ও ইল্লাত অবগত হওয়া, যেগুলোকে 'ফিকাহ' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইলমে শরীয়তের দুটি ধাপ জাহের ও বাতেন নিম্নের হাদীস দ্বারাও সুস্পষ্ট হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সাহাবাদের উত্তমতা সমস্ত উম্মতের উপর বয়ান করে বলেন–

كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا

সাহাবাগণ সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। তাদের অন্তর সবচেয়ে পবিত্র ছিল। তাদের ইলম সবচেয়ে বেশি গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল। আর তাঁদের লৌকিকতা ছিল সবচেয়ে কম। *[মিশকাত]*

এতে প্রমাণিত হয়, ইলমের আরেকটি ধাপ হলো গভীর ও অগাধ, যা আলেমদের জন্য উত্তম হওয়ার মাপকাঠি। সুতরাং এ মাপকাঠি দ্বারা

সাহাবাদের উত্তম উম্মত বলা হয়েছে। আর এটিই বাতেনীয়দের ধাপ, যাকে গোপন মর্ম এবং রহস্যভেদ ও ইল্লাত শব্দাবলি দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ইলমের বদৌলতে উলামায়ে কেরাম সূক্ষ্মদর্শী এবং দুরুহ বস্তু উন্মোচনকারী হতে পারেন। এরই ভিত্তিতে তাদের মাঝে মর্যাদার স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মর্বতাকে কুরআনুল কারীম হেকমত শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে। কেমন যেন একটি হুকুম আর আরেকটি হলো অভ্যন্তরীণ হেকমত।

ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ

যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। *[সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৯]*

তারপর হাদীসে নববীতে খায়রে কাসীরকে যা হেকমতের ফলাফল, ফিকাহ-এর ফলাফল বলা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের ফিকাহ তথা বুঝ দান করেন।

এতে প্রতীয়মান হয়, হেকমত ও ফিকাহ একই বস্তু। উভয়ের ফলাফল এক ও অভিন্ন। অতএব, একজন ফকীহ দীনের হাকীম হন এবং হাকীমে ইসলাম, ফকীহে দীন হন। যাহোক উক্ত আয়াত দ্বারাও ইলমের গোপন ও বাতেনী ধাপ প্রকাশিত হয়েছে, যা হুকামায়ে ইসলাম, ফুকাহায়ে দীন এবং শক্তিশালী শরীয়তের মুজতাহিদদের সাথে বিশেষিত।

উলামায়ে শরীয়তের দুটি স্তর : আহলে জাওয়াহের এবং আহলে বাতেন

একথা সুস্পষ্ট যে, যখন ইলমুন্নসের দুটি তবকা প্রকাশ হলো; একটি জাহের অপরটি বাতেন অথবা একটি প্রকাশ্য মর্ম অপরটি গোপনীয় মর্ম, তখন অবশ্যই উলামায়ে নুসুসেরও কুদরতিভাবে দুটি তবকা হবে।

একটি জুযইয়্যাতের আলেম, অপরটি কুল্লিয়াতের আলেম। অথবা একটি আলেমে জাহের, অপরটি আলেমে বাতেন। অথবা একটি আলেমে হুকুম

অপরটি আলেম হেকমত। অর্থাৎ একটি তবকা এমন যে, যাদের দৃষ্টি নসের প্রকাশ্য মর্ম পর্যন্ত থেমে যায়। আর অপর তবকা যাদের দৃষ্টি সুগভীর, যা প্রকাশ্য জুযইয়্যাতের তলদেশে পৌঁছে ওই কুল্লির ঠিকানা লাভ করে, যার সুপ্রশস্ত ধারাতে এ জুযয়ী বস্তু একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ থাকে যে, যার দৃষ্টি ইলমে কুল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তার ইলম একটি জুযয়ী নস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং ওই ইল্লাতে জামিয়া তথা সমষ্টিগত ইল্লাতের কারণে হাজারো এমন জুযইয়াত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, যা এ জুযয়ী নসের মতো আমরে কুল্লির ব্যাপকতার মাঝে মিশে আছে।

সেজন্য এ জুযইয়্যাতের আলেম যদিও হাজারো জুযইয়্যাতের বাহক হন, তারপরও ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি আলেম নন। তাকে হাফেয বলা যেতে পারে। তাকে রূপকার্থে আলেম বলা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কুল্লিয়াত ও জুযইয়্যাতে উভয়টির পরিবেষ্টনকারী হয়, তারপর উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক এবং সম্পর্কের অবস্থার আবিষ্কারক এবং অনুভবকারী হয়, তারপর উক্ত সম্পর্ক থেকে হাজারো অজানা জুযইয়্যাত উদ্ভাবন হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে আলেম হওয়ার অধিকার রাখে। অতএব, শুধু আয়াত ও নুসুসের হাফেয, বর্ণনাকারী ও মুহাদ্দিস হন। আর সূক্ষ্মতা ও গোপনীয়তা অনুভবকারী মুজতাহিদ এবং হাফেয হন। এ উভয় তবকাকে নিম্নের হাদীস শরীফ এভাবে ব্যক্ত করেছে–

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

হযরত আবু মুসা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ও আমার আনীত ইলম ও হেদায়েতের উদাহরণ এমন যেমন কোন জমিনে

মুষলধারা বৃষ্টি হলো। তখন জমিনের একটি অংশ অত্যন্ত উত্তম ও উর্বর ছিল, যা পানিকে টেনে নিয়েছে। আর বিভিন্ন রকমের ফল ও পাতা এবং ভাল-মন্দ ফসল উৎপন্ন করেছে। অপর অংশটি ছিল শক্ত, যা বৃষ্টির পানি তো পুঞ্জিভূত করেছে; কিন্তু কোন ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন করেনি। তো আল্লাহ তায়ালা উক্ত জমিন থেকে মানুষকে পানির উপকার পৌঁছালেন যে, তারা পানি পান করেছে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করেছে এবং তা থেকে ক্ষেতে পানি সিঞ্চনও করেছে। আর আরেকটি অংশ ছিল একেবারে খোলা প্রান্ত র। তা পানিকেও আটকায়নি আবার ঘাস-লতার উৎপন্ন করেনি। এই দৃষ্টান্ত ওই লোকদের, যারা আল্লাহর দীনে বুঝ অর্জন করেছে, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং দৃষ্টান্ত তাদের, যারা কোনভাবে এ উপকার হাসিলের স্তরে পৌঁছতে পারেনি এবং তারা আল্লাহ তায়ালার ওই হেদায়েত গ্রহণ করেনি, যা নিয়ে আমি আগমন করেছি। *[বুখারী]*

এ হাদীস শরীফে জমিনের সাথে সদৃশ্য দিয়ে মানুষদের দুভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। একদল দীন থেকে লাভবান হয়। অপর দল লাভবান হয় না। তারপর লাভবানদের দুভাগে ভাগ করেছে। একভাগ উৎপাদনশীল এবং উৎপাদনশীল নয়। অর্থাৎ একদল তারা যারা ইলমে ওহী অর্জন করে, একে আপন অন্তরে ভরে পুঞ্জিভূত করেছে এবং তা থেকে ইস্তেম্বাত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ইলম ও মারেফত এবং ইল্লত ও হুকুম উদ্ভাবন করেছেন এবং সূক্ষ্মতা ও রহস্যভেদ বর্ণনা করে। তারপর ওই বাতেনি উলুমের মাধ্যমে হাজারো অজানা মাসায়েল উম্মতের সামনে পেশ করেছেন, যা দ্বারা দীন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং নথিভুক্ত হয়ে একটি সংবিধান আকৃতি লাভ করেছে।

আর দ্বিতীয় দল, যারা ইলমে ওহী অর্জন করে নিজেদের বক্ষে একত্রিত করেছে এবং পরিপূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে কম ও বেশি করা ব্যতীত অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা চক্ষুষ্মান হবে, তারা তা থেকে ফুল ও ফল বের করতে পারে। প্রথম তবকা হলো ফুকাহায়ে কেরাম, মুজতাহিদীন এবং উলামায়ে রাসেখীন। আর দ্বিতীয় তবকা হলো মুহাদ্দিসগণ ও হাফেযগণ। মুহাদ্দিস ও হাফেযদের কাজ হলো সংরক্ষণ ও আমানতদারির

সাথে কোন প্রকার কম-বেশি করা ব্যতীত বর্ণনা করা। আর ফকীহ ও মুজতাহিদদের দায়িত্ব হলো বুঝ, অনুভব এবং তাহকীক ও পূর্ণ যাচাই-বাছাই করে উপলব্ধি করা যে, ইলমের বীজের ঝরনা বের করে ইলমের সাগরকে উন্নতি করে দেখান।

এ হাদীসে فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ বাক্য দ্বারা মুজতাহিদ এবং মুহাক্কিক ফকীহের ফযিলত, গাইরে মুজতাহিদ হাফিজের উপর প্রকাশ করা হয়েছে। যার কারণ ইলমে বাতেন ব্যতীত অন্যকিছু নয়। এ সকল বর্ণনা দ্বারা আলেমদের দু-তবকাও সুস্পষ্ট হয়েছে। ১. মুজতাহিদ, ২. অমুজতাহিদ। পাশাপাশি মুজতাহিদ ফকীহ এর অফকীহ ও মুজতাহিদের উপর অথবা শুধু বর্ণনাকারীর উপর সাহেবে দিরায়েত ও ফকীহ-এর উত্তমতাও প্রকাশ পেয়েছে, যার রহস্য এ ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, একজন ফকীহ কালামে ইলাহী এবং কালামে নববীর ওই সামষ্টিকতা ও দুর্লভ বালাগাতকে উন্মোচন করেন, যা কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে (প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বর্ণনাকারী) বাক্য দ্বারা এবং হাদীসে রাসূল সম্পর্কে (আমাকে সমগ্র কালাম দেওয়া হয়েছে) বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

মোটকথা, একজন ফকীহ-এর মাধ্যমে কালামুল্লাহর দুর্লভ চেহারা ফুটে ওঠে এবং একত্রিত হয়। ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত ও খতমে নবওয়াতের মাকামের হাকিকত এবং উচ্চ মর্যাদা সুপ্রকাশিত হয়।

সুতরাং উভয় ইলম হলো মুখস্থ করা ও বর্ণনা করা এবং হাকিকী ইলম হলো ফিকাহ ও দিরায়েত তথা তথ্যপূর্ণ বর্ণনা। সেজন্য আলেমদের স্তর ধারার হাফেযে হাদীস বা আহলে হাদীস অথবা মুহাদ্দিস হলেন সূচনাকারী, যিনি ওহীর সামান একত্রিত করে তৈরি করেন। আর ফকীহ ও মুজতাহিদ হলেন সমাপ্তকারী, যিনি স্তূপের নিচের বস্তু বের করেন, যাকে ফিকাহ বলে। সমষ্টিগত জুযইয়্যাত দ্বারা উম্মত তরবিয়াত করেন এবং উক্ত ইলমি স্তূপ থেকে বিভিন্ন রকমের দীনি সামান নির্মাণ করে দীনকে সাজাবেন এবং যেগুলো উম্মতের জন্য ব্যবহার উপযোগী বানাবেন।

সাহাবাদের মাঝে আহলে ইলমদের দুটি তবকা

উক্ত দুই তবকা সাহাবাদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। কেউ হাফেযে হাদীস ছিলেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রা. এবং কেউ ফকীহ ও মুজতাহিদ

ছিলেন। যেমন চার আবদুল্লাহ রা. এবং হযরত শাইখাইন রা. প্রমুখ। তারপর ফুকাহায়ে সাহাবাদের মধ্যেও মর্তবার পার্থক্য ছিল। কতকের বোধ ও বুদ্ধি গভীর ছিল, কারো কম ছিল। এ ব্যাপারে সাহাবাদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

عَنْ عُرْوَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রা. হতে বর্ণিত, আমি হযরত আয়েশা রা.কে إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, যদি কেউ সাফা-মারওয়া তাওয়াফ না করে, তাহলে গুনাহগার হবে না (যেমনটি প্রকাশ্য তরজমা দ্বারা বোঝা যায়) যে তাওয়াফ করে। এতে প্রথেমই যা বুঝে আসে, তাহলো তাওয়াফ করা মুবাহ। যদি না করে, তাও জায়েয আছে। হযরত আয়েশা রা. বললেন, হে ভাগিনা! তুমি অনেক বড় ভুল কথা বলেছ। তুমি যা বুঝেছ, যদি আয়াতের অর্থ তাই হতো তাহলে আয়াতটি এভাবে হতো যে- 'সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ না করলে গোনাহ নেই।'

অর্থাৎ তাওয়াফ না করাতে গোনাহ নেই। হযরত যুহরী রহ. বলেন, আমি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান রহ.কে একথা জানালাম। তিনি বললেন, এ-ইলম আমি শুনিনি। *[বুখারী ও মুসলিম]*

এ-হাদীস শরীফ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, নুসুস তথা প্রকাশ্য হুকুম বুঝতে বুদ্ধি-জ্ঞান ভিন্ন হয়। কেউ প্রকাশ্য নস্ পর্যন্ত থেকে যায়। কেউ বাতেনী নস্ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং উক্ত আয়াতের মধ্যে যে সূক্ষ্মতা ছিল, তা অন্যান্য আয়াতের তুলনার বেশি গোপন ছিল না। কিন্তু হযরত উরওয়া রা. তা বুঝতে পারেননি। হযরত আয়েশা রা. বুঝতে পেরেছেন। কথাটি যেহেতু কৌতুককর ছিল, তাই আবু ইবনে আবদুর রহমান রা. শোনে তাতে আনন্দ প্রকাশ

করলেন এবং তাকে ইলম বললেন। এহেন ইলমি ভিন্নতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের শব্দাবলির দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه

কতক ইলম পৌছানেওয়ালা নিজে ফকীহ হয় না। কতক এমন ব্যক্তির নিকট পৌছানো হয়, যে তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়।

কিন্তু সাথে-সাথে এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকা উচিত যে, প্রত্যেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বুদ্ধিমানকে মুজতাহিদ বা ফকীহ বলা হবে না। বরং এ-ক্ষেত্রে ওই বোধশক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, যা নীতিসিদ্ধ হবে এবং আল্লাহপ্রদত্ব হবে, যা ইলমে লাদুন্নি হিসেবে মুজতাহিদের কাল্‌বে ঢেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেমনভাবে সৃষ্টিজগত বিষয়ে প্রত্যেক ছোট-বড় বুদ্ধিমান ও মেধাবী ব্যক্তিই আবিষ্কারক হতে পারে না এবং প্রত্যেক যুগেও আবিষ্কারক হয় না। বরং আল্লাহ তায়ালার হেকমত যখন কোন সমাজের বিশেষ অংশে উন্নতি দেখতে পছন্দ করেন, তখন যুগের কিছু বিশেষ মস্তিষ্ককে নির্বাচন করে তাদের থেকে আবিস্কারের কাজ নেন। আর তারা সমাজের ওই পার্শ্বসমূহ সাজিয়ে দেন, যেগুলোর সৌন্দর্যের প্রয়োজন ছিল।

তেমনিভাবে কায়েনাতে আমরে, হুকুম জগতেও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও মেধাবী মুজতাহিদ হতে পারে না। না প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদ জন্ম নেয়। বরং আল্লাহর হেকমত যখন কোন দীনের কোন গোপন কোণকে প্রকাশ করতে চায়, তখন বিশেষ বিশেষ মেধাবী ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে ইজতিহাদী রুচিবোধ ঢেলে দেন। আর তারা তাদের বিশেষ আল্লাহপ্রদত্ব রুচির মাধ্যমে দীনের ওই কোন ও পার্শ্বগুলোকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে। অর্থাৎ চুলের চামড়া বের করে উম্মতের সামনে পেশ করেন, যেগুলো প্রকাশ করা প্রয়োজন ছিল।

বিশেষ বুঝ বা ইজতিহাদী রুচির ওয়াহাবী স্তর সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ

হযরত আবি জুহায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলীর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা কিতাবুল্লাহতে নেই? তিনি উত্তর দিলেন, না, ওই সত্তার কসম, যিনি বীজকে কাটিয়েছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। আমার নিকট এমন কোন ইলম নেই। কিন্তু বিশেষ বুঝ ও বুদ্ধি অবশ্যই আছে, যা আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে কুরআনে দান করেন। *[বুখারী, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফ]*

ইজতিহাদী যোগ্যতা আল্লাহপ্রদত্ত, অর্জিত নয়

ফলে যেখানে কিতাবুল্লার সূক্ষ্ম অর্থের প্রমাণ মিলে, যা অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছাড়া বুঝতে পারে না। সেখানে এ কথাও সুস্পষ্ট হয় যে, এ বোধ ও মেধা-বুঝশক্তি কোন উপার্জিত বস্তু নয় বা বিদ্যাগত বস্তু নয়, যা মেহনত ও চেষ্টা করে অর্জন করা যাবে। বরং এ-যোগ্যতা আল্লাহর দান, যা উম্মতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। তা হুবহু নবওয়ত ও বিলাওয়াতের মতো। এগুলো কোন বিদ্যাগত বস্তু নয় যে, যার মনে চায় চেষ্টা ও মেহনত করে নবী বনে যাবে। কুরআনুল কারীম রিসালাত সম্পর্কে একথাই বলেছে যে–

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

আল্লাহই ভাল জানেন যেখানে নিজের রিসালাত প্রদান করেন। *[সূরা আনআম : আয়াত ১২৪]*

এমন প্রকার বিজ্ঞান বা রহস্যবিদ ও হাকিকতবিদ সম্পর্কে হযরত খিযির আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন–

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

আমি তাকে (খিযির আ.) নিজের কাছ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি। *[সূরা কাহফ : আয়াত ৬৫]*

মোটকথা, উভয় বিষয়কে অর্থাৎ ইলমে নবুওয়ত এবং ইলমে হাকিকতকে নিজের দিকে নেসবত আর সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইলমের এ- স্তর উপার্জনযোগ্য নয়। বরং আল্লাহপ্রদত্ত এবং রবের দান, যার জন্য আল্লাহর

পক্ষ থেকে ব্যক্তিত্ব নির্বাচন করা হয়। يعطيه الله বাক্য দ্বারা সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। এ-কারণে প্রথম যুগে যখন ইজতিহাদ ও কিয়াসের দ্বার উন্মুক্ত করলেন, ইস্তেম্বাতের দরজা খুললেন এবং হযরত সাহাবায়ে রা. কেরাম নুসুস তথা প্রকাশ্য বিধান না থাকাবস্থায় নিজেদের রায় ও কিয়াসের উপর আমল করেছেন, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের রায়কে দীনের ব্যাপারে হৃদয়গ্রাহী ও সত্যায়ন করেননি। কতকের ইজতিহাদ গ্রহণ করেছেন, কতকের গ্রহণ করেননি। তাদেরকে ইজতিহাদের উপযুক্ত এবং মুজতাহিদ মনে করেননি। কারণ, তাদের মধ্যে ওই বিশেষ বুঝ ছিল না, যা আল্লাহপ্রদত্ত, যার আলোকে শরীয়ত থেকে সহীহ হাকিকত বুঝে প্রমাণ পেশ করতে পারবেন।

আবু দাউদ শরীফে এসেছে, যার সারনির্যাস হলো, সর্বোত্তম যুগে একজন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়। সাথীরা তাকে গোসল করাল। সে গোসল করে মৃত্যুবরণ করল। অবগত হওয়ার পর নবীজি তাদের রায়ের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ মারেননি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার জন্য তায়াম্মুম করা, আঘাতের উপর পট্টি বেধে মাসেহ করে নেওয়া এবং অবশিষ্ট দেহ ধৌত করে নেওয়া যথেষ্ট ছিল। তাঁরা ফরজ গোসলের আয়াতকে মাযুর-মাযুর উভয়ের ব্যাপারে ব্যাপক মনে করেছে।

আর তায়াম্মুমের আয়াতকে ছোট নাপাকের সাথে খাস মনে করে ওই ফতোওয়া দিয়েছিলেন যে, এই বড় নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েয নেই। সেজন্য তাকে গোসল করতে বাধ্য করেন। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ আদী ইবনে হাতেম রা.-এর ঘটনার মধ্যে যা বুখারী রহ. ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআনের শব্দ خيط ابيض خيط اسود দ্বারা সাদা ও কালো রশি মনে করে তা খাটের নিচে রেখে দিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর সাদা ও কালো রং বোঝা না যেত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাহরি খেতেন। অথচ এখানে দড়ি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত ও দিন। অতএব, আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ইজতিহাদী শক্তি ছিল না, তাই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছেন। হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছা অনেক দূরের কথা। তাই তার রায় ও কিয়াস দীনের সনদ হতে পারে না। সেজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুকের ছলে বলেছেন, 'তোমার খাট অনেক লম্বা, যার নিচে সাদা ও কালো অর্থাৎ রাত-দিন এসে গেছে।'

উপরের বাক্য দ্বারা তার মতকে রদ করলেন। ইতোপূর্বে হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত হাদীস অতিবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কতক ফিকাহ বহনকারী স্বয়ং ফকীহ হয় না। প্রকাশ থাকে যে, এমন গাইরে ফকীহর রায় দীনের ভিতর গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতকের রায় ও কিয়াসকে রদ করা একথার সুস্পষ্ট দলিল যে, প্রত্যেকেই মুজতাহিদ হতে পারে না এবং প্রত্যেকের রায় ও কিয়াস গ্রহণযোগ্যতা পর্যন্ত পৌছতে পারে না যতক্ষণ না তার মধ্যে ওয়াহীভাবে বুঝ ও রুচিবোধের বিশেষ মর্তবা সৃষ্টি হয়, যা শরীয়ত প্রণেতার দৃষ্টিতে নির্ধারিত। যখন সাহাবাদের মাঝে এমন ভাগ হতে পারে, তখন আজ কেমন করে সম্ভব যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বুঝ গ্রহণযোগ্য এবং ইজতিহাদের সীমা পর্যন্ত পৌছে মেনে নেওয়া যাবে? আজও উক্ত ভাগ আবশ্যক হবে।

সুতরাং এই রুচিগত নূর এবং ইলমে খফী ও রহস্যভেদের উপস্থিতি এবং ব্যবহারকে শরীয়তের পরিভাষায় কোথাও বাতেন শব্দ দ্বারা, কোথাও ফাহমুন শব্দ দ্বারা, কোথাও রায় দ্বারা, কোথাও তাফাক্কুহ দ্বারা, কোথাও হেকমত শব্দ দ্বারা, কোথাও ফুরকান শব্দ দ্বারা, কোথাও শরহে সদর শব্দ দ্বারা, কোথাও ইনবাত শব্দ দ্বারা এবং সমষ্টিগত শিরোনামের সাথে কোথাও ইজতিহাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। শরীয়তের প্রসিদ্ধ পরিভাষাসমূহে ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাত নামের শিরোনাম সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে, যার মূল কথা হলো ইজতিহাদ একটি যোগ্যতা এবং বিশেষ বুঝ ও অনুভব শক্তি এবং ইলমের একটি বিশেষ আল্লাহপ্রদত্ত মুর্তবা, যার মাধ্যমে আহলে নুসুস সূক্ষ্ম ও গোপন অর্থ ও আহকামের রহস্যভেদ ও ইল্লাত বুঝে সেগুলোর উপর প্রশাস্তি লাভ করতে পারে এবং সেগুলোর দাবির উপর আমল করতে পারে।

ইলমে বাতেনই প্রশান্তির মূল

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ইলমের এ মর্তবা যার সম্পর্ক সরাসরি শরহে সদর তথা অন্তর খুলে দেওয়া এবং ইলমে ইলাহীর সাথে। সেগুলো যে পরিমাণ প্রশান্তির মূল এবং মাসায়েলে প্রশান্তির কারণ হতে পারে, তা ইকতেসাবী তথা উপার্জিত বস্তু দ্বারা হতে পারে না। যখন কুরআন একত্রকরণ বিয়য়ে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.-এর– যিনি সর্বজনস্বীকৃত ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন – যুক্তি ও দালিলিক ইলম দ্বারা ওই প্রশান্তি অর্জন হয়নি, যা সাময়িক ইলম দ্বারা সহজে অর্জন হয়। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর বর্ণনা

দ্বারা এ সূক্ষ্মতা যথেষ্ট সুস্পষ্টতার সাথে সমাধান হয়।

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমামার যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর রা. আমাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠান। আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, হযরত উমর রা. বসে আছেন। হযরত আবু বকর রা. ঘটনা বর্ণনা করলেন, হযরত উমর রা. আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, এমামার ঘটনায় অনেক কারী শহীদ হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, এভাবে সবস্থানে কারীদের প্রয়োজন হলে কুরআনের বিশাল একটি অংশ নষ্ট হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। সেজন্য আমার রায় হলো, আপনি কুরআন একত্র করার আদেশ দিন। আমি হযরত উমর রা.কে উত্তর দিলাম, যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি তা আমি কী করে করব? হযরত উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! এ কাজে শুধুই কল্যাণ রয়েছে। তিনি বারবার একথা বলতে থাকেন। এমনকি যে অধ্যায়ে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা এবং প্রশান্ত ও স্থির ছিলেন, সে বিষয়ে আমারও শারহে সদর হয়ে যায় এবং ওই কথা আমারও বুঝে আসে, যা তার এসেছিল। *[বুখারী ও তিরমিযী]*

এ-হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, প্রথম পর্যায়ে সিদ্দীকে আকবার রা.-এর নিকট কুরআন একত্র করা বিদয়াত হওয়ার ধারণা ছিল। তার সামনে বিদয়াত

মন্দ হওয়ার হাদীসগুলো ছিল। সে কারণে কুরআন জমাকরণ বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু যখন দলিল হতে অতিক্রম করে তার কালবে বাতেনি ইলম উন্মোচন হলো যে, কুরআন জমা করার এ জুযয়ী ইলম তাহাফ্ফুজে দীন এই কুল্লি ইলমের অধীনে। তখন শারহে সদরের সাথে তার পদক্ষেপের কারণে আজও ইসলামি জগত তাঁর কাজ থেকে উপকৃত হচ্ছে।

এতে প্রমাণিত হয়, মুজতাহিদের জন্য ইলমের এ-গোপন মর্তবা কখনও-কখনও প্রকাশ্য মর্তবা হতেও বেশি প্রশান্তির কারণ হয়। আর সেই শান্তি স্থিরময় অবস্থা তার অনুসারীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে যদি তারা তার অনুসরণ করে।

যাহোক, এতটুকু সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য ইলমে খফী তথা গোপন ইলমকেও মীরাছ হিসেবে রেখে গিয়েছেন, যা কুল্লিয়াত হতে মাসায়েল আবিষ্কার করে এবং জুযইয়্যাত হতে দলির উদ্ভাবন করে। তার জন্য ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত। পাশাপাশি তা এমন স্থানের জন্য, যেখানে কোনো নস্ নেই অথবা আছে কিন্তু বিভিন্ন অর্থে সন্দেহযুক্ত বা স্থানের সাথে নির্ধারিত; কিন্তু তা সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। অথবা সন্দেহ সুস্পষ্ট; কিন্তু তার ইল্লত গোপনীয়, যার উন্মোচন সবাই করতে পারে না। সুতরাং এহেন স্থানে ও মুহূর্তে ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাত ব্যতীত উপায় নেই। তাই প্রয়োজন ছিল উম্মতকে এ-বিশেষ জ্ঞানের মর্তবাও প্রদান করা, যা বাস্তবে শরীয়তেরই একটি সূক্ষ্ম অংশ এবং যা আলেমদের জন্য–

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل

আমার উম্মতের আলেমরা বনি ইসরাইলের নবীদের মতো।

সম্মানিত ও বরকতপূর্ণ সম্বোধনের অধীনে প্রমাণিত করেছেন যে, উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীদের মতো কাজ করবেন।

যদি আলেমগণ তাবলীগে দীন এবং সৃষ্টির তরবিয়াত করেন, তাহলে একেকজন আলেম এক-একটি অঞ্চল দীনি রঙে সাজিয়ে দিবেন এবং হাজার হাজার মানুষকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করাবেন। তাদের মাঝে দীনি রং সৃষ্টি করবেন। মাসায়েল শিখালে তখন নবীগণ যা ওহীর মাধ্যমে বলতেন তা তারা এলহামি ওহী দ্বারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে বলবেন। অর্থাৎ আহকামে তাকলিফিয়্যাহর মতো আহকামে ওয়াযইয়্যাহকে উম্মতের সামনে পেশ করবেন। আর তা ইজতিহাদ ও কিয়াস ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য

উম্মতের মধ্যে এই ইলমে গামিয তথা দুর্বোধ্য ইলম ঢেলে দিয়েছেন। আর তা প্রথম যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।

সাহাবাদের মাঝে আহ্‌লে ইজতিহাদ

যখন ওই লোকরা ইজতিহাদের সম্মুখীন হন, যারা ইজতিহাদের উপযুক্ত ছিলেন এবং শরীয়তের হাকিকত বুঝেছিলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইজতিহাদ ও ইস্তেমাতের প্রশংসা করলেন। সুতরাং নস্ জানা না থাকা অবস্থায় উমুবিয়াত ও কুল্লিয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করে যে রায়ের উপর করা হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন, তার উদাহরণ এই যে–

عَنْ طَارِقٍ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْآخَرِ يَعْنِي أَصَبْتَ

হযরত তারেক রা. হতে বর্ণিত আছে, এক লোকের গোসলের প্রয়োজন হলো। তিনি সেই অবস্থার নামায পড়লেন না। তিনি রাসূলের দরবারে হাজির হলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সঠিক করেছ। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বললেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও পূর্ব ব্যক্তির কথার মতো বলে দিলেন, তুমি সঠিক করেছ। *[নাসাঈ শরীফ]*

উক্ত হাদীস দ্বারা ইজতিহাদ ও কিয়াস জায়েয হওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ, যদি তাদের নস্ জানা থাকত, তাহলে আমল করার পর প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকে আপন ইজতিহাদ ও কিয়াসের উপর আমল করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করিয়েছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে সত্যায়ন ও প্রশংসা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, শারে'-এর সত্যায়ন অর্থাৎ কোন

জিনিস শুনে রদ না করা বরং প্রকাশ্যভাবে সত্যায়ন করা তার শরীয়তসিদ্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সেজন্যই প্রকাশ্য নস্ না থাকাবস্থায় ইজতিহাদ ও কিয়াস জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না। তেমনিভাবে আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, হযরত আমর ইবনুল আস রা. জাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে, প্রবল শীতের কোন রাতে প্রাণের ভয়ে জানাবাত তথা গোসল ফরজ অবস্থায় গোসলের স্থলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ালেন। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরজ করলেন, আমি তো আল্লাহর এই হুকুমের উপর আমল করে তায়াম্মুম করেছি যে–

لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

নিজের জানকে ধ্বংস কর না।

শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন এবং নীরবতা ইখতিয়ার করলেন। এতে প্রমাণিত হয়, প্রকাশ্য নস্ না থাকাবস্থায় আপন রায়ের উপর আমল করা, উমুমিয়াত ও কুল্লিয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করা অর্থাৎ ইজতিহাদ করে কাজ করা হাদীসের খেলাফ নয়। অন্যথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন যে, তোমরা দীনের ভিতর রায় ও কিয়াসকে কেন অনুপ্রবেশ করছ। অথবা নস্ তো বিদ্যমান আছে, কিন্তু সন্দেহযুক্ত তাহলে সে অবস্থায় ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো হক দিককে নির্ধারণ করে তার উপর আমল করাও নস্ ও হাদীসবিরোধী কাজ নয়। নিম্নের হাদীস উক্ত কাজের দলিল–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের সময় সাহাবাদের বলেছিলেন, বনি কুরাইজা এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ আসরের নামায পড়বে না। কিছু সাহাবার রাস্তার আসরের নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন তাদের পরস্পর রায়ের ভিন্নতা হলো।

কেউ কেউ বলল, আমরা নামায পড়ে নেব। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদের উদ্দেশ্য নামায দেরি করে পড়া ছিল না বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকিদ দেওয়া যে, আসরের পূর্বেই সেই এলাকার পৌঁছার চেষ্টা করবে। তারপর উক্ত ঘটনা তাঁর সামনে বর্ণনা করা হয়। তখন তিনি কারো উপর ভর্ৎসনা করেননি। *[বুখারী]*

উক্ত ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, কেউ কেউ নিজেদের ইজতিহাদী শক্তির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার আসল উদ্দেশ্য বুঝে যা নসের সন্দেহযুক্ত কারণ ছিল নিজেদের নামায পড়ে নেন। কিন্তু তিনি তাদের উপর কোন ভর্ৎসনা করেননি যে, তোমরা হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের বিপরীত কেন আমল করেছ? অর্থাৎ তাদেরকে হাদীসের উপর আমল পরিহারকারী স্বীকৃতি দেননি।

অথবা প্রকাশ্য নস্ও বিদ্যমান আছে এবং তার সন্দেহও নির্ধারিত। কিন্তু মুজতাহিদ সেই হুকুমকে কোন ইল্লাত থেকে মালুল মনে করে বাতেনী ইল্লাতের উপর আমল করে, প্রকাশ্য নস্কে পরিহার করে তাও হাদীস বিরোধিতা নয়। সুতরাং হাদীসে আনাস তার উপর সত্য সাক্ষী।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْرُجْ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাসীর সাথে দোষের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.কে বললেন, ওই ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দাও। হযরত আলী রা. তার নিকট এলেন। তাকে দেখতে পেলেন একটি কূপে নেমে আপন দেহকে ঠাণ্ডা করছেন। তিনি তাকে বললেন, কূপ থেকে বের হয়ে এস। সে নিজ

হাত বাড়িয়ে দিল। হযরত আলী রা. তাকে বের করলেন। তাকে দেখতে পেলেন লিঙ্গহীন। তিনি তাকে শাস্তি দিলেন না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কথা জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাজকে পছন্দ করলেন। অন্য বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উপস্থিত ব্যক্তি এমন কিছু দেখতে পারে, যা দূরে থাকা ব্যক্তি দেখতে পারে না। *[মুসলিম শরীফ]*

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারিত এবং পরিষ্কার আদেশ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত আলী রা. নিজে ইজতিহাদী রুচির মাধ্যমে তাকে অপর ইল্লাত দ্বারা মালুল মনে করলেন এবং যখন আসল ইল্লাত পেলেন না, তখন শাস্তিও দিলেন না। অথচ হযরত আলী রা.-এর উক্ত আমল প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের কারণ এবং হুকুমের ইল্লাত বুঝে সে মোতাবেক আমল করা এবং শাব্দিক হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে পরিহার করা হাদীসের বিরোধিতা নয়। বরং তাও হাদীসের উপর আমল। তবে বাতেনী হাদীসের উপর, যা স্বয়ং হাদীস থেকে প্রমাণিত বস্তু।

তার দৃষ্টান্ত এও, যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায রা.কে সুসংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি সত্য দিলে কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়বে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমি কি মানুষের মাঝে এ সুসংবাদ ব্যাপক করব না? তিনি বললেন, না। মানুষ তার উপর ভরসা করে বসে থাকবে। (মানে, আমল ছেড়ে দেবে)।

উক্ত সুসংবাদ প্রদানের নিষেধাজ্ঞা কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। কিন্তু হযরত মুয়ায রা. নিজের ইজতিহাদী নূর ও ইলম দ্বারা অন্যান্য কুল্লি দলিলের প্রতি গবেষণা করে উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ওই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করলেন, যার মধ্যে ওই কথার উপর ভরসা করে বসে থাকার সম্ভাবনা ছিল এবং মৃত্যুকালে যখন ওই সময় তার ধারণামতে অবশিষ্ট ছিল না, তখন তিনি উক্ত সুসংবাদকে আমভাবে ঘোষণা দিলেন।

অথবা তার দৃষ্টান্ত তাও হতে পারে, যা ইমাম মুসলিম রহ. মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী রা. বলেন, একজন বাদী যে মন্দকাজ করেছিল, তাকে দুররা মারিনি যে, হতে পারে মরে যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কর্মের প্রশংসা করলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে,

সাহাবায়ে কেরাম রা. নুসুসের সাথে তথা প্রকাশ্য বিধানের সাথে এমন ব্যবহার করা মন্দ মনে করতেন না। অন্যথায় প্রকাশ্য আহকামকে মাকসুদ জেনে-শুনে ওই বাতেনী ইল্লত এবং উলুমে কুল্লিয়া সম্পর্কে আলোচনাই করতেন না। বাতেনের উপর আমল করা তো দূরের কথা। উক্ত দৃষ্টান্তগুলো এর উপর ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য যে, যদি মুজতাহিদ নিজের ইজতিহাদী শক্তির মাধ্যমে কোনো হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত অর্থাৎ তার থেকে উন্নত কোনো সূক্ষ্ম অর্থ বুঝতে পারেনম যে পর্যন্ত সাধারণ আলেমগণ পৌঁছতে পারেন না, তাহলে তার উপর আমলা করা জায়েয।

উম্মতের মাঝে যদি ইজতিহাদ আবশ্যক হয় তাহলে তাকলিদও আবশ্যক

যাহোক যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দীনের মধ্যে প্রকাশ্য নস্ না থাকলে নির্ধারিত কারণ না থাকলে বা মালুল না হওয়ার অবস্থায় ইজতিহাদ ও কিয়াস জায়েয আছে। আর তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্তি নির্বাচিত ও নির্ধারিত। সবাই তার উপযুক্ত নয়। আর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যায়নে শরয়ী দলিল। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যদের জন্য তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যখন নিজের ইলম থাকবে না তো যাদের ইলম আছে, তাদের আনুগত্য করবে। যে নিজে ওই গোপন দলিল এবং ইল্লাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সে ইল্লাত ও রহস্যভেদ জ্ঞাতদের সামনে মাথা নত করবে। কারণ, ইলমের স্তর দুটি। হয়তো নিজে বুঝবে, না হয় বুঝনেওয়ালা ব্যক্তিদের ইত্তেবা করবে। সুতরাং এ-দুটি স্তরের মধ্যে কোনো মাধ্যম ব্যতীত কুরআন হিদায়েত রেখেছে। কেয়ামত দিবসে কাফেররা এর উপর আফসোস প্রকাশ করবে যে, আমরা নিজেরা দীন বুঝিনি এবং যারা বুঝত তাদের কথা শুনিনি–

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

আর কাফেররা বলবে, হায়! আমরা যদি শুনতাম বা আকল দ্বারা বুঝতাম, তাহলে আজ জাহান্নামী হতাম না।
[সূরায়ে মুলক : আয়াত ১০]

সুতরাং এই শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যা একজন গাইরে আলেম আলেমকে করবে এবং একজন গাইরে মুহাক্কিক, মুহাকক্কিক ব্যক্তির সামনে আমল

করবে। একেই বলে তাকলিদ, যা জাতিগতভাবে এবং ইজতিহাদের প্রয়োজনেও জায়েয ও যুক্তিসঙ্গত। অন্যথায় সর্বসাধারণ এবং ইজতিহাদ অযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য যদি আহলে ইজতিহাদ ব্যক্তিদের তাকলিদ জায়েয না হয়, তাহলে ইজতিহাদ শরীয়তের দলিল হওয়া বেকার ও অনর্থক হয়ে যাবে এবং এ-আয়াতের কোন অর্থই বাকি থাকবে না যে–

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা না জানো তাহলে আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস কর। *[সূরা নাহল : আয়াত ৪৩]*

এবং এ-হাদীসের কোন সম্বোধিত ব্যক্তিই বাকি থাকবে না।

اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ

অপারগ ও অক্ষমদের আরোগ্য কি প্রশ্ন নয়? *[আবু দাউদ]*

অতএব, হাদীসের প্রকাশ্য হুকুম দ্বারা ইজতিহাদ শরয়ী জিনিস। আর হাদীসের প্রকাশ্য বিধানমতে পৃথিবীতে গাইরে মুজতাহিদও রয়েছে। প্রথম যুগ পর্যন্ত ছিল। এদিকে গাইরে মুজতাহিদদের আরোগ্য ও চিকিৎসা হলো প্রশ্ন ও মেনে নেওয়া। অতএব, অমুজতাহিদদের জন্য ইজতিহাদী মাসায়েলের মধ্যে মুজতাহিদদের তাকলিদ ব্যতীত গত্যন্তর নেই, অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট নেই। এজন্য তাকলিদ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথক ইরশাদ বিদ্যমান রয়েছে–

مَنْ اُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গবেষণা ব্যতীত কোন ফতোওয়া দেয়, তাহলে তার গোনাহ ফতোওয়াদাতার উপর হবে। *[আবু দাউদ]*

প্রকাশ থাকে যে, যদি তাকলিদ জায়েয না হতো এবং কারো ফতোওয়ার উপর দলিল ব্যতীত আমল জায়েয না হতো, যা তাকলিদের সারকথা, তাহলে গোনাহগার হওয়ার জন্য মুফতি সাহেবকে কেন নির্দিষ্ট করা হয়? বরং যেভাবে মুফতি সাহেবের ভুল ফতোওয়া দেওয়ার কারণে গোনা হতো, তেমনি প্রশ্নকারীর দলিল অনুসন্ধান না করা এবং তাহকীক ব্যতীত আমল করা গোনাহ হতো। অতএব, যখন শারে' আ. প্রশ্নকারীকে দলিল তাহকীক না

করা সত্ত্বেও গোনাহগার বলেননি; তাহলে নিঃসন্দেহে তাকলিদ জায়েয হওয়া প্রমাণিত হলো।

সাহাবাদের মাঝেও তাকলিদের প্রচলন ছিল

হযরত সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে যেমনভাবে ইজতিহাদ প্রচলিত ছিল, তেমনিভাবে তাকলিদও প্রচলন ছিল। অর্থাৎ অমুজতাহিদ মুজতাহিদের ফতোওয়ার উপর দলির অনুসন্ধান ব্যতীতই শুধু সুধারণার ভিত্তিতে আমল করত যে, তিনি মুজতাহিদ এবং তিনি দলিলবিহীন ফতোওয়া দেন না। তার প্রমাণ মিলে নিম্নের হাদীসে–

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَنَهَى عَنْهُ

হযরত সালেম রহ. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এ-মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত সময়ে ঋণ পায়। ঋণদাতা গ্রহীতা থেকে কিছু পরিমাণ ক্ষমা করতে চান এই শর্তে যে, ঋণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধ করবে। তিনি তা পছন্দ করেননি এবং নিষেধ করলেন। *[মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ.]*

যেহেতু উক্ত জুযয়ী মাসয়ালা সম্পর্কে কোনো হাদীসে মারফু প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত নেই এজন্য তা ইবনে উমর রা.-এর কিয়াস। আর প্রশ্নকারী যেহেতু দলিল-প্রমাণ তালাশ করেননি তাই তা তাকলিদ। সাথে-সাথে ইবনে উমর রা.-এর দলিল বর্ণনা না করা স্বয়ং তাকলিদকে জায়েয মনে করেন। এজন্য ইবনে উমর রা.-এর কর্ম থেকে কিয়াস ও তাকলিদ উভয়টিই জায়েয প্রমাণিত হলো।

তেমনিভাবে ইমাম মালেক রহ.-এর বর্ণনা। হযরত উমর রা.কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি কাউকে নিজের শস্য করজ দিল এ-শর্তে যে, আমাকে অমুক শহরে আদায় করে দিবে। হযরত উমর রা. একে অপছন্দ করে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন, পরিবহনের ভাড়া কোথায় গেল? যেহেতু এ-সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য মারফু হাদীস নেই, তাই হযরত উমর রা.-এর উত্তর

কিয়াস ছিল। আর উত্তরের উৎস হযরত নিজেও বলেননি এবং প্রশ্নকারীও জিজ্ঞেস করেননি। দলিল জিজ্ঞেস করা ব্যীতই গ্রহণ করে নিলেন। একেই বলে তাকলিদ। অতএব, হযরত উমর ফারুক রা.-এর কর্ম দ্বারাও কিয়াস-তাকলিদ প্রমাণিত হলো।

তেমনিভাবে ইমাম মালিক রহ.-এর বর্ণনা। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হজ্বের উদ্দেশে বের হলেন। রাস্তায় উষ্ট্রি হারিয়ে গেল। ফলে হজ্বের সময় শেষ হওয়ার পর মক্কায় পৌছলেন। হযরত উমর রা.-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বয়ান করে মাসয়ালা চাইলেন। তিনি বললেন, উমরার কার্যাবলি পুরো করে ইহরাম খুলে ফেল আর পরবর্তী বছর হজ্ব পালন করে সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে দিবে। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, যে সমস্ত সাহাবা রা. ইজতিহাদ করতে পারতেন না, তারা মুজতাহিদ সাহাবাদের নিকট জিজ্ঞেস করে সেগুলোর তাকলিদ করতেন।

সুতরাং হযরত আবু আইয়ুব আনসার রা. হযরত উমর রা. থেকে শুধু হুকুম শুনেছেন, দলিল অনুসন্ধান করেননি। এমনটিই তাকলিদের সারকথা। এ-অবস্থা তাবেঈদের মাঝে অনেক পাওয়া যায়। যেমনটি হাদীসের কিতাবসমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ককারীগণ জানেন। এতে পরিষ্কার হয় যে, সর্বোত্তম যুগেও ইজতিহাদ ও তাকলিদ প্রচলিত ছিল এবং উভয়ের সদস্য ও ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এমনটি যদি একথার দলিল হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদ জায়েয নেই, তাহলে এটিও দলিল হবে যে, এ-সমস্ত সকল মানুষের জন্য তাকলিদ ব্যতীত কোন উপায় নেই।

ইজতিহাদ ও তাকলিদের সীমারেখা

সাথে-সাথে এরও সুস্পষ্ট দলিল যে, শরীয়ত উম্মতের মাঝে একই সময়ে ইজতিহাদ ও তাকলিদ উভয়টির প্রয়োজন অনুভব করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, শরীয়ত ইজতিহাদ ব্যতীত তাকলিদ চায় না এবং তাকলিদ ব্যতীত ইজতিহাদ চায় না। আর এমনটিই শরীয়তের ঐক্যবদ্ধতা এবং আদল ও মধ্যপন্থার তাকাজাও যে, আপন আপন সীমারেখার উভয়টি থাকবে। তারপর সাথে-সাথে শরীয়ত এ-ইজতিহাদ ও তাকলিদের একটি ব্যবস্থাপনাও চায় যে, অধিকাংশ মুকাল্লিদ মুজতাহিদদের আনুগত্য করে নিজেদের দীনকে হেফাজত করবে। যার কারণ হলো, ইসলামী শরীয়ত যেহেতু পরিপূর্ণ মধ্যপন্থা এবং ঐক্যবদ্ধতার শান রাখে এবং সেজন্য এ-উম্মত মধ্যমপন্থী এবং সমষ্টিগত

উম্মত কুরআনে যাদের উপাধি হলো উম্মাতে ওয়াসাত তথা মধ্যমপন্থী উম্মত। এজন্য শরীয়তের মানশা হলো, উম্মতের প্রত্যেকের কাজ একতার সাথে ঐক্যবদ্ধ রঙে এ পন্থায় হবে এবং ঐক্যবদ্ধ সংবিধানের মাধ্যমে হবে। চাই সেই সংবিধান রাজনৈতিক হোক, চাই ধর্মীয় চিন্তাধারায় হোক। তাতে নেই অনৈক্য ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব, যা মূলত বিশৃঙ্খলা এবং থাকবে না কোনো বাধা এবং স্বৈরাচার, যা একতা ও গণ-অধিকারের বিরোধী। সেজন্য উম্মতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় সংবিধানে এ মধ্যমপন্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

উদাহরণস্বরূপ উম্মতের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে একদিকে রেখেছে এমরাত, যাতে জাতির মধ্যে অনৈক্য আসতে না পারে, যা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল। এতে হুকুমতের মধ্যে ইজ্জত ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরদিকে নেতৃত্বের জন্য পরামর্শ পরিষদকে আবশ্যক করা হয়েছে, যাতে আমীর ও নেতার মধ্যে স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি না হতে পারে এবং জাতির ঐক্যবদ্ধ চিন্তা-চেতনার শক্তি বেকার ও বন্ধ না হয়। এতে জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার অটুট থাকবে। সুতরাং ইসলামী ইমারাতে এমন একনায়কতন্ত্রী হুকুমত নেই, যাতে জনগণের কোনো প্রবেশ থাকবে না এবং এমন গণতন্ত্রও নেই যে, তা বিকেন্দ্রীকরণের অবস্থায় পৌঁছে আমীরকে বেকার ও কর্মহীন তথা নেতৃত্ব বন্ধ করে দেবে এবং সর্বসাধারণ তার উপর হুকুমত চালাবে।

সুতরাং আমীরের এতনায়কতন্ত্রী ও অধিনায়কত্ব থেকে তো জাতির অনিয়ম ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করা হয়েছে। আর জাতির শুরা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আমীরের স্বৈরাচারিতাকে বন্ধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়টিকে একটি মধ্যমপন্থী অবয়বে উম্মতের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের ক্ষতিকর সাইডগুলোকে বের করে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং উপকারী সাইডকে একীভূত করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণ মধ্যম পন্থা ও সমতা। ঠিক তেমনিভাবে উম্মতের ধর্মীয় সংবিধানে শরীয়ত প্রকাশ্য নস্ না থাকাবস্থায় সর্ব সাধারণের চিন্তা-ফিকিরকে এমনভাবে স্বাধীন করে দেয়নি যে, উম্মতের সবাই মুজতাহিদ বনে যাবে। ফলে কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে প্রত্যেক ভদ্র-অভদ্র ব্যক্তির রায় ও কিয়াসের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

আর না এই উম্মতকে এমন অনুভূতিহীন তাকলিদের উপর ছেড়ে দিয়েছে যে, তাদের চিন্তাশক্তি ও ইজতিহাদ শক্তি একেবারেই বন্ধ ও বেকার হয়ে যাবে। বরং একদিকে তো জিনসে ইজতিহাদকে বাকি রাখা হয়েছে, যার শ্রেণীভেদ যুগের চাহিদা অনুপাতে প্রকাশ পাবে এবং সমাপ্ত হবে, যাতে উম্মতের চিন্ত

শক্তি ও গবেষণা সংস্থা ও মূল্যহীন না হয়। আর অপরদিকে তাকলিদকে কায়েম রেখেছে, যাতে সর্বসাধারণ এবং অজ্ঞ লোকেরা আপন-আপন রায় ও কিয়াসকে দীনের পোশাক পরিধান করিয়ে সমগ্র দীনকে রায় ও কিয়াসের সমষ্টি বানিয়ে না ফেলে। আর দীনের মধ্যে অনৈক্য ও দ্বিধার রোগজীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে।

সুতরাং উম্মতের ইলমি অনৈক্যকে তাকলিদি শোনা ও মানা অর্থাৎ ইত্তেবা দ্বারা দূর করা হয়েছে আর অনুভূতিহীন তাকলিদকে ইজতিহাদ ও তথ্যানুসন্ধান শানের দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে ইজতিহাদ ও তাকলিদের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে উম্মতকে রক্ষা করে মধ্যমপন্থী চিন্তা-চেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এনে দাঁড় করিয়েছে, যাতে উপকারী দিকগুলো রয়েছে। অতএব উম্মত যদিও মুকাল্লিদ তথাপি তারা তাকলিদে মুহাক্কিকও। আর যদি ইজতিহাদী ফিকিরও রাখে, তাহলে তাতে পূর্বসূরীদের আদর্শের তাকলিদও করে।

মোটকথা, মধ্যপন্থা অবলম্বনের এমন প্রভাব যে, তাদের ইজতিহাদে তাকলিদ এবং তাকলিদে তাহকীকের শান রয়েছে। সেজন্য তাকলিদকে একটি ভিন্ন শরীয়ত বানিয়ে না তা থেকে জিন্‌সে ইজতিহাদকে রদ করা কোন সাম্য কর্ম হতে পরে, না ইজতিহাদকে একটি পৃথক আম মাসলাক (ব্যাপকতা সম্পন্ন মাযহাব) মেনে তা থেকে তাকলিদকে রদ ও অস্বীকার করা কোনো কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কর্ম বলা যেতে পারে।

এক শ্রেণীর ইজতিহাদ সমাপ্ত হয়েছে; তার সুস্পষ্ট প্রমাণ

আমি ইতিপূর্বে বলে এসেছি, ইজতিহাদের ওই শ্রেণী, যা ইল্লাত উদ্ভাবন এবং ইজতিহাদ ফিদ্দীনের সাথে সম্পৃক্ত। আজ তা এজন্যই পাওয়া যায় না যে, সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রয়নি। ইমামগণ সেই ইজতিহাদকে এত পরিমাণ পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তা থেকে উপকৃত হবে কিন্তু তাতে অতিরিক্ত গবেষণার কোনো সুযোগ বাকি নেই। কারণ, এটি একটি কুদরতি মূলনীতি যে, দুনিয়াতে যে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার সাথে সম্পর্কিত শক্তিকেও খতম করে দেওয়া হয়। দীনের বুনিয়াদ দুটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। রেওয়ায়েত ও দেরায়েত। বর্ণনাগত ও যুক্তিগত ইলমের উপর রেওয়ায়েতের সম্পর্ক মুখস্থ শক্তির সাথে আর দেরায়েতের সম্পর্ক ফহ্‌ম ও বোধশক্তির সাথে। ইসলামের প্রথম যুগে যখন ইসলামের

রেওয়ায়েতি বর্ণনাগত অংশ পরিপূর্ণ হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা মুহাদ্দিসীনদের যে বিশেষ মুখস্থ শক্তি দান করেছিলেন, আজ তাকে স্রেফ 'কারামাত' বা 'অলৌকিক ঘটনা' ছাড়া অন্য শব্দে ব্যক্ত করা যায় না। এক একজন মুহাদ্দিসের লাখ-লাখ হাদীস মুখস্থ থাকত।

শুধু হাদীসের মূল ইবারত (মতন) নয় বরং সনদ ও রেজাল তথা বর্ণনাকারীসহ। আর শুধু বর্ণনাকারীর নাম নয় বরং তার জীবনি এবং গুণাবলিসহ মুখস্থ থাকত। যেমনটি হাদীস বিষয়ের কিতাবসমূহে বিদ্যমান। তাদের বক্ষদেশ থেকে ওই নোটবুক সংকলন হয়েছে, যা আজ হাদীসের কিতাবরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত।

দীন যখন সিনার মাধ্যমে নোটবুকে সংরক্ষিত হলো এবং শুধু মুখস্থের উপর নির্ভর রইল না, তখন মুখস্থশক্তি কুদরতি কাজের মাধ্যম ঘটতে থাকে এবং আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমরা যদি দৈনিক সামাজিক জীবনের নোটবুক পকেটে না রাখি, তাহলে কাজ কারবার বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং যতটুকু ওই অবাক করা মুখস্থশক্তি আজ সম্পূর্ণ হয়েছে, যা এ-উম্মতকে মুজেযা ও কারামাত হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তখন মুখস্থ শক্তির ওই শ্রেণীও কুদরতিভাবে খতম হয়ে গেছে। তার জিন্‌স আজও অবশিষ্ট রয়েছে, যার অবশিষ্ট শ্রেণী ও অংশগুলো সময় মত কাজ করে যাচ্ছে।

এমনিভাবে যখন ইসলামে দিরায়াতী অংশ (অর্থাৎ এমন উসূল, যা দ্বারা রেওয়ায়েতকে যুক্তি দ্বারা পরখ করা যায়) পরিপূর্ণ হতে লাগল এবং রেওয়ায়েত থেকে দীনকে উদ্ভাবন করে অধ্যায়-অধ্যায় এবং পাঠ-পাঠ করার সুযোগ হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের মাঝে এমন দিরায়াত অভিজ্ঞ ফকীহ ও আইম্মায়ে ইজতিহাদ সৃষ্টি করলেন, যাদের পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মেধার দ্রুত পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন তাদের অবাক করা আবিষ্কার এবং তাদের নিজস্ব ফিকাহর দুর্লভ বস্তু ও অলৌকিক অবয়বে জগতে প্রকাশ হয়েছে। তারা শুধু মাসায়েলই উদ্ভাবন করেননি বরং উদ্ভাবনের কারণগুলোও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রকাশ করেন।

ইস্তেবাতের কাইফিয়্যাতের উপরও আলোকপাত করেছেন। সমগ্র শরীয়তের জুয্‌ইয়্যাতে তাদের কুল্লিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কও জ্ঞাত হয়েছেন এবং সম্পর্কের মাধ্যমে কুল্লিয়াত থেকে হাজার হাজার নতুন মাসায়ের এবং জুয্‌ইয়্যাত থেকে হাজারো ইল্লতে কুল্লি আবিষ্কার করেছেন, যার ফরে পুরা শরীয়ত শাখা থেকে শাখা হয়ে একই বৃক্ষ এবং এক বস্তু হিসেবে দেখা যাচ্ছে। আর এত সবকিছু

এ-শান থেকে হয়েছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আজ তাদের তীক্ষ্ণ বোধের উপর আঙ্গুল কামড়ায় এবং এগুলো তাদের মেহনত করে উপার্জিত কাজ ছিল না বরং তা শুধু আল্লাহপ্রদত্ত কাজ ছিল– এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

এ-কাজের জন্য আল্লাহ তাঁদের নির্বাচন করেছিলেন। যখন জগতের ফিকাহ আপন পরিপূর্ণ সুরতে এসে গেল প্রকাশ পেল, উম্মতের মাসায়ের সত্যিকারে দোষমুক্ত হওয়ার পর অধ্যায়-অধ্যায় সংকলন হয়ে গেল এবং আইম্মায়ে ফিকাহের বক্ষদেশ থেকে বের হয়ে কিতাব আকারে সংকলন হয়ে গেল, তখন কুদরতি কর্মের মাধ্যমে ওই বিশেষ বোধশক্তিও ঘটতে থাকে।

আজ তার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নেই। আর আস্তে আস্তে আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, নতুন আবিষ্কার তো দূরের কথা, ইস্তেম্বাত করা মাসায়েলের গোপন সম্পর্ক যা কুল্লিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে, এমনকি জুয়্যিাত ও কুল্লিয়াত ধারার সম্পর্ক এবং একটি অপরটির ভিতর প্রবেশের সুরতও ভালভাবে বোঝার সাধারণ মানুষের মাঝে বুঝমান নেই, সেজন্য ইজতিহাদের ওই শ্রেণীভেদও অবশিষ্ট নেই, যার সম্পর্ক ইল্লাত আবিষ্কার ও মাসায়েল উদ্ভাবনের সাথে। অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয়তার যামানা পূর্ণ করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এরই ভিত্তিতে ওই শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে।

খতম হওয়া ইজতিহাদ ব্যবহারে মন্দ পরিণতি

ওই শক্তি হারিয়ে যাওয়ার পরও যুগের দাবিদারগণ যদি ওই প্রকার ইজতিহাদের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, যার জন্য মানুষ লম্ফঝম্প করছে, তাহলে মাসায়েল ইস্তেম্বাতের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা ব্যতীত তাদের নষ্ট রুচি, প্রকৃতির অধিক কামনা এবং স্বার্থপর জযবা ইত্যাদির অধীনে, প্রত্যেক জ্ঞানী, প্রত্যেক গ্রাজুয়েট, উকিল ও ব্যারিস্টার, প্রত্যেক এডিটর যারা কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে মানুষের কিছু সময় ক্রয় করতে পারে এমনকি প্রত্যেক শিক্ষিত ও মূর্খ যুগের মুজতাহিদ হয়ে যাবে। আর ইজতিহাদের এমন-এমন অভিনব নমুনা জগতের সামনে আসবে যে, ইসলামের আসল চেহারা চেনা দুষ্কর হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ অর্থনীতি। একজন বলবে, যেমনিভাবে পূর্ব মুজতাহিদগণ নুসুস্‌কে কোন ইল্লাতরে সাথে মালুল মনে করেছেন এবং অনেক সময় প্রকাশ্য নস্‌কে পরিহার করে বাতেনী ইল্লাতের উপর আমল করছেন এবং করাচ্ছেন, আমারও উক্ত কাজের অধিকার আছে। অতএব আমার নিকট উদাহরণস্বরূপ

ওযুর হুকুম ইল্লাতের সাথে মুয়াল্লাল। যার ইল্লাত ছিল এই যে, আরবের অধিকাংশ মানুষ উট-বকরী ছরাতেন এবং তাদের হাত-পা ওই সকল প্রাণীর পেশাব ও পায়খানার ছিটা দ্বারা ময়লাযুক্ত হয়ে যেত। তা হাতে-মুখেও লেগে যেত, সেজন্য তাদের ওযু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর অযুর অঙ্গ রাখা হয়েছে, যেগুলো এভাবে বেশি ময়লাযুক্ত হতো। কিন্তু আমরা সামাজিকতার প্রয়োজনে দৈনিক গোসল করি। সংরক্ষিত এলাকায় চেয়ারে বসে থাকি। আর ওই ময়লাযুক্ত হওয়ার ইল্লাত আমাদের মাঝে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের উপর ওযু ওয়াজিব নয়।

আরেকজন বলবে, উদাহরণস্বরূপ বিবাহের মধ্যে সাক্ষী এবং বিবাহের ঘোষণা করা সত্তাগতভাবে প্রয়োজন নেই। কারণ, এগুলো ওই ইল্লাতের কারণে ছিল যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার মতানৈক্য ও ঝগড়ার সময় যাতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ সহজ হয়। সুতরাং যেখানে এগুলোর সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ জায়েয ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমনটি আজ বলা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, যদি এ ইল্লাত ও রহস্য দীনের হয় এবং এ-ইল্লাতগুলোর উপর দীনের ভিত্তি হয়, তাহলে যুগের মুজতাহিদদের বদৌলতে দরিদ্র ইসলামের মুখ লোকানোর স্থান মিলবে না। কারণ, এর পরিণাম হলো, আহকাম বিকৃতি, ইজমা তথা সম্মিলিত মতের বিরোধিতা ও ধ্বংস, প্রকাশ্য নুসুসের পরিবর্তন এবং মূল ইসলামের উচ্ছেদ। এগুলো হলো বর্তমান ইজতিহাদের উলঙ্গ ও নির্লজ্জ নমুনা, যা প্রত্যেক মানুষ সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে, চিনতে পারে। আর কিছু নমুনা ইলমি জ্ঞানগর্ভ রঙে হবে যেগুলোর অসাবধানতা ও বেপরোয়া কর্মবিশেষ ব্যক্তিরা চিনতে পারবে। কিন্তু এ-ধরনের ইজতিহাদী ধ্বংসলীলা সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো ওই যে, জন্মগতভাবে ইল্লাত আবিষ্কার করার শক্তি তো প্রয়োজন না থাকার কারণে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর এই হলো তাদের ইলম যে, কোন হুকুম ইল্লাতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত আর কোন হুকুম তায়াব্বুদি এগুলো অনুভব করা যে বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, তা তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও তার দাবি করা এবং উপরন্তু তা ব্যবহার করা এতে এমন পরিণতি সৃষ্টি করবে, যা ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, এই বিশেষ প্রকার ইজতিহাদ ছাড়া যে প্রকার ইজতিহাদের অন্ত রালে আজও জিন্‌সে ইজতিহাদ অবশিষ্ট রয়েছে। আর তা হলো সাধারণ অনুসন্ধান ও তাহকিক, কিতাব ও সুন্নাতের মাঝে গবেষণা, সেগুলোর সূক্ষ্মতা ও হাকিকত বের করা, প্রত্যেক যুগের সৃষ্টিগত নবআবিষ্কৃত বস্তুর সাথে

শরীয়তের মাসায়েলকে সমন্বয় ও অনুরূপতা দান করে উপযোগী ফতোওয়া দেওয়া।

ইসলামবিদ্বেষীদের নতুন নতুন সন্দেহ ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব নুসুস থেকে উদ্ভাবন করা। ইসলামের মূলনীতি প্রমাণ ও সঠিকভাবে সাবেত করার জন্য কিতাব ও সুন্নাহ থেকে শক্তি ও মজবুতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন প্রকার ইজতিহাদ অতীতে ছিল, আজও আছে, সর্বদা থাকবে। কারণ, কুরআনুল কারীমের শান হলো لا ينقضى عجائبه (এর অলৌকিকতা শেষ হওয়ার নয়) একথার মধ্যে কোন যুগের বিশেষত্ব নেই। সুতরাং যেমনিভাবে রেওয়ায়েত কিতাবসমূহে আজ নতুন করে গবেষণা করা, বর্ণনাকারীদের উপর নতুন করে পর্যালোচনা করা এবং শুদ্ধকরণের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনমাফিক শুধু বিষয়ভিত্তিক ইমামদের থেকে তাদের মেহনতের ফলাফল পেশ করাই দলিলের জন্য যথেষ্ট। অন্যথায় তাহসীলে হাসিল তথা অর্জনকৃত ইলম পুনরায় অর্জন করার মতো হবে। তেমনিভাবে দিরায়াতের কিতাবসমূহেও আজ নতুনভাবে ওই ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই, যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। বরং প্রয়োজন মোতাবেক আইম্মায়ে দিরায়াত থেকে তাদের অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফলাফল বর্ণনা করে দেওয়া এবং তার উপর আমল করে নেওয়া যথেষ্ট। ওখানে আমরা ইমামদের রেওয়ায়েতের উপর তাকলিদ করতে বাধ্য। আর এখানে দিরায়াতে তাদের ইত্তেবা করার উপর অপারগ। মোটকথা, আজ না নতুন হাদীসের প্রয়োজন আছে, না নতুন ফিকাহ এর প্রয়োজন আছে। মুহাদ্দীসীনগণ কোনো রেওয়াত এমন রেখে যাননি, যার সুস্থতা ও অসুস্থতা তথা শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা প্রকাশ করে যাননি। ফুকাহায়ে কেরামগণ কোনো দিরায়াতী সম্ভাবনা এবং দুরূহ আমলের সুরত এমন বাকি রেখে যাননি, যা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে দলিলসহ প্রকাশ করেননি এবং কোন আমল অন্বেষণকারীর জন্য তৃষ্ণার কোনো সামান্য সুরত বাকি রয়েছে এমন নয়। এ কারণে দুনিয়াতে নতুন নতুন সমস্যা আসবে এবং আসছে কিন্তু মুফতীদের ফতোওয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত কোন আধুনিক ফিকাহ সংকলন করার প্রয়োজন হয়নি।

এ-ফিকাহ একটি সংবিধান আকৃতিতে সংকলিত রয়েছে। এগুলো ওই মূলনীতি থেকে সংকলিত, যার অধীনে এ-ফিকহী সংবিধান আমলে এসেছে। তা দ্বারা যুগের সকল প্রয়োজন পুরো হচ্ছে এবং হতে চলেছে। চাই তার মানসুস অংশ থেকে হোক, চাই তার ইজতিহাদী অংশ থেকে হোক। এটি তার পৃথক একটি দলিল যে, ইজতিহাদী যুগ নিজের কাজ পূর্ণ করে অতীত

হয়ে গেছে, যা কখনও ফিরে আসবে না।

সাথে-সাথে একথা অন্তরে বসাতে হবে যে, ইজতিহাদ ফিদ্ দীনের যুগ তো খতম হয়ে গেছে। তা হবে; কিন্তু ইজতিহাদের তাকলিদের যুগ কখনও খতম হবে না। প্রত্যেক ইজতিহাদের তাকলিদ জারি থাকবে, চাই তা বিদ্যমান থাকুন, চাই অতীত হয়ে যাক। কেননা, তাকলিদ তো মূল ইজতিহাদে হয় না বরং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া মাসায়েলের মধ্যে হয়। আর মাসায়েল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সেজন্য কোন যুগে তাকলিদ শেষ হবে না, অতীত হবে না।

সারকথা হলো, জিন্‌সে (জাতিগত) ইজতিহাদ ও তাকলিদের মধ্য হতে কোনোটি সম্পর্কে বলা যাবে না যে, তা কোনো সময় দুনিয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সেজন্য আজও এ-দুটি বস্তু নিজেদের ওই কাইফিয়াতের সাথে বিদ্যমান, যার বিশদ বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। দীনের সামষ্টিকতা তো এ-দুটির অস্তিত্বের প্রয়োজনবোধ করে। যেহেতু এ-দুটি শরয়ী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং দীনের পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা এ-দুটির মধ্যম পন্থার দাবিদার যে, এ-দুটিকে একটি অপরটি সাথে টক্কর দিয়ে নিঃশেষ না করা। বরং মধ্যমপন্থী পয়েন্টে কায়েম করে উভয়কে হেফাজত করা চাই, যার সুরত ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

ইমামদের মতানৈক্য রহমাতের কারণ

এখান থেকে আলোচনার নতুন পয়েন্টের সূচনা হয়েছে। তা এই যে, ইজতিহাদ যখন শরয়ী বস্তু, যাতে রায় ও বুঝের দখল রয়েছে। আর রায়সমূহ বুঝ ও উপলব্ধির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ও মতানৈক্যপূর্ণ হয়। অতএব এমন হতে পারে যে, একই ইজতিহাদ বিভিন্ন রঙে প্রকাশ পাবে। তবে কি এমন ইখতিলাফের দ্বার উন্মুক্ত করা উম্মতের অনৈক্য এমনকি ধ্বংস এবং বিভিন্ন মতালম্বী হওয়ার কারণ হবে না? উত্তর হলো, এ ইখতিলাফী সুরত না সত্তাগতভাবে ক্ষতিকর, না দীনের জন্য ক্ষতিকর, না উম্মতের জন্য ক্ষতিকর। বরং আলেম এবং সমগ্র উম্মতের বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষের উন্নতি এবং অগ্রগতির কারণ। কারণ হলো এই যে, দুনিয়াতে কোন উন্নতি অগ্রগতি সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা ব্যতীত হয় না। বরং উন্নতি বলা হয় দুটি ভিন্ন বস্তুর সংঘর্ষকে। এজন্য ইলমের প্রশস্ততাও রায়ের প্রতিযোগিতা এবং চিন্তাশক্তির সংঘর্ষ ব্যতীত প্রকাশ হতে পারে না। একজন বিজ্ঞজনের বাণী–

القلب ميت وحياته بالعلم والعلم ميت وحياته بالبحث والمناظرة

মানুষের অন্তর মৃত। তার জীবন হলো ইলম। আর মানুষের ইলমও মুর্দা। তার জিন্দেগী হলো বাহাস ও মুনাযারা (বিতর্ক)।

একথা সুস্পষ্ট যে, মুনাযারা হলো ইলমকে ইলম দ্বারা সংঘর্ষ দেওয়া, ফলে ইলমের বিভিন্ন ও গোপন কোণ খুলে যায়। তাকবীনে ইলাহী এজন্য ইসলামের মোকাবেলায় কুফরের শক্তিকে দাঁড় করিয়েছে, যাতে কুফর ও বাতেল ইসলামের যত সাইডে আঘাত করবে, ইসলামের ততগুলো হক্কানী সাইড প্রকাশ পাবে এবং পরিশেষে সবাই ইসলামের বিজয় দেখতে পাবে। ইলমের মোকাবেলার সন্দেহের (বাহেনী) দলকে এজন্য কাতারবন্দী করানো হয়েছে, যাতে জাহেল নিজের যে অংশ দ্বারা ইলমের সাথে টক্কর দিবে, ইলমের ততগুলো গোপন কোণ জগদ্বাসীর সামনে প্রকাশ হতে থাকবে। অতঃপর ইলমকে ইলমের সাথে যত সংঘর্ষ দেওয়া হবে, ততই ইলমের বিভিন্ন বর্ণের চিত্র খুলতে থাকবে।

শরীয়ত মাশ্ওয়ারার বিধান এজন্য রেখেছে, যাতে রায়ের সংঘর্ষে মাসয়ালার অনুকূল এবং প্রতিকূল সাইড সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিষ্কার হয়। মোটকথা, যদি উসূলের মোকাবেলায় বিপরীত বস্তু না থাকে এবং পরস্পরবিরোধী বস্তুর সামনে যদি তার বিরোধী বস্তু না থাকে, তাহলে সেগুলোর গোপন হকিকত এবং আসল শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। আর হাকিকতহীন বিপরীত বিরোধী বস্তুর প্রকাশ পায় না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা দীনের একটি অংশে চিন্তা-ফিকির ও বাহাস রেখে ইজতিহাদ ও অনুসন্ধান এবং প্রতিযোগিতামূলক অভিমতের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে ইসলামের এমন বাতেন ইলম, যা সুপ্রশস্ত কুল্লিয়াত এবং গোপন ইল্লাত ও রহস্যের সাথে সম্পৃক্ত যা সবাই বোঝে না, সেগুলোও জাহের হতে থাকে এবং উম্মতের বিশেষ মস্তিষ্কের তেজস্বিতা এবং পরিষ্কার অন্তরের তীক্ষ্ণতা সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়। সাথে-সাথে ইসলামী উলুমের সামষ্টিকতা এবং তার সাথে কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাপকতাও উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ-গুলোর সংক্ষিপ্ত-সংক্ষিপ্ত ছোট-ছোট নুসুসে কি পরিমাণ ইলম দ্বারা ভরপুর যে, প্রত্যেক স্বচ্ছ অন্তর ও দেমাগওয়ালা ব্যক্তির জন্য তাতে সর্বদা এবং সময় উপযোগী ইলম-এর আধুনিক হতে আধুনিক সামান তৈয়ার থাকে। ফলে

اوتيت جوامع الكلم ও ونزلنا عليك الكتاب বাক্যদ্বয়ের মর্ম পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। আর সাথে-সাথে এও প্রকাশ হয়ে যাবে যে, কিতাব ও সুন্নাতের বালিগ জুমলা অলংকারপূর্ণ বাক্য এবং বিভিন্নরূপী বাক্য যে পরিমাণ শরয়ী সম্ভাবনা নিজের ভিতর রাখে আর যে-আরবী কানুন এবং ভাষা মূলনীতি হিসেবে তাতে হাকিকত সৃষ্টি হয়েছে, যে সমস্ত সম্ভাবনা যাতে কিছু সম্ভাবনা না থাকে, বরং প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তু আমলযোগ্য এবং একেকটি ভিন্ন ভিন্ন মডেল হয়ে যায় এবং ইহতেমারের দিকে ধাবিত ব্যক্তি চলতে পারে ও তাকে নিজের মাসলাক ও পথ স্থির করে, যাতে কালামে ইলাহী ও কালামে রাসূলের কোন সাইড সন্দেহযুক্ত না থাকে। বরং কোনো না কোনো ইমাম গ্রহণ করার কারণে সবকিছুই উম্মতের আমলের নিচে এসে যায়।

সুতরাং আজ ইমামদের ইখতিলাফের বদৌলতে হাদীসসমূহের প্রতিটি সম্ভাব্য ইজতিহাদী মাসয়ালার সুরতে উম্মতের মধ্যে আমল হচ্ছে এবং কালামে পয়গম্বরের এমন কোন কোণ নেই, যা একটি ভিন্ন মাযহাব ও মাসলাক গঠন হয়নি। এ-কারণে এই ইখতিলাফকে প্রশস্ত রহমত বলা হয়েছে। এর বদৌলতে কালামে নবুওয়তের আমল হচ্ছে। অবহেলিত হওয়া থেকে আমল করা, কাজে লাগানো উত্তম। সাথে-সাথে উম্মতের জন্য আরো সহজতা হাসিল হয়েছে যে, প্রত্যেক রুচির মানুষের তাদের রুচিমতো ইমাম গ্রহণ করে নিজেদের রুচি মোতাবেক ইলমি সাইড গ্রহণ করে নিজের আখেরাত সাজাতে পারছে। এমতাবস্থায় ইসলাম এমন একটি সাগরের মতো হয়ে গেছে যে, যার ঘাট একটি নয় বরং অনেকগুলো। যে পথিক যে ঘাট দিয়ে অতিক্রম করে পিপাসা মিটাতে পারবে। তার কোন এক ঘাটে বারবার ফিরে আসতে হবে না যে, প্রত্যেক ঘাটের পানি একই, স্বাদও একই। তবে পার্শ্ব ও দিক পরিবর্তিত। অথবা একটি বিশাল বৃক্ষের মতো, যার হাজারো ডালা রয়েছে এবং প্রত্যেক পার্শ্বে ডাল রয়েছে, যাতে যেদিক থেকে কেউ আসে ফল খেতে পারবে, উপকার লাভ করতে পারবে। তারা ঘুরে-ফিরে এক গেট দিয়ে প্রবেশ করার জন্য অপারগ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এমন সহজতা ইমামদের ইখতিলাফের বিনিময়েই উম্মত পেতে পারে। এজন্য এতে সুস্পষ্ট হয় যে, ইমামদের এ-ইখতিলাফ উসূল ও মূলনীতির নয় বরং উসূল সবার এক ও অভিন্ন। তাদের মতানৈক্য পার্শ্ব, দিক ও কাইফিয়্যাতের ইখতিলাফ, যাতে ইলমের সপ্রসস্ততা থেকে ইসলামের ব্যাপকতা ও উম্মতের আমলের জন্য সহজতর হয়। সাথে-সাথে প্রত্যেক রুচিশীল মানুষের জন্য তাদের রুচি মোতাবেক মুরব্বী এবং তরবিয়তের

আসবাব গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়।

অতএব, উক্ত হেকমতের কারণে আল্লাহ তায়ালা মুজতাহিদ ইমামদের মাঝেও ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন ইমামদের ইজতিহাদ রুচিতে রঙের ইখতিলাফও সৃষ্টি করেছেন, ফলে ইস্তেম্বাতের উসুল ও মূলনীতি ভিন্ন-ভিন্ন হয়েছে এবং সেই উসূলের অধীনে ইস্তেম্বাত করা মাসায়েল ইল্লাতও ভিন্ন। তারপর ইল্লাতের অধীনে সেগুলোর আহকামও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আর সকল মতানৈক্য একত্রিত হয়ে ওই ইখতিলাফী রুচি সৃষ্টি হয়েছে, যা ইমামদের আল্লাহ তায়ালা কুদরতিভাবে দান করেছিলেন। এর ফলে একটি বিরাট উপকারও জাহের হয়েছে যে, ইমামদের বিভিন্ন শানের কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন প্রকার নবুওয়তের শানও সুস্পষ্ট হয়েছে। কেমন যেন এ-সকল শান ও অবস্থা এক বরকতপূর্ণ সত্তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে একত্রিত ছিল। আর এগুলোকে কোন উম্মত এককভাবে বহন করার মতো যোগ্য ছিল না। সেগুলো সারা উম্মতের মজবুত ইলমধারীদের উপর বণ্টন হয়ে বিভিন্ন রঙে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ-কারণে প্রত্যেক নববী শান একেকজন মুজতাহিদের মাধ্যমে একেকটি পৃথক-পৃথক মাসলাক এবং মাযহাবের সুরত ধারণ করেছে। সেগুলোর উম্মতের কোটি কোটি মানুষ চলার জন্য তৈরি হয়েছে। ফলে নবুওয়তের এ-সকল রংসমূহ সমষ্টিগতভাবে শত রঙের বাগানের আকৃতিতে দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অতএব একটু গভীর নজরে তাকালে দেখা যাবে, ফুকাহায়ে কেরামদের এই ইখতিলাফ উম্মতের জন্য শুধু ক্ষতিকরহীন নয়; বরং জ্ঞানগত ও আমলগতভাবে উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সমঝদার ব্যক্তিদের সৃষ্টিগত জাওহার খুলেছে, কিতাব-সুন্নাহর বালাগাত ও জামিঈয়্যাতের গোপন দিকগুলোর প্রকাশ্য ঘোষণা হয়েছে, উম্মতের জন্য আমল করা সহজসাধ্য হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন প্রকারের ইলমের শান সুস্পষ্ট হয়েছে।

মোটকথা, উম্মত, পয়গম্বর, দীন, মাযহাব সবার জন্য ইজতিহাদী ইখতিলাফ এবং শাখা মাসয়ালার ইখতিলাফ রীতিনীতি উপকারই উপকার এবং রহমত হিসেবে প্রমাণিত হলো। এজন্য শরীয়ত প্রকাশ্য শব্দে ইখতিলাফের প্রশংসা করে তাকে সুপ্রশস্ত রহমত বলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اختلاف اصحابی رحمة واسعة

আমার সাহাবাদের ইখতিলাফ বিশাল রহমত। *[বায়হাকী, দারেকুত্বনী, দারেমী]*

অতঃপর শুধু এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকেননি বরং সেজন্য প্রতিদান ও সাওয়াব দেওয়ার অঙ্গীকার করে উম্মতকে তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ইরশাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

হযরত আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন হুকুমকারী হুকুম করে এবং ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তার জন্য ডাবল সাওয়াব। আর ভুল করলে তাতেও এক সাওয়াব মিলবে। *[বুখারী]*

কুরআনুল কারীমও আপন বাক্যে উক্ত ইখতিলাফের শরীয়তসিদ্ধতার উপর ইঙ্গিত করেছেন এবং শাখাগত ইখতিলাফের অনুমতি প্রদানে দয়া ও অনুগ্রহণ দেখাচ্ছেন। আল্লাহর ইরশাদ–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট আহকাম আসার পরও ইখতিলাফ ও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। *[সূরা আল ইমরান : আয়াত ১০৫]*

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ বাক্য দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাধারণত ইখতিলাফ নিন্দনীয় কাজ নয়। বরং শুধু এমন ইখতিলাফ নিন্দনীয়, যা দলিল সুস্পষ্ট হওয়ার পর করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, এমন ইখতিলাফ হয়তো উসূলের হতে পারে। কেননা, উসূল স্বয়ং সৃষ্টিগতভাবে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য হয়। অথবা এমন শাখা-মাসয়ালার হতে পারে, যেগুলোর দলিল সুস্পষ্ট। অতএব, সুস্পষ্ট উসূল এবং সুস্পষ্ট ফুরুর প্রকাশ্য দলিলসমূহ আসার পর

ইখতিলাফ করা উপরের আয়াত দ্বারা নিন্দনীয় এবং আসার পর নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কারণ, এমন ইখতিলাফ শুধু স্বার্থরক্ষার জন্য হয়। কিন্তু এমন শাখার মাঝে ইখতিলাফ করা, যেগুলোর দলিল-প্রমাণ এখনও সুস্পষ্ট হয়নি। চাই এভাবে হোক যে এ-সম্পর্কে কোন নস্ই আসেনি অথবা এসেছে কিন্তু পরস্পর বিরোধপূর্ণ, অন্য এক নস্ রয়েছে– উভয়ের মাঝে সমতার কারণ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার নয়। এমন প্রকার ফুরুয়াতের মধ্যে ইখতিলাফ। প্রকাশ থাকে যে, সুস্পষ্ট প্রমাণ জাহের হওয়ার পূর্বে ইখতিলাফ হওয়া নিন্দনীয় হতে পারে না। এটি ইজতিহাদী ইখতিলাফ, যা উসূল এক হওয়া সত্ত্বেও ফুরুর মধ্যে ইখতিলাফ হয়। আর তা অপারগ হওয়ার পর হয়, যাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক যবান 'বিশাল রহমত' বলেছেন, যার ভুলের উপর প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। অতএব এমন ইখতলাফ শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস তো সরাসরি মুখ খুলেছে। আর কুরআনের মর্মার্থ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

ফিকহী মাসায়েল সংকলন নিন্দনীয় হতে পারে না

যাহোক যখন ইজতিহাদ শরীয়ত অনুমোদিত কাজ হলো, ইজতিহাদী ইখতিলাফ এবং উদ্দেশ্য ও শরীয়ত অনুমোদিত হলো, তখন আইম্মায়ে মুজতাহিদদের মাধ্যমে ইজতিহাদী মতানৈক্য প্রকাশ করাও নিন্দাযোগ্য হতে পারে না এবং এমন মাসায়েলের সংকলনও তিরস্কারযোগ্য হবে না। যদি কোন মুজতাহিদের ছাত্ররা আমল করার জন্য তার ইজতিহাদী মাসায়েল এক স্থানে একত্রিত করে, অন্য শব্দে যদি তার উদ্ভাবন করা শরয়ী মাসায়েলগুলো সংকলন করতে থাকে, তাহলে এতে কেমন শরয়ী দোষ হতে পারে যে, এ-কারণে তাদের ভর্ৎসনা যোগ্য মনে করা হবে? সুতরাং এমন ইজতিহাদী মাসায়েলকে এক স্থানে জমা হওয়ার নাম ফিকাহ্, যাকে কোন মুজতাহিদের ছাত্ররা অধ্যায়-অধ্যায় করে কিতাবের পাতায় একত্রিত করেছে। এই নাম আবিষ্কৃত নয়। বরং হাদীসে নববী হতে প্রমাণিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। যেমনটি হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এসেছে।

ফিকাহ্ অনুসারীদের উপাধি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উৎসমূল

তারপর এ-ফিকাহ্ যেহেতু মজমুয়ায়ে সুনান ছিল, যাতে সুনানে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসমূল হিসেবে যুক্ত ছিল এবং সুনানে সাহাবীও উৎসমূল হিসেবে শামিল ছিল, সেজন্য তাতে সুন্নাতের নূরও ছিল এবং জামাতে সাহাবার জামাতি দলীয় নূরও একত্রিত ছিল। এ-কারণে ফিকাহের আমলকারীগণ নিজেদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রেখেছে। তাতে কী মন্দ কাজটা করল? বরং যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, এ-নাম ও হাদীস থেকেই গ্রহণ করা। হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামী হবে একটি দল ও ফিরকা ব্যতীত। সাহাবাগণ আরজ করলেন, সেই ফিরকা কোন্‌টি? তিনি বললেন, যে তরিকার উপর আমি এবং আমার সাহাবীরা রয়েছে. তার উপর চলনেওয়ালারা মুক্তিপ্রাপ্ত। *[তিরমিযী, মিশকাত]*

প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসহাব শব্দ বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এতে জামাত বোঝায়। আর শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য তরিকা এবং সুন্নাত যা পয়গাম্বর এবং সাহাবীদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এজন্য মুক্তিপ্রাপ্ত জামাতের তরজমা হয়েছে সুন্নাতে নবী ও জামাতে নবী। প্রকাশ থাকে যে, যখন ফকীহদের ফিকাহর মধ্যে এ-সুন্নাত নবী এবং জামাতে নবী জমা রয়েছে আর তারা এ-শাব্দিক ও অর্থগত মুনাসাবাতের কারণে নিজেদের উপাধি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাহলে এতে কি কোনো দোষ আছে যে, এ উপাধি তাদের জন্য ভর্ৎসনাযোগ্য হবে? বরং এ উপাধির গঠন ও সংযোজনের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে আরো একটি শরয়ী হাকিকত সেই উপাধি হতে বের হবে, যা একটি দীনি জামাতের জন্য আত্মাস্বরূপ। আর তা হলো এই যে, তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত এবং আহলে জামাত

বলে। এতে একথা ঘোষণা করছে যে, আমরা সুনানে নববীকে শুধু হাদীসের শব্দাবলি হতে গ্রহণ করি না বরং শব্দের সাথে-সাথে সাহাবাদের ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে অর্থ গ্রহণ করি, যারা হাদীসে বহনকারী যাদের ভাষায় কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলি। তাদের সিনাতে ওই শব্দাবলির গোপন হাকিকত ও সূক্ষ্মতা। কেমন যেন কিতাব ও সুন্নাতের সাথে-সাথে সোহবত ও উস্তাদের সংশ্রব আবশ্যক।

সাহাবায়ে কেরাম রা. হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান থেকে কুরআন ও হাদীস শ্রবণ করেছেন। সেগুলোর হাকিকত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিনা মোবারক থেকে গ্রহণ করেছেন। তারপর তাবেঈগণ সাহাবাদের যবান থেকে কুরআন ও হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাঁদের অন্তর থেকে সেগুলোর সত্যতা ও রহস্য অর্জন করেছেন।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

বরং এটি সুস্পষ্ট আয়াত তাদের অন্তরে যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে। *[সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৯]*

এভাবে আমরাও কিতাব ও সুন্নাতের শব্দাবলি কিতাব থেকে নিয়েছি আর এগুলোর হাকিকত পেয়েছি ওই আলোকিত হৃদয়ওয়ালা উস্তাদদের থেকে, যারা পূর্বসূরীদের থেকে খলিফা হিসেবে উক্ত বাতেনী ইলমকে সিনাতে বহন করে আসছেন। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শব্দ থেকে তরিকা ও মাযহাব বের হয়।

আর তরিকার সাথে আহলে তরিকার সংশ্রব অপরিহার্য বুঝে আসে, যা হাকিকত ও রহস্য বুঝবার একমাত্র মাধ্যম। অতএব কুরআনুল কারীম দীনি তালিম ও তরবিয়াতের দুটি মূলনীতি উল্লেখ করেছে। প্রথমটি কিতাব, দ্বিতীয়টি উস্তাদ। কিতাবের সাথে-সাথে একজন কিতাবের আলেম রাসূলকে অপরিহার্য করেছে, যাতে তিনি কিতাবের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হাকিকত বোঝাতে পারেন, আমল করে দেখাতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি,

যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। *[সূরা হাদীদ : আয়াত ২৫]*

এজন্য 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' শিরোনামটি এমন একটি সমষ্টিগত শিরোনাম, যাতে দীনি তরবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার উভয় বুনিয়াদী মূলনীতির (কিতাব ও সুন্নাত) দিকে ইঙ্গিত হয়ে যায়, যা দ্বারা একটি সাচ্চা জামাত বা সত্যবাদী ফিরকা গঠন হতে পারে যে, তাদের উপাধিতে তরীক (রাস্তা) এবং আহলে তরীক উভয়ের উপর আলোকপাত হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, তারা আহলে হাদীস এবং আহলে কুরআনও যে, এ-কিতাব থেকে সংকলিত। আহলে ইতরাও (নিকট আত্মীয়) যে, এটি স্বতন্ত্র্য মর্যাদা। কিন্তু প্রত্যেক আহলে হাদীস এবং আহলে কুরআন এবং আহলে ইতরার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হওয়া জরুরি নয় যে, তাদের উপাধির মধ্যে কারোর কারোর মধ্যে শুধু কিতাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কারো ব্যাপারে শুধু ব্যক্তিত্বের প্রতি ইশারা আছে। অতএব, হাদীসের মধ্যে যেখানে মুসলমানদের 'আহলে হাদীস' বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে আনাস রা. সাখাবী থেকে বর্ণনা করা হয়। তাতে মুসলমাদের 'আনতুম আহলুল হাদীস' শব্দ দ্বারা খেতাব করা হয়েছে। অথবা কেয়ামতের দিন করা হবে। অথবা কোন হাদীসে মুসলমানদের 'আহলে কুরআন' বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে আলী রা.-এর মধ্যে–

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

আল্লাহ বেতর (বিজোড়) তিনি বেতরকে পছন্দ করেন। অতএব হে আহলে কুরআন! তোমরা বেতর পড়। *[তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ]*

অথবা কোন হাদীসে ইতরতের ইত্তেবার দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে 'আহলে ইতরত' বলা হয়েছে। এ-সকল নামসমূহ আংশিক ও নিসবতি (আত্মীয়তামূলক সম্পর্ক) যে, হয়তো মুসলমানদের কিতাবুল্লাহর দিকে নেসবত করা হয়েছে, হয়তো সুন্নাতে নববীর প্রতি অথবা আসহাব ও আহলে বাইতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, এমনকি প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় 'আহলে হাদীস' বা 'আহলে কুরআনে'র উপাধি বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোর মধ্যে উক্ত উপাধি দ্বারা কোনো পরিভাষাগত জামাতের প্রতি ইঙ্গিত নয়। অন্যথায় ময়লাযুক্ত আহলে কুরআন এবং শিয়া আহলে ইতরতরা নিজেদের হাক্কানিয়াত প্রমাণ করতে দলিল গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

বরং ঘটনা এমন যে, এটি একটি নেসবত মাত্র, যা সম্পর্ক থাকার কারণে বলা হয়েছে।

যেমন- জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন দরজা রয়েছে, বাবুস্ সালাত বাবুল জিহাদ- জিহাদের গেট, বাবুর রাইয়ান ইত্যাদি দরজা দিয়ে প্রবেশকারীদের শুধু ওই আমল অথবা সেই দরজার দিকে নেসবত হয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়। কতককে আহলে সালাত বলা হয়েছে, কতককে আহলে সিয়াম বলা হয়েছে এবং কিছুকে আহলে জিহাদ বলা হয়েছে। অথবা কিছু বর্ণনায় তাদের আহলে দীন বলা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ওই সকল উপাধি দ্বারা পার্থক্য করা এবং ধর্মীয় গ্রুপ বানানো উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য শুধু সম্পর্ক প্রকাশ করা, যা দ্বারা মুসলমানদের পৃথক শান ও মর্যাদা প্রকাশ উদ্দেশ্য। এখানে আকিদা ও মাসায়েলের বিভিন্ন গ্রুপের দিকে ইঙ্গিত নয়।

তেমনিভাবে হাদীস শরীফে আহলে হাদীস, আহলে কুরআন বলার দ্বারা পরিভাষাগত জামাতের চকড়ালবি অথবা অমৃতসরী উদ্দেশ্য নয় বরং নেসবত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কিতাবের সাথে নেসবত রয়েছে, হাদীসের সাথে আছে, আছে সাহাবা, সালাত ও সিয়ামের সাথে। জিহাদ, দীন এবং কালিমার সাথেও আছে। সুতরাং একজন মুসলমান আহলে হাদীস ও আহলে কুরআন, আহলে ইতরত, আহলে সালাত, আহলে সিয়াম, আহলে জিহাদ, আহলে দীন, আহলে ইলম, আহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহও। কিন্তু ما انا عليه বাক্য যা থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উপাধি ইস্তেম্বাত হয়, তা বলাই হয়েছে পার্থক্যের আলোচনা চলাকালে। আর এ-উপাধি দ্বারা একটি ফিরকার স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যে ফিরকা আল্লাহর নিকট মুক্তিপ্রাপ্ত। অতএব এ-উপাধি শুধু নেসবত বর্ণনা করার জন্য নয়। বরং একটি জামাতের শরয়ী ও দীনি শিরোনাম ও হেডলাইন। এজন্য আমার ধারণামতে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উপাধি গ্রহণ করে তারা নিজেদের পরিপূর্ণ আহলে ফিকাহের অনুসারী হিসেবে প্রমাণ করেছে। তারা মাযহাবের উপাধি ও মানসুস তথা প্রকাশ্য নস্ হতে নিয়েছে অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তারপর এমন উপাধি গ্রহণ করেছে, যা লকব হিসেবেও হাদীসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে, শুধু নেসবত হিসেবে গ্রহণ করেনি।

সুতরাং যেমনিভাবে হাদীসের নেসবত 'আহলে হাদীস' দ্বারা 'আহলে কুরআন'কে নফী তথা রদ করা হয় না। বরং আহলে কুরআন দ্বারাও আহলে হাদীসকে নফী করা হয় না। তেমনিভাবে আহলে হাদীস শব্দ দ্বারা আহলে

সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপাধি অথবা তাদের ফিকহী মাসলাকের অথবা তাদের প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ ও তাকলিদের নফী রদ কিভাবে হবে। আর হাদীসের এ উদ্দেশ্য ও অর্থ কখন হলো যে, আহলে হাদীস বা আহলে কুরআনের উপাধির বিপরীতে উপাধি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উপাধি ব্যবহার হবে? তা হতে পারে না। বরং চিন্তা-গবেষণা করা হলে দেখা যাবে, যদি মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকার উপাধি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দ্বারা শুধু নেসবত আহলে হাদীস বা আহলে কুরআনকে নফী করা হতো, তাহলে সুযোগ ছিল। কিন্তু স্রেফ নেসবতের শিরোনাম দ্বারা, একটি দলীয় জামাতী লকবের শিরোনামকে রদ ও নফী করার কোনো অর্থ হতে পারে না যখন তা মানুসুসী তথা শরীয়তসিদ্ধ।

যাহোক আলহামদুলিল্লাহ্ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত একটি নাজাতপ্রাপ্ত দল। গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট দল নয়। এর উপাধি শরয়ী বিদয়াতী তথা নবআবিষ্কৃত নয়। এর জীবনবিধানের লকব (ফিকাহ) মান্সুসী– আবিষ্কৃত নয়। এজন্য এ-শরীয়তপন্থী যদি নিজেদের শরয়ী মাসলাকের মাসায়েল বনাম ফিকাহকে এক স্থানে সংকলন এবং একত্রিত করে, তাহলে তাতে কি ভর্ৎসনা ও তিরস্কার হতে পারে? সুতরাং আইম্মায়ে মুজতাহিদদের ফিকাহসমগ্র সংকলন হয়েছে এবং নিজ নিজ এলাকার কোটি কোটি মানুষের জন্য জীবনবিধান হয়েছে। উম্মত কখন সেগুলোকে তিরস্কার ও ভৎর্সনার মাধ্যম বানায়নি। বরং প্রত্যেক স্তরের মানুষ তাদের মেহনতের মূল্যায়ন করেছে এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন। সাথে-সাথে সেগুলোকে কুরআনী মুজেযার দলিল জ্ঞান করছেন যে, এর মাধ্যমে কুরআনের উলুম আত্মপ্রকাশ করেছে, যা তার মুজেযার আত্মা এবং মুজেযার কারণসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তা প্রকাশ হয়েছে। ফলে কুরআন ও সুন্নাতের জাওয়ামিউল কিলামের অলৌকিক বালাগাত ও জামিঈয়্যাত প্রকাশ পেয়েছে।

ইখতিলাফী মাসায়েলে একক ব্যক্তিসত্তার তাকলিদ আবশ্যক

যাহোক, যখন এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, ইজতিহাদ শরীয়তসিদ্ধ, ইজতিহাদের উপর আমল করা এবং সেগুলোকে একত্রিত করে সংকলন করা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। নামকরণ করা শরয়ী কাজ এবং সফল ইজতিহাদী মাসায়েলে অমুজতাহিদদের জন্য তাকলিদ করা অপরিহার্য। সাথে-সাথে

প্রতিটি ইজতিহাদী মাসায়েলে ডাবল অভিমত হওয়া সম্ভব এবং তা শরীয়তের গণ্ডিভুক্ত বস্তু। এমনকি প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছিত কাজ। এতে একথাও পরিষ্কার হয় যে, এমন ইখতিলাফী মাসায়েলে এক ব্যক্তির তাকলিদ আবশ্যকীয় কর্তব্য। কারণ, এক মাসয়ালার মধ্যে দুটি বিপরীত দিক এক সাথে সম্পূর্ণ চলমান থাকতে পারে না। আকিদা ও আমলগত কোনভাবেই থাকতে পারে না। পরিণামে এক সময়ে নাসেখ ও মানসুখ (রহিতকারী ও রহিতকৃত) রাজেহ ও মারজুহ (প্রাধান্য পাওয়া ও নিচে চলে যাওয়া), উত্তম ও অনুত্তম, হাকিকত ও মাজায (রূপক), মুশতারাক (সম্মানিত), মুয়াওয়াল (মুশতারাক থেকে যা প্রাধান্য লাভ করে), ওয়াজিব ও মাকরূহ ফরজ এবং হারামের উপর আমল এবং ইতিকাদ ও বিশ্বাস কিভাবে বুঝে আসতে পারে?

এজন্য নিরুপায় হয়ে যে কোনো একদিক গ্রহণ করতে হবে। এর মর্ম হলো এমন যে, অমুজতাহিদদের জন্য ইখতিলাফী মাসায়েলে যে কোন একজন মুজতাহিদের তাকলিদ করতে হবে। এমনকি কেউ যদি এক মাস্আলায় এক ইমামের তাকলিদ করে এবং অন্য মাসয়ালার আরেক ইমামের তাকলিদ করে তাহলেও আমি বলব, মাসয়ালাতে যার তাকলিদ হয়েছে তা একজনেরই হয়েছে। আর এতেও ব্যক্তিগত তাকলিদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এতটুকু হয়েছে যে, ইমাম কয়েকজন হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেক মাসয়ালাতে ইমাম একজনই ছিল। এমন তো হয়নি যে, এক মাসয়ালাতে কোন এক ইমামের তাকলিদ হয়েছে, আবার একই মাসয়ালাতে আরেকজন ইমামের তাকলিদ হয়েছে।

এভাবে আরো কয়েকজনের তাকলিদ হয়েছে। এতে তাকলিদ ডাবল হলো এবং ইমাম কয়েকজন হলো। কিন্তু যে মাসয়ালায় যে ইমামের তাকলিদ করা হয়েছে, তাতে ব্যক্তিগতই হয়েছে। অথবা যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি মাসয়ালাতে সকালবেলা এক ইমামের তাকলিদ করছে আবার একই মাসয়ালাতে বিকালবেলা অপর একজন ইমামের মুকাল্লিদ হয়েছে। এমতাবস্থায় যে, ইমামদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রদানকারী, তাহলে আমি বলব, এখনও সে ব্যক্তিগত তাকলিদওয়ালাই রয়ে গেছে। কারণ, যে সকালে সে এক ইমামের তাকলিদ করেছে, সে-ই সকালে সে অবশ্যই দ্বিতীয় ইমামের চিন্তাধারা হতে দূরে রয়েছে এবং তার আমল থেকে পৃথক রয়েছে। আর সন্ধ্যায় যখন সে অন্য ইমাম গ্রহণ করেছে, তখন নিঃসন্দেহে সে সকালের ইমাম এবং মাযহাবকে বদলে ফেলেছে। অতএব, সে সকাল বেলাও ব্যক্তি তাকলিদ করেছে এবং বিকাল বেলাও ব্যক্তি তাকলিদ করেছে।

সার কথা হলো, যুক্তিগতভাবে ইখতিলাফী মাসায়েলে তাকলিদে শখসী ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। চাই যে কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা হোক। একথা ভিন্ন যে, তাকলিদে শখসীর মাঝে কোনোটা নিন্দনীয়, কোনোটি প্রশংসনীয়? কিন্তু ইখতিলাফী মাসায়েলে যে কোন শ্রেণীকে গ্রহণ করা হোক, তাকলিদে শখসী ছাড়া মুজতাহিদদের জন্য কোনো উপায় নেই। এর রহস্য হলো এই যে, যুক্তিগতভাবে একজন মানুষ একই সময় দুটি বিপরীতমুখী বস্তুতে সম্পূর্ণ চলমান থাকতে পারে না। সাথে-সাথে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দীনের মধ্যে বৈপীরত্য অসম্ভব।

যে কেউ কোনো এক পার্শ্বকে ইখতিয়ার করবে চাই সে ওই মুজতাহিদ হোক যিনি ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির তাকলিদ করেন, জ্ঞানগতভাবে তার একটি সাইড বৃদ্ধি পাবে। অথবা মুকাল্লিদ হোক, যে আকিদাগত ও আমলগত তাকলিদ করে সে এক পার্শ্বকে ইখতিয়ার করেছে, তার জন্য আবশ্যক হলো অন্য পার্শ্বকে পরিহার করা। অন্যথায় সে এবং তার দীন তানাকুযের শিকার হবে, যা যুক্তিগত ও শরীয়তগত উভয়ভাবে অসম্ভব, যার নজীর দীনের মধ্যে নেই।

তবে হ্যাঁ, এর নজীর পাওয়া যাবে যে, এক পক্ষ হতে ফিরে এসে অন্যপক্ষ গ্রহণ করেছে। প্রকাশ থাকে যে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ পরিহার করতে হবে। তাহলে ওই তাকলিদে শখসী এবং তাহকীকে শখসী পুনরায় ফিরে আসবে। মোটকথা, এমন হতে পারে যে, একটি বিপরীতকে মানা অবস্থায় আরেকটিকে মানা। অথবা একটির আমল করা অবস্থার আরেকটির আমল করা সম্ভব নয়।

কেমন তাকলিদে শখসী উদ্দেশ্য এবং তা কেন জরুরি

বাকি রইল এ-বিষয়টি যে, সকল শখসী তাকলিদ হতে কোন তাকলিদ উদ্দেশ্য বা যুক্তি ও বর্ণনাগতভাবে গ্রহণযোগ্য? বাস্তবে গ্রহণযোগ্য কোন্ তাকলিদ? এ-ব্যাপারে যদি ইনসাফের সাথে চিন্তা করা হয়, তাহলে একটিমাত্র সুরত যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, আমলের গণ্ডিতে একই ফিকাহকে সকল মাসয়ালাতে আমল করা বা অন্য শব্দে বলা যেতে পারে, সমস্ত ইজতিহাদী মাসায়েলে এক ইমামের তাকলিদ আবশ্যক। কারণ, ইলমি দৃষ্টিকোণে এটা অসম্ভব যে, ইজতিহাদের মাঝে ভাগ করে কিছু মাসায়েলে এক ইমাম এবং কিছু মাসায়েলে অন্য ইমামকে তাকলিদ করা। বরং যে ফিকাহকে গ্রহণ করা হবে, তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ওই

অসম্ভব তানাকুয কোনো না কোনো দিক থেকে মাথায় এসে পড়বে। কিছু মাসায়েলে আংশিক তানাকুয দেখা দেবে আর কিছুর মধ্যে ওই জুযইয়াতের সূচনা ও সম্পর্কের তানাকুয দেখা দেবে এবং কিছুর মধ্যে ওই জুযইয়্যাত, কুল্লয়াত ও মূলনীতির মধ্যে তানাকুয সৃষ্টি হবে। কারণ, কিছু ইজতিহাদী মাসায়েল তো এমন যে, স্বয়ং সেগুলোর মধ্যেই প্রকাশ্য তানাকুয থাকে, যা একজন অতি সাধারণ মানুষও চিনতে পারে, বুঝতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ মহিলাদের স্পর্শ করা হানাফীদের মাযহাবে ওযু ভঙ্গকারী নয়। শাফী মাযহাবে ওযু ভেঙ্গে যায়। অথবা পেশাব-পায়খানার স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে কোনো কিছু বের হলে শাফেয়ী মাযহাবে ওযু ভঙ্গকারী নয়। হানাফী মাযহাবে ওযু ভঙ্গকারী। প্রকাশ থাকে যে, এটি একটি প্রকাশ্য তানাকুয, যা হুকুম হিসেবেও এবং হুকুমের ভিত্তি অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ ইত্যাদি হিসেবেও। সুতরাং একজন অতি সাধারণ মানুষও জানে, উক্ত দুই মাসায়েলে তাদের বিপরীত দিককে বিপরীত মেনে একই সময় না উভয়ের উপর আমল করা যাবে, না উভয় আমলের মাঝে চলমান থাকা যাবে। দীনের মাঝে এমন তানাকুযের কোনো দলিল এবং কোনো নজির নেই। তবে যদি শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে দুটি বিপরীতমুখী বিষয়ে ইখতিয়ার দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে দুটি ফিকাহ অথবা ফুকাহার মধ্যে চলমান থাকা প্রকাশ্য তানাকুযদুটি বিপরীতমুখী বস্তুকে গ্রহণ করা যাবে। কেমন যেন একই সময়ে দুটি বিপরীতমুখী বস্তুকে সত্য মনে করে আমলযোগ্য মনে করা, যা যুক্তির দৃষ্টিতেও বাতিল এবং ধর্মীয়ভাবেও অসম্ভব। এজন্য আবশ্যকীয়ভাবে এমন প্রকার মাসায়েলে একজন সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যভাবে মাসায়েলের একদিক ইখতিয়ার করে একজন ইমামের তাকলিদ করতে বাধ্য থাকবে।

২. দ্বিতীয় সুরত এই যে, এক মাসয়ালার দুটি ইখতিলাফী দিক হতে এক সময় একটির উপর আমল করা, অন্য সময় অন্যটির উপর আমল করা। অথবা এক ইমাম এবং এক ফিকাহের অনুগত থেকে, সেই ফিকাহের কোনো এক-আধ মাসয়ালায় অন্য ইমামের তাকলিদ করা হয় এবং যখন সেই মাসয়ালার ওই পার্শ্বকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যা নিজ ইমামের ইখতিয়ার করা। আর শুধু ওই পার্শ্ব গ্রহণ করা হয়, যা অন্য ইমামের ইখতিয়ার করা। তাহলে তাতে উল্লিখিত তানাকুযের হুকুম সৃষ্টি হবে না। আর লোকটি এক ইমামের তাকলিদ থেকেও বের হবে না। কারণ, অধিকাংশ এমনকি আনুমানিক সকল মাসায়েলে, এক-আধা ব্যতীত নিজ ইমামেরই তাকলিদ বিদ্যমান। তাহলে এমন কয়েকটি জুযইয়্যাতের মধ্যে অন্য ইমামের তাকলিদ করার মধ্যে কি

অসুবিধা আছে?

উদাহরণস্বরূপ একজন হানাফী সকল মাসয়ালায় হানাফী থাকে। শুধু মাফ্কুদ (যার সন্ধান নেই) এর মাসয়ালার ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাবের উপর আমল করতে থাকে এবং এ-ব্যাপারে হানাফী মাযহাব ছেড়ে দেয়। তাহলে তাতে ওই তানাকুয এবং দুটি বৈপরীত্য বস্তু একত্রিত করা কখন লাযিম হলো, যা থেকে বাঁচার জন্য দুই তাকলিদকে অযৌক্তিক মনে করা হয়? কিন্তু যদি চিন্তা ও গবেষণা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, ওই তানাকুয এখনও রয়েছে। এ-বিশেষ অংশে নেই তো তার সূচনা এবং সম্পর্কিত বস্তুতে রয়েছে। কারণ, প্রত্যেক ইমাম যখন কোন মাসয়ালায় ইজতিহাদী রায় প্রয়োগ করেন, তখন তার সামনে ওই অধ্যায়ের সকল মাসয়ালা উপস্থিত থাকে। আর তিনি আপন বিশেষ রুচিবোধ ও মূলনীতি দ্বারা ওই সমস্ত মাসয়ালার অধ্যায়ে একটি বিশেষ নেসবত অনুভব করে এবং আপন ইজতিহাদী রুচি দ্বারা ওই সম্পর্ক ও নেসবত ঠিক রেখে সেই অধ্যায়ের সকল মাসয়ালার কড়া জোড়া দেন। জরুরি নয় যে, অন্য ইমামদের রুচিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও উল্লেখিত নেসবতের মাযহাবী রং ঠিক থাকতে হবে। বরং ওই নেসবত ও সমতার অন্য কোন বড় ও ঢং থাকবে, যা তার রং এতে একেবারে ভিন্ন হবে। সেজন্য যদি এক ইমামের মুকাল্লিদ এমন কোন মাসয়ালায় অন্য ইমামের তাকলিদ করে, তাহলে ওই বিশেষ মাসয়ালার নয় বরং তার একই রং এবং (উৎস) মূলনীতি অন্যান্য মাসায়েলে তানাকুয সৃষ্টি করবে। সে কারণে এ-নতুন মুকাল্লিদের উপর তার সাথে সম্পর্কিত মাসায়েলের তাকলিদও আবশ্যক হয়ে যায়, যেগুলোর মধ্যে তাকলিদ করা তার ইচ্ছা ছিল না।

মাফকুদের মাসয়ালায় একই সুরত যে, মালেকী মাযহাবে চার বছরের মধ্যে পৃথক হওয়া তার উপর আবর্তন হয়। তাদের নিকট গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময় ৪ বছর। সেজন্য চার বছর পর্যন্ত রেহেমমুক্তির অপেক্ষা করা হবে। তেমনি চার বছর পর অনটনগ্রস্ততাও পৃথক হওয়ার কারণ হয়ে যায়। কিন্তু দরিদ্রতা পৃথক হওয়ার কারণ নয়। অতএব ফিকাহ হিসেবে চার বছর পর পৃথক হওয়ার ফতোওয়া দেওয়া কেমন যেন গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় চার বছরকে মেনে নেওয়া হয় এবং দরিদ্রতার উপর পৃথকতাকে বরণ করে নেওয়া হয়। অথচ এ-হানাফী হানাফী হওয়া হিসেবে সর্বোচ্চ সময় ২ বছর মেনেছে, যাকে এখন পর্যন্ত সে অস্বীকার করেনি এবং দরিদ্রতা ও অনটনগ্রস্ততাকে (বিবাহ বিচ্ছেদ) পৃথক হওয়ার কারণ বলে না।

অতএব, সে মাফকুদের মাসয়ালার অর্থে হানাফী এবং মালেকীও। দুই

বছরকেও সাব্যস্ত করে এবং চার বছরে অনটন গ্রন্থের পৃথকতাকেও সাব্যস্ত করে এবং মূল মাসয়ালার ফতোওয়ায় সে তানাকুযে বন্দী না হয়, ধরা না পড়ে, তাহলে তার মূলে এবং সম্পর্কিত বস্তুতে গ্রেফতার হবে। এতে বাঁচার সুরত একটাই রয়েছে। আর তাহলো প্রত্যেক মাসয়ালায় হানাফী হয়ে যাও, নয় মালেকী হয়ে যাও।

৩. তৃতীয় সুরত এমন যে, না এক মাসয়ালার দুই পার্শ্বেই চলমান আমল করতে থাকে, না এক মাসয়ালার দুই ইজতিহাদী সাইডে দুই সময়ে আমল করা হয়। বরং দুই অধ্যায়ের পৃথক পৃথক মাসয়ালাতে যাদের পরস্পর কোনো সম্পর্ক নেই এমন মাসয়ালায় দুই ইমামের তাকলিদ করা। যেমন– নামাযের শাখা মাসয়ালার এক ইমামের ইজতিহাদের উপর আমল করা এবং হজ্বের শাখা মাসয়ালাতে অন্য ইমামের তাকলিদ করা। তাহলে এতে বাহ্যিক নজরে তো তানাকুযের কোনো সুরত সৃষ্টি হয় না এবং তাকলিদে শখসীর মসিবত হতেও মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু গভীর চিন্তা করা হলে দেখা যাবে, এ-সুরতে যদিও জুযইয়্যাতি বৈপরীত্য নেই; কিন্তু মূলনীতিগত এবং কুল্লিগত বৈপরীত্য হতে এখানেও মুক্ত নয়। কারণ, প্রত্যেক ইমামের ইস্তেম্বাত ও ইজতিহাদের মূলনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা তাদের জন্মগত রুচিবোধ এবং অভ্যাসগত ডাইশ থেকে উৎপন্ন হয়, প্রকাশ পায়। সেজন্য ওই রং তার পুরো ফিকাহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একেবারে এমন যেমন শরীয়তের মাঝে আম্বিয়াদের রং ভরা থাকে। এক শরীয়ত যখন নবীর অন্তর ও দেমাগ হয়ে প্রকাশ হয়, তখন নবীর স্বভাবজাত রং শরীয়তের মধ্যে চমকানো আবশ্যক। হযরত মুসা আ.-এর জালালী শান ছিল। তাঁর শরীয়তের বিধিবিধানেও কঠোরতা এবং কঠিনতা প্রবল। হযরত ঈসা আ.-এর শান ছিল জামালী এবং রহমত ও সহানুভূতির। অতএব তাঁর শরীয়তেও নরম ও নমনীয়তা প্রবল ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান ছিল সমষ্টিগত, যার প্রাধান্য ও প্রাবল্য রং হলো, আদল ও মধ্যমপন্থা এবং রহমতও সহজতা। তাই মুহাম্মাদী শরীয়তের প্রতিটি মাসয়ালাতে এ-জমইয়্যাত, আদলের প্রদর্শনী ও রহমত প্রকাশ হয়।

মোটকথা, মাযহাবের উসূল ও ফুরুর মধ্যে সাহেবে মাযহাবের স্বভাবজাত চিন্তা-চেতনার পৃথক রং এজন্য চকচকানো ও প্রকাশ হওয়া জরুরি যে, এ-সকল ইলহামী উসূল ও ফুরু সে তাদের চিন্তা-চেতনার পথ অতিগক্রম কর আসে। সেজন্য আম্বিয়াদের দীন এক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক নবীর শরীয়তে পৃথক একটি রং রয়েছে এবং তার কামালাত (পূর্ণতা গুণের) ও কারামাতের

(মুজেযার) একটি বিশেষ রং রয়েছে, যা অন্যদের মাঝে নেই। আর তাঁর রঙের অধীনে তাঁর তরবিয়াতপ্রাপ্তদের মধ্যেও ওই রং ছড়িয়ে পড়ে, যা বড় শিষ্যদের হয়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন উম্মতের শান, আলামত ও বৈশিষ্ট্য একেবারে পৃথক এবং পরস্পর বৈপরীত্য হয়ে থাকে। আর তা আপন আপন নবীর শানের পূর্ণ প্রদর্শনীও। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বোঝা যেতে পারে, যেমন একটি সাগর বা নদী এক হওয়া সত্ত্বেও যে যে অঞ্চলের জমিন দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং সেখানকার হাওয়ার বিশেষ প্রভাব বহন করে এবং তা থেকে পিপাসা নিবারণকারীদের মেজাজের মধ্যেও ওই কাইফিয়্যাত ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব, শরঈ তাকলিফিয়্যাহ (মৌলিক আদেশ নিষেধের বিধান) এর তো শরঈ ওয়াযইয়্যাহ্ (ইজতিহাদী মাসালেক) ও মূলনীতি এক হওয়া সত্ত্বেও যে মানের অন্তর ও দেমাগ থেকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের পোশাক পরিধান করে, তারই রুচিগত রং নিয়ে প্রকাশ হয় এবং তারই রুচি ও তবিয়ত হতে বের হওয়া মূলনীতি হতে উদ্ভাবন হয়। অতএব, সেই মুজতাহিদের সম্পূর্ণ ফিকাহ এবং ফিকাহর সমস্ত অধ্যায় তারই তবয়ী ও রুচিগত রংয়ে ডুব দিয়ে তৈরি হয়, যা পরিণামে সেগুলোর আমলি অংশসমূহের মাধ্যমে, সেই ফিকাহর প্রত্যেক অনুসারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

অর্থাৎ ওই ফিকাহর তরবিয়তপ্রাপ্তদের চিন্তা-চেতনাও তারই রঙে রঙিন হয়, যা আসল মুরুব্বী এবং ফিকাহর প্রবক্তার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কোনো মুজতাহিদের মেজাজে সুপ্রশস্ততার প্রবণতা রয়েছে, কারো মেজাযে ইহতিয়াত তথা সাবধান হওয়ার প্রবলতা আছে, কারোর মধ্যে কঠোরতা, কারো মধ্যে সহজতা ও নমনীয়তা আছে। কারো মধ্যে জামিঈয়্যাতের প্রবলতা আছে, কারো মধ্যে দীনদারীর আধিক্য রয়েছে আবার কারো মধ্যে এর পাশাপাশি রাজনীতি, শৃঙ্খলা এবং ঐক্যবদ্ধতার সর্বোচ্চ অনুভূতি রয়েছে। কারো মধ্যে বাহ্যিকতার প্রাবল্য, কারো মাঝে বাতেনিয়্যাতের প্রাবল্য আছে। কারো মধ্যে সান্ত্বনা প্রদান, সাংগঠনিক কর্মের প্রাধান্য অথবা পূর্বসূরীদের আদর্শের প্রাবল্য রয়েছে এবং কারো মাঝে অগ্রাধিকারের (রুজহানাত) অনুগামিতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবলতা রয়েছে।

সুস্পষ্ট কথা হলো, যেখানে বাহ্যিকতা প্রবল হবে, ওখানে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য প্রকাশ্য রেওয়ায়েত-বর্ণনা থাকবে এবং যেখানে বাতেনিয়্যাতের প্রবলতা থাকবে, সেখানে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাতেনি রেওয়ায়েত তথা যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা থাকবে। যেখানে সাংগঠনিক

কাজের প্রবণতা থাকে, সেখানে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সালফে-সালেহীনের আমল থাকবে। আর যেথায় শরয়ী গণতন্ত্রের প্রবলতা থাকবে, সেথায় সবচেয়ে বেশি পূর্বসূরীদের প্রাধান্য থাকবে। বহরহাল যাহোক, যে ইমামের যেমন চিন্তা ধারা ও বৈশিষ্ট্য হবে, তাই তাঁর আবিষ্কৃত মূলনীতি হতে চেনা যাবে এবং তারপর ওই বৈশিষ্ট্যাবলি। সেই মূলনীতির অধীনে উদ্ভাবিত হওয়া জুযইয়্যাত থেকেও মনোনীত হবে, প্রকাশ পাবে। আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশেষ রং পরিশেষে সেই সদস্যদের তরবিয়াত করবে যারা এ ফিকাহর উপর আমল করবে।

সারকথা হলো, একটি ফিকাহ-এর মুকাল্লিদ বাহ্যিকভাবে তো ফিকাহর জুযইয়্যাতের তাকলিদ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত নজরে সে ওই মূলনীতির তাকলিদ করে যা থেকে এ-ফিকাহ গঠন হয়েছে আর বাস্তবে এমন কর্মপদ্ধতিতে ওই কুল্লিয়াতকে পরিচালিত করে, যা ফিকাহর জুযইয়্যাতকে কাজ হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং অতএব, দুই ফিকাহর উপর আমল করনেওয়ালা যদি উদাহরণস্বরূপ এমন জুযইয়্যাতকে নির্বাচিত করে, যা বাহ্যিক নজরে একে অপরের বিরোধী নয়, বিপরীত নয় এবং উভয় ফিকাহর তাকলিদ ও বিপরীত জুযইয়্যাতে আরম্ভ করে দেয়, তাহলে যদিও সে জুযইয়্যাতি তানাকুযের শিকার হবে না; কিন্তু বাস্তবে সে ওই কুল্লিয়াতি তানাকুযের শিকার হবে, যা ওই জুযইয়্যাতের গঠনের জিম্মাদার এবং সেগুলোর মাঝে জড়িত হয়ে আছে।

প্রকাশ থাকে যে, যখন তা মূলনীতিগত তানাকুয এবং রুচিগত মতবিরোধপূর্ণ, তাহলে সেই মুকাল্লিদের ভিতর অবশ্যই দুটি রুচিগত রং নিজেদের পরস্পর তানাকুযসহ (ভরে যাবে) প্রবেশ করবে। অভ্যন্তরীণ সুরতে অবশ্যই তার রুহানি মেজাজে ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং সেই বিপরীত প্রভাবের টানাটানির শিকার হয়ে অবস্থা বিকৃত হয়ে যাবে। আর যদি ফিলহাল তানাকুয ক্ষতিকর হয় এবং জুযইয়্যাতকে আমল অনুপযুক্ত বানাতে পারে, তাহলে তানাকুযে কুল্লিয়াতকে চিন্তার অনুপযুক্ত কেন বানাবে না? আর আমল যেহেতু চিন্তা-চেতনার অনুগামী, তাহলে তার মাধ্যমে আমলের মাঝে ফাসাদ তথা বিকৃতি সৃষ্টি হবে, যা কিছু দিন পর প্রকাশ পেতে থাকবে।

ইমামদের ইখতিলাফী রুচিবোধ থেকে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন মূলনীতি

ইমামদের ভিন্ন-ভিন্ন রুচিবোধকে দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝার জন্য এভাবে গভীর চিন্তা করতে হবে। যেমন পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের সময়, ইমাম শাফেঈ রহ.-এর রুচিবোধ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া সনদ শক্তি। তিনি পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহে সাধারণত সনদ শক্তির মানদণ্ডের দ্বারা প্রাধান্য দিতেন। অতএব, যে হাদীসের সনদ বর্ণনার মূলনীতি হিসেবে বেশি শক্তিশালী ও মজবুত হতো। তিনি সেই রেওয়ায়েতকে নিজ মাযহাবের ফাউন্ডেশন বানিয়ে অন্যান্য দুর্বল সনদের বর্ণনাগুলোকে যা মজবুত সনদওয়ালা হাদীসের বিপরীত হতো, হয়তো সেগুলোকে পরিহার করতেন, হয়তো প্রাধান্য না হওয়ার স্বীকৃতি দিতেন। অথবা সেগুলোর কোন দিকনির্দেশনা দিতেন। ইমামে দারুল হিজরত ইমাম মালেক রহ. এমতাবস্থায় তার সবচেয়ে বড় মূলনীতি ছিল (সালফে সালেহীন) পূর্বসূরীদের গঠনমূলক আমল। তিনি দেখতেন এ-দুটি বিরোধপূর্ণ বর্ণনায় মদিনাবাসীর আমল কেমন ছিল। তাদের আমল যে রেওয়ায়েতের সাথে মিলত, তিনি বিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় ওই রেওয়ায়েতকে নিজের মাযহারের ফাউন্ডেশন স্থির করতেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকে ত্যাগ করতেন। না হয় কোনো দিকনির্দেশনা দিতেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর রুচিবোধ এবং মূলনীতিগত মানদণ্ড হলো, তিনি এমন মতানৈক্যপূর্ণ স্থানে পূর্বসূরীদের অগ্রাধিকারের অনুসরণ করতেন যে, সাহাবা রা. ও তাবেঈদের অধিকাংশ ফতোওয়া কোন রেওয়ায়েতের দিকে ছিল। তিনি সেই রেওয়ায়েতকে নিজের মাযহাবের মূলনীতি স্থির করে অবশিষ্ট বর্ণনাগুলোর ফয়সালা তা থেকেই করে দিতেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রুচিবোধ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া মূলনীতি, একটি বিশেষ জামিইয়্যাত (সামগ্রিকতা) এর সাথে সামঞ্জস্য ও সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধন করা। অর্থাৎ তিনি এক অধ্যায়ের সকল বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোকে যেগুলো গ্রহণযোগ্য সবগুলোকে সামনে রেখে তাদের সমষ্টি হতে শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্য ও পরকালীন উপকার কী-কী তা তালাশ করতেন এবং ইজতিহাদী আলো দ্বারা দেখতেন যে, পরিণামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানশা কী ছিল। যেই মানশায় রেওয়ায়েত বেশি সুস্পষ্ট হতো, তিনি তাকেই আপন মাযহাবের মূলনীতি স্থির করতেন। যদিও তা সনদ হিসেবে কিছুটা দুর্বল হতো আর অবশিষ্ট

বর্ণনাগুলোকে কুল্লি উদ্দেশের সঙ্গে এমনভাবে জোড়া লাগাতেন যে, ওই সকল বর্ণনা আপন আপন স্থানে সঠিক মনে হতো আর সুস্পষ্ট হয়ে যেত যে, সকল বর্ণনায় একই মাসয়ালা। তবে কোনো রেওয়ায়েতে তার হুকুম থাকত, কোনোটিতে তার হেকমত, কোনোটিতে তার কাইফিয়াত (অবস্থা) কোনোটিতে তার কামমিয়্যাত (পরিমাণ) কোনোটিতে তার মূল উৎস এবং কোনোটিতে কুল্লিয়াত এবং কোনোটিতে তার অবস্থাদি ও পরিস্থিতি বর্ণনা হতো।

মোটকথা, বর্ণনাগুলোকে শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্যের ধারাবিহকতায় সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে সেগুলোকে একত্রিত করা ইমাম রহ.-এর আসল মূলনীতি ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি সাইড যাতে যথাসম্ভব আমলে এসে যায়, কোনটি যাতে বেকার না থাকে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকাহর কয়েকটি নমুনা

যেমন– সফরের রোযার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোনো হাদীস দ্বারা প্রকাশ হয় সফর অবস্থায় রোযা না রাখা হতে রোযা রাখা উত্তম। হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামি রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সফরে রোযা রাখা কি গোনাহ? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

রোযা ভেঙ্গে ফেলা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অনুমতি। যে তা গ্রহণ করবে, যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তা সৌন্দর্যের বিষয় হবে। আর যে রোযা রাখা পছন্দ করবে, তা তার জন্য গোনাহ হবে না। *[মিশকাত]*

এ-হাদীসে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি প্রদান করে একে সুন্দর বলা হয়েছে। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, সিদ্ধান্ত রোযা রাখা। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলা বা রাখা জায়েয। কিছু বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়, রোযা হতে ইফতার তথা রোযা ভেঙ্গে ফেলা উত্তম। যেমনটি হযরত জাবের রা.-এর বর্ণনায় রয়েছে, রামাযান মাসের কোনো এক যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মানুষের ভিড় দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির উপর ছায়া দেওয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, ওখানে কী হচ্ছে? আরজ করা হলো, একজন রোযাদারের গরমের কারণে তার অবস্থা বিগড়ে গেছে। তিনি বললেন–

ليس من البر الصوم في السفر

সফরে রোযা রাখায় কোনো সাওয়াব নেই। *[মিশকাত]*

অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, কোনো এক সফরে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। কিছু মানুষ রোযাদার ছিল। আর কিছু রোযা ছাড়া। মঞ্জিলে পৌঁছে রোযাদার লোকেরা তো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। আর বেরোযাদার লোকেরা কাজ করল, তাঁবু তৈরি করল, পশুদের পানি পান করার। তখন হুজুর ইরশাদ করলেন–

ذهب المفطرون اليوم بالأجر

বে-রোযাদারগণ সাওয়াব একত্রিত করে নিয়ে নিলো। *[মিশকাত]*

আর কিছু বর্ণনায় রোযা ও ইফতারে উভয় কাজে ইখতিয়ার দেওয়া মনে হয়। মন চাইলে রোযা রাখা, না হয় ভেঙ্গে ফেলা উভয়টির বরাবর অনুমতি আছে। যেমনটি হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামি রা.-এর বর্ণনায় রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

সফর অবস্থায় মন চাইলে রোযা রাখতেও পার, মন চাইলে ভাঙ্গতে পার। *[মিশকাত]*

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম আওযাঈ রহ. ও হযরত আনাস রা.-এর হাদীস গ্রহণ করে বললেন, সফর অবস্থায় ইফতার তথা রোযা ভেঙ্গে ফেলা উত্তম। তারা রোযা উত্তম হওয়া এবং ইখতিয়ারী বস্তু হওয়াকে নফী তথা পরিহার করলেন। কেউ কেউ রোযা উত্তম হওয়ার রায় দিলেন। তারা ভঙ্গ করা উত্তম এবং ইখতিয়ার দেওয়ার হাদীসকে নফী করলেন। কেউ ইখতিয়ার দেওয়ার অভিমত গ্রহণ করলেন। তো তারা রোযা উত্তম এবং রোযা উত্তম নয় উভয়কে নফী করলেন। তারা মানদণ্ড হিসেবে উপরের বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে গ্রহণ করলেন। কেউ হাদীসের সনদের শক্তি ও দুর্বলতা অথবা সাহাবাদের আমল দেখলেন ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম আযম রহ.

বর্ণনাগুলোর সমন্বয় সাধন ও সমতার অধীনে তিন প্রকার ও তিন ধরনের হাদীসকে একত্রিত করে সবগুলোকে আমলযোগ্য বানিয়ে দিলেন। কোন একটি দিক নফী করলেন না। তিনি ইজতিহাদী নূর (আলো) এবং শরয়ী রুচিবোধ দ্বারা দেখলেন, এ বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা শারে আ.-এর উদ্দেশ্য হলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া। এক বিধান দ্বারা অন্যটিকে নফী তথা পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং ইখতিয়ারের হাদীসকে রাখা ও না রাখা উভয়টি জায়েয এর হুকুমের উপর উঠালেন। বললেন, এ হাদীস দ্বারা শারেঈ আ.-এর উদ্দেশ্য রোযা ও ইফতার উভয়টিকে কোনো প্রকার দোষ ছাড়া জায়েয বলা। অর্থাৎ রোযা ও ইফতার জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। আর রোযা উত্তম হওয়ার রেওয়ায়েতকে আসল ও মূলের উপর রাখলেন যে, সত্তাগতভাবে রোযা রাখাই উত্তম। কারণ, রামাযান মাস হলো রোযার জন্য। তাই তাতে ইফতার করা রোযা ভেঙ্গে ফেলা কোনোভাবে আসল হতে পারে না। অতএব, আসল ও হাকিকতে ফযিলত রোযারই, যা উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। আর রোযা ভঙ্গ করা উত্তম হওয়ার রেওয়ায়েতকে সাময়িক অবস্থার উপর রাখলেন। যখন অবস্থা বিপন্ন হবে এবং রোযা রাখার দ্বারা কষ্ট সীমা অতিক্রম করা আশঙ্কা হয়, তাহলে সাময়িক ও অস্থায়ী ফযিলত রোযা ভাঙ্গার মাঝে।

অতএব, ইখতিয়ার হলো জায়েযে, রোযা উত্তম হলো মূল রোযা এবং সময় হিসেবে আর রোযা ভঙ্গ উত্তম রোযাদারের অবস্থার কারণে। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, একজন মুসাফিরের উপর উক্ত তিন অবস্থা আসতে পারে। তাই শরীয়তপ্রণেতা তিন অবস্থার হুকুম বিধান বলে দিলেন। অতএব তিন অবস্থার ব্যাখ্যা দ্বারা সকল বর্ণনাকে একটি পয়েন্টে একত্রিত করে এদের বিরোধ মিটিয়ে দিলেন। ফলে ইখতিয়ার ঠিক থাকল, রোযা-উত্তম হওয়া ঠিক থাকল, ইফতার উত্তম হওয়াও সাবিত হলো। কোন হুকুম দ্বারা অপর হুকুম নফী হলো না।

সুতরাং ইমাম আযম রহ. সূক্ষ্ম ইলম দ্বারা সকল হাদীসকে একত্রিত করে আমলযোগ্য বানালেন। ফলে কোন হাদীসে তাবীল (বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন) ও তাওজীহ তথা দলিল-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হয়নি।

অথবা উদাহরণস্বরূপ সন্দেহের ব্যাপারে তিন রকমের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক প্রকার এমন যে, যখন সন্দেহ হবে কত রাকাত পড়েছি, তখন নামাযকে পুনরায় পড়া উচিত। ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَالْيَسْتَأْنِفْ

যখন কারো নামাযের রাকাতে সন্দেহ হয়, তখন নামায পুনরায় পড়ে নিবে।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, সন্দেহ হওয়ার সুরতে নামাযের ভিতর অনুসন্ধান শুরু করবে অর্থাৎ অনুমান করে চিন্তা করা উচিত কত রাকাত হয়েছে। যেদিকে প্রবল ধারণা যাবে, তার উপর আমল করা চাই। এমনটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনায় এসেছে–

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَلْيُتِمَّهُ

যখন তোমাদের মাঝে কারো নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখন সে অনুমান করবে এবং অনুমান দ্বারা (যেদিকে ধারণা প্রবল হবে) অন্তরে যা আসবে সে অনুযায়ী নামায পুরো করে নেয়া উচিত।

তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে, যখন সন্দেহ হবে এবং আন্দায দ্বারা প্রবল ধারণাও কোনো দিকে যায় না যে, তিন রাকাত হয়েছে না চার রাকাত হয়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় কমকে গ্রহণ করে তার উপর নামাযকে ভিত্তি করে নাও। আর তিন ও চার সংখ্যার মধ্যে তিন সংখ্যাটি সর্বাবস্থায় নিশ্চিত হবে। এজন্য নিশ্চিত দিককে গ্রহণ কর। এ-ব্যাপারে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রা.-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن

যখন তোমাদের মধ্য হতে কারো নামাযের রাকাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, তিন রাকাত পড়েছি না চার রাকাত পড়েছি। তখন সন্দেহকে ত্যাগ করে যা নিশ্চিত দিক (অর্থাৎ কর্ম সংখ্যা) তার উপর ভিত্তি করে নামায পড়ে নেয়া উচিত। *[মিশকাত]*

উক্ত তিন আহকাম হতে একেকটিকে এক একজন মুজতাহিদ গ্রহণ করেছেন। কেউ সন্দেহ হওয়ার সুরতে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম ইখতিয়ার করেছেন। তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান (প্রবল ধারণার উপর আমল) এবং সর্বনিম্নের উপর ভিত্তি করাকে নফী করে দিতে হয়। জুমহুর তথা অধিকাংশ

মুজতাহিদ অনুসন্ধান (তাহাররী) এবং প্রবল ধারণাকে ইখতিয়ার করেছেন। তাঁদের পুনরায় পড়া এবং কম সংখ্যকের উপর বেনা করার হুকুম পরিহার করতে হয়। কিন্তু যখন উক্ত তিন সুরত যা হাদীসসমূহে এসেছে ইমাম আযম রহ. সেগুলোকে 'জমে বাইনার রেওয়ায়েত' এর মূলনীতির অধীনে তিনটি আহকামকে এক সাথে গ্রহণ করে তিন প্রকার রেওয়ায়েতকে একত্রি করে দিয়েছেন। যদি জীবনের প্রথমবার সন্দেহ হয়, তাহলে তার জন্য নামায পুনরায় পড়ার হুকুম।

কারণ, বারবার সন্দেহ এবং নামায পুনরায় পড়ার দ্বারা যখন সন্দেহ বাস্তব হওয়া জরুরি হয়, তখন নামায জানের বোঝা হয়ে যাবে, যা সহজ দীনের বিপরীত এবং কঠিনতা শরীয়ত গ্রহণ করে না। আর যদি এক থেকে বেশিবার সন্দেহ পড়তে থাকে, তাহলে তাহাররী তথা অনুসন্ধানের বিধান। প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। আর যদি ধারণা কোনো দিকে প্রবল না হয় বরং উভয় দিকে সমান থাকে। তাহলে কম দিক গ্রহণ করতে হবে যা নিশ্চিত। এমতাবস্থায় নামায পুনরায় পড়া, তাহাররী করা এবং কর্মের উপর বেনা করা তিন হুকুম একত্রিত হয়ে যায়। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনোটাকে রদ, কোনটাকে গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না। যার ফিকহি আত্মা হলো এই যে, সন্দেহ হওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া, তাহাররী করা এবং কমকে ইখতিয়ার করা আসলে মূলত নিশ্চয়তা অর্জন এবং সন্দেহ দূর করার জন্য।

প্রকাশ থাকে যে, একেবারে প্রাথমিক সন্দেহ যা অপরিচিত রোগের মতো নামাযের মধ্যে হঠাৎ প্রকাশ হয়, তখন নামায পুনরায় পড়ার দ্বারাই নিশ্চয়তা অর্জন হয়। পিছনের সন্দেহযুক্ত নামায ত্যাগ করা হয়। কারণ, যার জন্য সন্দেহের রোগ নতুন সে প্রথমেই তার চিকিৎসার চিন্তা করতে পারে। তবে হ্যাঁ বারবার সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন অভ্যাসগতভাবে তার হাকিকত খুলে গেল এবং তা অভ্যাসে পরিণত হলো, সেজন্য নামাযে থাকাবস্থায় তার চিকিৎসা সম্ভব হলো আর তা হলো অনুসন্ধান এবং আন্দায করে প্রবল ধারণাকে জেনে নেওয়া। যেদিকে ধারণা প্রবল হবে, চাই তিন রাকাত হোক বা চার রাকাত হোক। সুতরাং ইমাম সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীসের তিন প্রকার আহকাম একে অপরের নফী ও রহিতকরণের জন্য হয় না। বরং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম বিধান বনে যায়, যাতে না থাকে বিরোধিতা, না থাকে রদ করা এবং তিনটি হাদীস নিজ-নিজ স্থানে সঠিক থেকে আমলযোগ্য হয়ে যায়।

মোটকথা, ইমাম সাহেব রহ. ইজতিহাদি রুচিবোধ-এ যথাসম্ভব বর্ণনাসমূহে

সনদের শক্তি ও দুর্বলতার মাপকাঠি থেকে প্রাধান্য ও নির্বাচনের সুরত গ্রহণ করেন না। কারণ, এ-প্রক্রিয়ায় কোনো না কোনো দিক থেকে হাদীস পরিহার বা হাদীসের উপর আমল পরিহার করা নিশ্চিতভাবে আবশ্যক হয়ে যায়। আর তিনি চান না যে, অতি দুর্বল হাদীসও পরিত্যাগ হোক। যার জন্য তিনি এ-প্রক্রিয়া ও তরিকা অবলম্বন করেছেন যে, এক অধ্যায়ের হাদীসসমূহে প্রথমে তিনি শারে আ.-এর উদ্দেশ্য ও লাভ অনুসন্ধান করেন। তারপর বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের উপর সকল হাদীস পরিবেষ্টন করেন। বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহে ইমাম সাহেবের উক্ত সমন্বয় এবং 'জময়ে বাইনার রেওয়ায়েত' নীতি এবং অন্যান্য ইমামগণের প্রাধান্য ও বর্ণনা ইল্লাতের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে, যার মধ্যে ফিকহে হানাফী ভরপুর। নমুনা হিসেবে এখানে দুটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

এ-দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যে, ইজতিহাদী মূলনীতিতে ইমামদের জন্মগত ও স্বভাবজাত রং ফুটে ওঠে। তবিয়তে জমইয়্যাত (ঐক্যবদ্ধকরণ) গুণ থাকলে জমইয়্যাতের মূলনীতি আবিষ্কার হবে। আর বাহ্যিকতা হলে মূলনীতিতে বাহ্যিকতার রং প্রকাশ পাবে। আর তবিয়তে পূর্বসূরীদের আমল গ্রহণ রুচিবোধ থাকলে মূলনীতিতে ওই রং প্রদর্শন হবে এবং সে রকম মূলনীতির উপর মুজতাহিদের সম্পূর্ণ ফিকাহ্ সংকলন হবে, যা দ্বারা মুকাল্লিদ ও ফিকাহ অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা এবং আমলের তরবিয়ত হবে।

অতএব উসূলের মধ্যে ইখতিলাফ হলে মুকাল্লিদের চিন্তা-চেতনার উপর আমলি জুযইয়্যাতের প্রভাবও বিপরীতমুখী পড়বে। যদিও প্রথম পর্যায়ে পর্যায়ে তার মাঝে জুযইয়্যাতি ভিন্নতা এবং বৈপরীত্য অনুভব না হয়। কারণ, এমনটি সম্ভব নয় যে, লালিত বস্তুর মাঝে লালন-পালন সামগ্রীর প্রভাব পড়বে না। অথবা উদাহরণস্বরূপ বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহে ইমাম আযম রহ.-এর একটি বিশেষ মূলনীতি এও ছিল যে, তিনি কোনো অধ্যায়ের এমন হাদীসকে যা কুল্লি হুকুম এবং ব্যাপক (রীতি-নীতি) ও আম নীতির রং থাকত, সেটিকে আসল স্থির করে। সেই অধ্যায়ের আংশিক কর্মগুলো যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত এবং সেই কুল্লিয়ার বিপরীতকে তার অনুগামী করেন। তিনি কুল্লিকে আনুষঙ্গিক ও আংশিক কর্মের কারণে পার হয়ে করতে চান না। কারণ, তা কোনো বিষয়ের ইল্লাত ও কারণ জানার মাধ্যম। আর আনুষঙ্গিক কর্ম কোন বস্তুর বাস্তবতা হয়, যাতে কোন ব্যাপকতা থাকে না। তাই তিনি কুল্লিকে মূলের উপর দাঁড় করিয়ে আনুষঙ্গিক কর্মের

এমন দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করেন। ফলে তা কুল্লির বিপরীত বা বিরোধী থাকে না।

কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীত। তারা উক্ত জুযইয়্যাতের আনুষঙ্গিকতার স্রেফ সনদের শক্তি দেখে সেগুলো থেকে কুল্লিকে বিশেষায়িত করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বাথরুমের আদব সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.-এর বর্ণিত হাদীসে একটি কুল্লি বিধান ইরশাদ করেছেন–

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

যখন তোমরা ইস্তিঞ্জার জন্য যাবে, তখন কিবলার দিকে পিঠ করে এবং মুখ ফিরে বসবে না। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমে ফিরে বসবে (যাতে কিবলা বগলের দিকে থাকে)। *[বুখারী ও মুসলিম]*

এটি একটি আম ও সাধারণ হুকুম, যাতে মুখকরণ ও পিঠকরণ কোনো স্থানের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি। কারণ, উক্ত হুকুম বাইতুল্লার সম্মানের জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে ঘৃণ্য কর্মের সময় কিবলার প্রতি মুখকরণ ও পিঠকরণ না হয়। এ কর্ম দ্বারা বাইতুল্লাকে তুচ্ছ করা হয়। আর বাইতুল্লাহর সম্মান জাতিগতভাবে হাসান ও সুন্দর এবং সর্বত্র ও সর্বযুগে কাম্য। অতএব, এ-বিধানের ইল্লাত অপর একটি হাদীসে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ–

اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة

যখন তোমাদের মাঝে কেউ ইস্তিঞ্জার জন্য যায়, সে যেন কিবলায়ে ইলাহীর সম্মান করে, তার দিকে মুখ করে না বসে। *[আত্তালিকুস্ সাবীহ, প্রথম খণ্ড, ১৯ পৃ.]*

সুতরাং 'বাইতুল্লাহর সম্মান' ইল্লাত দ্বারা পেশাব ও পায়খানার সময় কিবলার প্রতি মুখ ও পিঠকরণ নিষেধ ছিল এবং এ-ইল্লাত সত্তাগতভাবে কাম্য হওয়ার কারণে কোন শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি। তাই ইমাম সাহেব রহ. উক্ত কুল্লি হুকুমকে মাযহাবের ফাউন্ডেশন নির্ধারণ করে সাধারণভাবে কিবলার দিকে মুখকরণ ও পিঠ দেওয়া উভয়টাই নাজায়েয, যার জন্য উক্ত হাদীসকে

কুল্লি কানুন এবং কর্মপন্থা হিসেবে পেশ করেছেন। কিন্তু উক্ত কুল্লির বিপরীত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু আমল প্রমাণিত আছে।

এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নিজে হযরত হাফসা রা.-এর ঘরের ছাদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিবলার দিকে পিঠ করে এবং শাম দেশের দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি। ইমাম সাহেব রহ. আপন বিশেষ রুচিবোধ দ্বারা, যার চিন্তা-চেতনা কুল্লি বিধান এবং তালিমাতের প্রতিবেশী ধাবিত হয়। তিনি এ জুযইয়্যাত আনুষঙ্গিক বস্তু হতে প্রভাবিত হওয়া ব্যতীত কুল্লি বিধান তার স্থানে স্থির রেখেছেন এবং বাস্তব আনুষঙ্গিক বিষয়ের এমন দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তা আর কুল্লির বিপরীত হয়নি। কারণ, কুল্লির হুকুম যে ইল্লাতের উপর পরিবেষ্টিত অর্থাৎ তাজিমে বাইতুল্লাহ তা ঘর ও ময়দান সর্বত্র বিদ্যমান। অতএব, একে কেন বাস্তব আংশিক বস্তু দ্বারা খণ্ডন করা হবে, যার কোন ইল্লাত জানা নেই, কারণ জানা নেই। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ যাদের চিন্তা-চেতনা নির্দিষ্টকরণ এর দিকে বেশি ধাবিত হয়, তারা সেই কুল্লিয়াতের গুরুত্ব দেয়নি। বরং ইমাম শাফেয়ী রহ. জুযইয়্যাত কুল্লির সমপর্যায়ে বানিয়ে অথবা বাস্তব জুযয়ী থেকে সাবেক কুল্লিকে খাস করে বলেন, কিবলার দিকে মুখকরণ ও পিঠকরণ ঘরের ভিতর জায়েয, ময়দানে জায়েয নেই। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, পিঠকরণ সর্বত্রই জায়েয আর মুখকরণ সর্বত্রই না-জায়েয।

যাহোক, এ-ইখতিলাফ ওই ইস্তেম্বাত মূলনীতির ইখতিলাফের অধীনে যে অন্যান্য ইমামগণ শুধু হাদীসের হুকুমের প্রতি লক্ষ করেন আর ইমাম আযম রহ. হাদীসের হেকমতের প্রতি লক্ষ করেন। অন্যরা হাদীসের বাহ্যিকতা গ্রহণ করেন আর ইমাম সাহেব রহ. হাদীসের বাতেনকে অগ্রে রাখেন। তিনি শারেঈ আ.-এর এ উদ্দেশ্য পেয়ে যে, আসল মাকসুদ হলো বাইতুল্লাহর সম্মান। তিনি তাকেই ভিত্তি স্থির করলেন। এখন যে সমস্ত বর্ণনা এর বিপরীত হলো, সেগুলোর কারণে তিনি বুনিয়াদকে ধ্বংস হতে দেননি। বরং সেগুলোকে বুনিয়াদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

অতএব একজন মুকাল্লিদ যে উক্ত মাসয়ালার কোন ইমামের তাকলিদ করবে, সে বাস্তবে উল্লিখিত মূলনীতির তাকলিদ করবে, যা এ মাসয়ালার ভিতর লুকিয়ে আছে। যখন সেগুলোতে ইখতিলাফ হবে তখন জুযইয়্যাতের মধ্যেও ইখতিলাফ হবে। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম সাহেব রহ. কখনও কখনও কোন অধ্যায়ের আসল আলোচ্য বিষয়ের আত্মা উদঘাটন করেন, যা কিতাব ও

সুন্নাতের নুসুস দ্বারা বুঝতে পারেন। তখন তাকে মূলনীতি স্থির করে ওই অধ্যায়ের সকল রেওয়ায়েত নির্বাচন করে মানদণ্ড নির্ধারণ করেন সেই রূহকে এবং বিপরীত রেওয়ায়েতের এমন বিশদ বর্ণনা দেন, যার ফলে উক্ত রূহের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ উদাহরণস্বরূপ উক্ত অধ্যায়ের অন্যটি বোঝেন। ফলে রূহের ভিন্নতার কারণে আহকামে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়।

যেমন নামায সম্পর্কে যে সকল করণীয় ও বর্জনীয় হাদীস এসেছে, সে ক্ষেত্রে ইমামে আযম রহ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জনীয় হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন। আর করণীয় হাদীসগুলোকে অনুগামী করেছেন। যেমন, ইমামের পেছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং না পড়া উভয়টি হতে না পড়াকে গ্রহণ করেছেন, রাফেঈ ইয়াদাইন করা এবং পরিহার করা তা থেকে তিনি পরিহার করা ইখতিয়ার করেছেন। জোরে আমিন বলা ও আস্তে আমিন বলা হতে আস্তে বলাকে গ্রহণ করেছেন, জেরে বিসমিল্লাহ বলা এবং আস্তে বলা এ-থেকে আস্তে বলা ইখতিয়ার করেছেন। নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার জন্য জময়ে বাইনাল ইরশাদ ও তাসবীহ-এর স্থলে এ-গুলোকে পরিহার করাকে ইখতিয়ার করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সাহেব রহ. নামাযের ব্যাপারে বর্জনীয়কে করণীয়র উপর অথবা চুপ ও নীরব থাককে নড়াচড়া ও আওয়াজ করার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। হতে পারে এই ভিত্তিতে যে, ইমামের নিকট নামাযের ভিত্তি স্থিরতার উপর, নড়াচড়া করার উপর নয়। আর এ-সূক্ষ্মতা ইমামের নিকট উন্মোচন হয়েছে আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নামাযের মূল সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ইরশাদ–

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

নামায খুব ভারী জিনিস কিন্তু খুশু অবলম্বনকারীদের উপর নয়। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৪৫]*

খুশুর হাকিকত হলো নীরবতা, যা প্রথমে কালবে আসে, তারপর দেহে পরিলক্ষিত হয়। তারপর ইমাম সাহেব রহ. নামাযের শরয়ী পদক্ষেপের প্রতি নজর দিয়েছেন যে, নামায নড়াচড়া হতে নীরবতার দিকে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে নামাযে নড়াচড়া ও হাঁটাচলা জায়েয ছিল। পরবর্তীতে হাদীসের প্রকাশ্য বিধান তথা নস্ দ্বারা রহিত হয়েছে। ফলে স্থিরতা ও নীরবতা এসেছে। প্রথমে নামাযে সালাম ও কালাম জায়েয ছিল, পরবর্তীতে

হাদীসের নস্ দ্বারা তা থেকে ফিরিয়ে চুপ ও নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো জায়েয ছিল। পরবর্তীতে রহিত হয়েছে। প্রথমে নেশাগ্রস্ত নড়াচড়াসহ নামায জায়েয ছিল। পরে সেগুলোকে রহিত করে নামাযে নীরবতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাহোক, শরয়ী পদক্ষেপের ফলে নামায নড়াচড়া থেকে নীরবতার দিকে আসার ছিল। তাই ইমাম সাহেবের পরিষ্কার ও পবিত্র কাল্‌ব যা শরয়ী রঙের ফাউন্ডেশন এবং শরীয়তের উর্বর ভূমির পবিত্র সূক্ষ্মতার ভাণ্ডার ছিল একথা ধারণ করলেন যে, নামাযের মধ্যে আসল ও মূল বস্তু হলো নীরবতা। অতএব, নীরবতা যত উন্নতি করবে ততই নামাযের হাকিকত থেকে উপকার লাভ করা বৃদ্ধি পাবে। শারেঈ আ.-এর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইমাম সাহেবের নিকট যখন করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে ইখতিলাফ ও প্রতিযোগিতা নজরে পড়ল, তখন তিনি ওই শরয়ী পদক্ষেপ এবং ইজতিহাদী রং তথা মূলনীতির সহযোগিতায় নীরবতার সাইডকে প্রাধান্য দিলেন এবং ওই সকল রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করলেন, যেগুলো সে রংয়ে রঙিন ছিল। তাঁর নিকট এ-রেওয়াতগুলো শারেঈ আ.-এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বেশি উপযুক্ত ছিল। চাই সেগুলোর সনদ যে পর্যায়ের হোক। কিন্তু দলিলও প্রতিবাদযোগ্য। আর ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর বিপরীত করণীয় ও বর্জনীয় বর্ণনাগুলোতে সাধারণ করণীয় বর্ণনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ফাতেহা পড়া গ্রহণ করেছেন, রাফয়ে ঈয়াদাইনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, প্রকাশ্য আমিনকে নির্বাচন করেছেন। জোরে বিসমিল্লাহ পড়াকে উত্তম বলেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাতে অনুমান হয় যে, ইমাম শাফিঈ রহ. নামাযের বর্তমান রূপের উপর গবেষণা করে তাকে কর্ম মনে করেছেন। আর নামায যেহেতু করণীয় কাজ তাই তাতে কর্ম যত বেশি হবে, ততই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

হজ্বের মাঝে এর বিপরীত ও সম্পূর্ণ উল্টো কাহিনী। ইমাম সাহেব রহ. লক্ষ করলেন, হজ্বের ইবাদতই হলো নড়াচড়া করা। ঘর থেকে বের হওয়া, বাইতুল্লহে চক্কর লাগানো, সাফা ও মারওয়ার দৌড়ানো। আরাফাত ময়দানে ভ্রমণ করা, মিনার পাথর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। মোটকথা, সম্পূর্ণ ইবাদাতটি একটি পৃথক সফর এবং বিভিন্ন রকমের নড়াচড়ার সমষ্টির নাম। অতএব যত কর্ম এবং নড়াচড়া বেশি হবে ততই হজ্বের সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। সেজন্য হজ্বের ইবাদতে ওই রেওয়ায়েতগুলোকে প্রাধান্য দিলেন, যাতে নড়াচড়া ও কর্ম রয়েছে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বিপরীত। তিনি হজ্বের আমলে সম্পূর্ণ উল্টো নীরবতা এবং কম নড়াচড়ার সাইডকে ইখতিয়ার করলেন। সম্ভবত ইমাম

শাফিঈ রহ.-এর নিকট হজ্ব হলো ইশক ও মহব্বতের প্রদর্শনী আর মহব্বতের ফল হলো পরিহার করা এবং শরীর জীর্ণশীর্ণ হওয়া, দেশত্যাগ, পোশাক ত্যাগ, সৌন্দর্য পরিত্যাগ, সুগন্ধি পরিহার, আরাম-আয়েশ ত্যাগ, সাদ ত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি সেজন্য হজ্বের ইবাদাতে যতই বর্জনীয় ও পরিত্যাগ হবে ততই তার হাকিকত্ব পূর্ণ হবে। উদাহরণস্বরূপ হজ্জে কিরানে ইমাম সাহেবের নিকট দুই তাওয়াফ এবং সাঈ। আর ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিকট এক তাওয়াফ ও এক সাঈ। ইমাম সাহেব রহ. অধিক কর্ম গ্রহণ করেছেন আর শাফিই রহ. কম করণীয় গ্রহণ করেছেন। এমন প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত ফিকাহর কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। আর অন্যরা হুকুম দেখেন। তারা হুকুমকে মূলনীতি স্থির করে রেওয়ায়েতের প্রতি নজর দেন। এতে আহকামে তো আধিক্য এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সুদৃঢ় ধারাবাহিকতা এবং সুবিন্যস্ততা এমন হয় না যে, প্রত্যেক অংশ কোনো না কোনো উসূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায় এবং প্রতিটি হুকুম কোনো না কোনো হেকমতের সাথে সম্পর্কিত মনে হয়।

প্রকাশ থাকে যে, বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক হয়। অন্যদিকে আহকামের আধিক্য, হানাফী মাযহাবে তারতিব ও ধারাবাহিকতা এবং সামষ্টিকতা ও ঐক্যবদ্ধতার রং প্রবল থাকে। আর অন্যদের ফিকাতে আহকামের আধিক্য এবং জুযইয়্যাতের সংখ্যাধিক্যের রং প্রবল থাকে আর কুল্লিয়াতের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকাশ থাকে যে, যখন এ-বিশেষ রঙের মূলনীতি নিজ নিজ ফিকাহর সকল অধ্যায় এবং সকল ইজতিহাদী শাখাসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। যদি এক ফিকাহর সকল মাসায়েলের গঠন-আকৃতি একই রঙের উসূল করবে, তখন সম্পূর্ণ ফিকাহর মধ্যে একটি মেজাজ কায়েম হবে, যা আপন ইমামের চিন্তচেতনার মেজাজ মোতাবেক হবে। তারপর ওই চিন্তা-চেতনার মেজায তাদেরও হবে, যারা উক্ত ফিকাহর তাকলিদ করবে। কারণ, পালিত (বস্তুর) ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, পালনকারীর চিন্তা-চেতনা দ্বারা গঠিত হয়।

এমতাবস্থায় দুই ফকীহর জুযইয়্যাত ও উদ্ভাবিত ফিকাহ যতই মিল থাকুক এবং প্রকাশ্যরূপে যতই তানাকুয থেকে মুক্ত থাকুক। কিন্তু এ-রুচিবোধের রং এবং আবিষ্কৃত মূলনীতির তানাকুয সেগুলোর মাঝে জড়িয়ে সেগুলোকে মূলনীতিগতভাবে বৈপরীত্য বানিয়ে ফেলবে। আর একথা আমি বলে এসেছি যে, তাকলিদ মূলত জুযইয়্যাতের আড়ালে ওই উসূলের হয়ে থাকে, যা সেই জুযইয়্যাতকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। আর সেই উসূল পরস্পর বিরোধী।

অতএব ওই বৈপরীত্য, বৈপরীত থেকে যারা জুযইয়্যাত ও কুল্লিয়ার কোনটাই হিসেবে সঠিক থাকবে না যেহেতু উসুল ও কুল্লিয়াতই মূলত তাকলিদের স্থান।

অতএব বিশেষ বিবেচনায় মূলনীতির বৈপরীত্য কঠিন বৈপরীত্য। কারণ, জুযইয়্যাত তাকলিদ হিসেবে আসল নয়। আসল তাকলিদ উসূল ও মূলনীতিতে। আসলের ফাসাদ (ধ্বংস) শাখার ফাসাদ হতে যুক্তিগত ও শরয়ী দৃষ্টিকোণে অধিক ধ্বংসাত্মক হয়। অতএব, এহেন উসুলী ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও একসাথে দুজন ফকীহর ফিকাহকে তাকলিদ করা এবং অন্য ভাষার এক ফিকায় লালিত-পালিত হওয়া অবস্থার অন্য ফিকাহর তরবিয়তী রং তার উপর ছড়ানো, তরবিয়তের দুটি কার্যকরী এবং বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করা, এছাড়া ভিন্ন নয় যে, প্রত্যেক লালন-পালনকারী ইমামের তরবীয়কে অসম্পূর্ণ এবং নিষ্কর্মা বানিয়ে ফেলা।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম অবুহানিফা রহ. যদি তাঁর আবিষ্কৃত মূলনীতির উপর, নামাযের মাধ্যমে নীরবতা এবং হজ্জের মাধ্যমে নড়াচড়ার রুচি ফিকাহ বাহকদের মধ্যে সুদৃঢ় করতে চান। আর ইমাম শাফিঈ উভয় পক্ষের নীরবতা ইবাদাত দ্বারা গ্রহণ করল। তাহলে প্রথমত তো তার কোন ইমামের রঙে তার পরিপূর্ণ তরবিয়ত হলো না। অসম্পূর্ণরূপে যতটুকু হয়েছে, তাও দুমুখী স্থানের স্রেফ একই সাইডের (নীরবতা) উপর শামিল রয়েছে। অর্থাৎ এই মুকাল্লিদ ও অসম্পূর্ণ থাকল এবং এক সাইড বুঝতে বাকি রইল। আর সর্বোপরি কুল্লিগত বিপরীত অবস্থার শিকার হল, যা তার মেজাযকে নষ্ট করার পরিপূর্ণ সামান।

উক্ত বিষয়টি একেবারে এমন যে, একজন রোগী ইউনানী ডাক্তারের চিকিৎসা চলা অবস্থায়, এ্যালোপ্যাথিক কোন ডাক্তারের ঔষধও ব্যবহার করতে লাগল। প্রকাশ থাকে যে, ঔষধের মাঝে কোন বিরোধ নেই; কিন্তু ঔষধের গোপন সম্পর্ক থাকে চিকিৎসাপদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপত্র বলা উচিত এমন উসূলী ও মূলনীতি বৈপরীত্য অবশ্যই রয়েছে, যা রোগীর মেজাযকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। কারণ, ডাক্তার নিজের মূলনীতি এবং চিকিৎসা পদ্ধতির অধীনে উদাহরণস্বরূপ রোগীকে দুধপান করার তাকিদ করবেন।

হাকীম নিজের ইউনানি বিষয়ের চিকিৎসাপদ্ধতি অনুপাতে দুধপান করা হতে ফিরাবে। ডাক্তার ফল আহারকে জরুরি বলবেন। আর ডাক্তার তা থেকে নিষেধ করবেন। ডাক্তার এক প্রকার খাবার নির্ধারণ করবেন এবং ডাক্তার তার বিপরীত অন্য খাবারের কথা বলবেন। মোটকথা, এক প্রকার আংশিক ঔষধ ব্যবহার করার মধ্যে প্রকাশ্যরূপে তো কোনো অসুবিধা অনুভব হয়

না; কিন্তু এ-ঔষধ যে সমষ্টিগত পদ্ধতি এবং যে ডাক্তারি মূলনীতির অধীনে তৈয়ার হয়েছে। তা অবশ্যই ওই পদ্ধতি ও মূলনীতির বিপরীত, যা ইউনানি চিকিৎসার ঔষধে রয়েছে। এ-একটি আংশিক ঔষদের রাস্তা ধরে ওই মূলনীতি ও পদ্ধতিগত বৈপরীত্য রোগীর উপর প্রভাব ফেলবে এবং রোগী এমতাবস্থায় বেশি দিন নিজের কল্যাণ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই গোপন ক্ষতিকে সর্বসাধারণ নয় বরং শুধু ডাক্তারগণই চিনতে পারবেন, যাদের কথার উপর ভরসা করা ব্যতীত ক্ষতি থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, উপায় নেই।

তাকলিদ না করা অথবা বিপরীতমুখী তাকলিদে চলার কারণে কয়েকটি প্রকাশ্য বাহ্যিক ক্ষতি

সাথে-সাথে একথা চিন্তা করতে হবে যে, এ-সুবিধাবাদিতা এবং পরস্পর বিপরীতমুখী পথে চলার অভ্যাস এর স্বভাবজাত প্রভাব আরো এক প্রকার ক্ষতিকর দিক এই যে, সেই ব্যক্তি কয়েকজন ইমাম এবং মুফতিদের দিকে মনোনিবেশ করা অবস্থায় আপন নফসের জন্য সহজতা অন্বেষণের অভ্যাস গড়ে উঠবে। সে যেদিকে সহজতা দেখবে, সেখান থেকে ফতোওয়া গ্রহণ করবে এবং ওদিকের মুকাল্লিদ বনে যাবে। এমতাবস্থায় এ-অনির্ধারিত তাকলিদ প্রবল প্রবৃত্তি কামনার অধীনে তার উদ্দেশ্য পূরণের একটি যন্ত্র এবং মাধ্যম হবে। আর সে কয়েকজন ইমামের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে নিজের নফসেরই তাকলিদ করবে। তার সামনে আল্লাহর আনুগত্য থাকবে না। বরং শুধু নিজের আরাম, আয়েশ সহজতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ একব্যক্তি ওযু করল, তারপর রক্ত বের করল, যার কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে অযু ভঙ্গ হয়ে গেছে। তখন সে বলল, আমি ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ফতোওয়া গ্রহণ করলাম যে, রক্ত বের হলে ওযু ভাঙ্গে না। তারপর খাহেশাতের সঙ্গে মহিলার গায়ে হাত লাগাল, যার কারণে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিকট ওযু ভেঙ্গে যায়। তখন সে বলল, ইমাম আবু হানীফার ফতোওয়া মানি যে, এতে ওযু ভেঙ্গে যাবে না। সে নতুন ওযু ব্যতীত নামায পড়ে নিল। এই লোকটির ওযু যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে ভেঙ্গে গেছে, যদিও সবার মত ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে, সেজন্য সবার নিকট তার নামায হয়নি। কিন্তু সে নিজেকে এখনও অযুকারী ও নামাযকারী ভাবছে। ফলে সে ঐকমত্য নষ্ট করা ছাড়াও তার সকল তাহকীক ও তাকলিদের অর্জন হলো

নাফসের আনন্দ উপভোগ এবং উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেমন যেন তার দীন তার প্রবৃত্তির অনুগামী হলো, তার নাফস ও প্রবৃত্তি দীনের অনুগামী হয়নি।

এ-ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে–

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ ঈমানদার হতে পারে না। যতক্ষণ না তার খায়েশ আমার আনীত দীন ও শরীয়তের অনুগামী হবে।'

অতঃপর শরীয়তের শাখা বিষয়ে এ-ধরনের স্বাধীন চেতনার অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে দীনের মূলনীতিতে আযাদী চেতনা আসতে দেরি হবে না। বরং অভ্যাসে পরিণত হবে। অথচ হাদীসের প্রকাশ্য নস্ দ্বারা বোঝা যায়, প্রবৃত্তির কামনায় লিপ্ত ব্যক্তি পরিশেষে হারামে লিপ্ত হয়।

যাহোক, এহেন সাধারণ মুকাল্লিদ, যে অনির্ধারিত ও অনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন ইমামের তাকলিদ করায় অভ্যস্ত হয়, সে অবশ্যই বৈপরীত্যের মধ্যে পড়ে থাকবে। চাই সেই তানাকুয জুযইয়্যাতি বস্তুতে হোক বা কুল্লিয়াতি বস্তুতে হোক। পাশাপাশি ওই বিরোধপূর্ণ ইজতিহাদের প্রভাবে তার রুহানী মেযাজও নষ্ট হয়ে যেতে বাকি থাকবে না। অথবা তার নফসের খায়েশ দীনের উপর প্রবল হবে। অথবা সে আল্লাহর রেজামন্দির তালাশকারী থাকবে না। অথবা উম্মতের ঐক্যের ফাঁস ও বন্ধনকে গলা থেকে নিক্ষেপ করে ফেলবে।

আর আনুষঙ্গিক বস্তুর আযাদীর ফলাফল উসূল তথা মৌলিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং উসূলকেও খায়েশ পূরণ এবং উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম বানিয়ে পরিশেষে সম্পূর্ণ দীনকে নষ্ট করে ফেলবে। এ কারণেই রূহানী তরবিয়ত এবং আত্মার চিকিৎসার ব্যাপারে, যাদের ডাক্তার হলো আম্বিয়া আ.। এক নবীর শরীয়তের উপর আমল করা অবস্থায় অন্য শরীয়ত এবং নবীকে সত্য জানা সত্ত্বেও তার উপর আমল করার বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আদব প্রদর্শন তো এতটুকু যে, একজন নবী এবং তার শরীয়তকে অস্বীকার উপর পূর্ণ দীন নষ্ট ও বিফল হয়। কিন্তু সতর্কতা এর উপর যে, ওই নবীর শরীয়তের একটি অংশের উপরও বর্তমান নবীর অনুমতি ব্যতীত আমল করা জায়েয নেই। আর নিষেধ হওয়ার রহস্য এই যে, প্রত্যেক শরীয়তের তরবিয়ত ও লালন-পালনের রং ভিন্ন-ভিন্ন। আত্মার ভিতর ওই বিপরীত

প্রভাব প্রবেশ করার দ্বারা আত্মা ধ্বংস হবে, শক্তিশালী হবে না। সুতরাং যখন হযরত উমর ফারুক রা. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে এমন খেয়াল প্রকাশ করলেন যে, ইয়াহুদীদের কিছু কথা আমার নিকট অনেক ভালো মনে হয়। যদি অনুমতি হয় তাহলে লিখে নিতে পারি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية . ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي

তোমরা কি নিজেদের দীনের বিধিবিধানের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত দিশহারা ও হতবুদ্ধিতার লিপ্ত যে, অন্যদের কথা লিখতে চাও? নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ ও আলোকিত শরীয়ত নিয়ে আগমন করছি। যদি মুসাও আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তারপরও তোমাদের জন্য তাঁর শরীয়তের ইত্তেবা কখন জায়েয হলো? *[আহমাদ ও বায়হাকী]*

উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে বাতেনী জগতের মুরুব্বীগণ, সুফী-সাধনগণ নিজেদের তরবিয়তী তরিকার বুনিয়াদও একক উদ্দেশ্যের উপর রেখেছেন, যার সারকথা হলো, এক শায়েখের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও জড়িত হয়ে অন্য শায়েখের প্রতি আমলি রুজু (মনোনিবেশ) আত্মাধ্বংসের কারণ। আদব ও তাজিম নির্বিশেষে সকলের জন্য আবশ্যক। কিন্তু অনুসরণ করতে হবে একজনের। কারণ, প্রত্যেক বাতেনী মুরুব্বীর জাতিগত অবস্থা ভিন্ন। তা থেকে সৃষ্টি হওয়া উসূলী তরবিয়তের রংও ভিন্ন ভিন্ন। আর সেই রং অনুযায়ী তরবিয়তপ্রাপ্তদের নফসের আত্মার উপর হালত ও কাইফিয়্যাতেও সেই রঙের প্রভাব বিস্তার করা জরুরি।

অতএব, যদি তাওহীদে একক উদ্দেশ্য অবশিষ্ট না থাকে, বরং সাগরেদ ও সালেক আপন রঙের সহযোগিতায় বিভিন্ন মাশায়েখদের মাঝে চলতে-ফিরতে থাকে, তাহলে তার মাঝে একাগ্রতা, একক রঙ্গ এবং নিশ্চিন্ততার দৌলত কখনও সৃষ্টি হতে পারে না, যা সকল কামালাত গুণের ফাউন্ডেশন। সেজন্য তার সারাজীবন প্রফুল্লতা ও সম্মান-মর্যাদা কোনটিই অর্জন হবে না, যার জন্য সমস্ত রিয়াযাত ও সাধনা করা হয়। সারকথা হলো, তরীকে নবুওয়ত হোক অথবা তরীকে বেলায়েত হোক উভয়টির মধ্যে তাওহীদে তরবিয়তের কাজ

চলতে পারে না। তারপর ওই তরিকার আলোকে শারীরিক ডাক্তারদেরও একক চিকিৎসার পদ্ধতি ইখতিয়ার করতে হয়। তাছাড়া রোগীর সুস্থতার আশা করা যায় না।

সুতরাং ইন্তিযাম (বন্দোবস্ত) আম্বিয়া আ.গণ নিজেদের তরবিয়াত শানকে প্রভাবিত করার জন্য করেছেন, আউলিয়াগণ নিজেদের শানে চিকিৎসা কামিয়াব বানানোর জন্য করেছেন, ডাক্তারগণ নিজেদের চিকিৎসাপদ্ধতিকে ফলদায়ক করার জন্য করেছেন, যাকে তাওহীদে মতলক বা তাওহীদে মুত্তাব বলে।

একই ইন্তেযাম ফুকাহায়ে মিল্লাতগণ নিজেদের শরয়ী পথপ্রদর্শনী এবং দীনি তরবিয়তকে প্রভাবান্বিত ও ফলপ্রসূ বানানোর জন্য বলেছেন। তারা নিজেদের তাওহীদে মতলকের নাম তাকলিদে শখসী বা নির্দিষ্ট তাকলিদ রেখে এ-শরয়ী হাসপাতাল খুলেছেন যে, একই ফিকাহকে নিজেদের জীবনবিধান স্থির করে এবং কয়েকটি ফিকাহ এবং ফকীহদের বিভিন্ন তরবিয়তের প্রভাবের শিকার না হয়ে নিজেদের দীনের উপর একাগ্রতা ও প্রশান্ততার সাথে আমল করবে। অন্যথায় দুশ্চিন্তা ও ভীতসন্ত্রস্ততা এবং ফাসাদ হতে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই।

এ-কারণে সর্বোত্তম যুগ অতিক্রম হওয়ার পর উম্মতের বুদ্ধিজীবীগণ জাতির শৃঙ্খলা কায়েম রাখার জন্য এবং জাতিকে অনৈক্য ও দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচানোর জন্য নতুন ইজতিহাদ ও তাকলিদের বিশেষ এক নিযাম প্রতিষ্ঠা করেন। তারা জাতিকে ইজতিহাদ কর্মে স্বাধীনতা দেননি যে, যাকে মন চায় এবং যত মন চায় তাকলিদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করবে। বরং ইজতিহাদের সীমারেখা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন সৃষ্টিগতভাবে সীমাবদ্ধ ছিল তেমন তাকলিদের পরিধিকে সংকীর্ণ রেছেন। যেমন তা যুক্তিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল যে, অনির্দিষ্ট হবে না এবং নির্দিষ্ট হয়েও এমন ব্যক্তিত্বদের হবে যারা ইলম ও আমল, তাকওয়া ও পরহেজগার, শরীয়ত অনুভব, ইলমে লাদুন্নি, বিশেষ উপলব্ধি ও আহকাম উপলব্ধি, ইল্লাত ও রহস্যভেদ আবিষ্কার, জাহের ও বাতেন জ্ঞাত হওয়া, জুযইয়্যাত ও কুল্লিয়াত অনুভব করায় শরীয়তে একক ব্যক্তিত্ব হয়, দক্ষ ও বুদ্ধিমান হবে, সর্বোপরি তার ইলমি ও আমলি শক্তি, আসবাবের ঊর্ধ্বে হয়ে একজন আল্লাহপ্রদত্ত হবেন, যার সহযোগিতায় (অধীনে) তারা নিম্নের আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তি হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۖ وَ كَانُوْا بِأٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ○

তারা সবর করত এবং আমার আদেশে পথ পদর্শন করত বিধায় তাদের নেতা বানালাম, তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় ঈমান রাখত। *[সূরা সিজদাহ : আয়াত ২৪]*

এখানে সবর শব্দ দ্বারা আমল শক্তির প্রতি ইঙ্গিত। সকল ইবাদাতের উৎসস্থল হলো সবর অর্থাৎ আনুগত্যের উপর সবর করা। আর খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির উপর সবার দৃঢ়পদ হওয়া, যা সাধারণ আমল হতে উর্ধ্বে, যাকে হাদীসে জিব্রাঈলে ইহসান শব্দ করা ব্যক্ত করা হয়েছে। এদিকে ইয়াকীন শব্দ দ্বারা ইলমি শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উলুমের ফাউন্ডেশন হলো সত্য বিশ্বাস। অর্থাৎ তা পূর্ণ শরীয়ত এবং তার জুযয়ী ও কুল্লি মাকসাদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সাথে মারেফতের আসনে পৌছা, যা ঈমানের উর্বর মর্যাদা, যাকে ইতমিনান (প্রশান্তি) শব্দে ব্যক্ত করেছে।

পূর্বসূরীদের মাঝে নির্ধারিত তাকলিদ ব্যাপক ছিল

সুতরাং সালফ্ (পূর্বসূরী) থেকে খালফ্ (উত্তরসূরী) পর্যন্ত চারিত্রিক মাসায়েলে সমস্ত মানুষের নির্ধারিত তাকলিদ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। আর এর অস্তিত্ব সাহাবাদের থেকে সূচনা হয়েছিল। যেমনটি হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ–

إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

আমার জানা নেই তোমাদের মাঝে আর কত দিন জীবিত থাকব? অতএব আমার অবর্তমানে এই দুজনের আনুগত্য কোরো। ইশারা করলেন আবু বকর ও উমর রা.-এর দিকে। *[তিরমিযি]*

প্রকাশ থাকে যে, 'আমার পরে' দ্বারা তাঁদের খেলাফতকাল উদ্দেশ্য। কারণ, খেলাফত ছাড়াও তো তাঁরা দুজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত ছিলেন। এতে বোঝা যায়, তাঁদের খলিফা হওয়া অবস্থায়

তাঁদের আনুগত্য করা। আর একথা সুস্পষ্ট যে, খলিফা একজনই হবেন, একসাথে দুজন হবেন না।

সারকথা হলো, সিদ্দীকে আকবর রা.-এর খেলাফতকালে তাঁকে এবং ফারুকে আযম রা.-এর খেলাফতকালে তাঁকে ইত্তেবা কোরো। অতএব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একজন নির্ধারিত ব্যক্তির ইত্তেবা করার দীনি আদেশ করেছেন। একেই তাকলিখে শখসী বলে যে, কোনো আমলি মাস্আলায় সমস্যা প্রকাশ হওয়ার পর কোনো এক আলেমের প্রতি রুজু করে তার ফতোওয়ার উপর আমল করা। কিন্তু দলিল-প্রমাণ জিজ্ঞেস করার কোনো অভিযোগ থাকত না। সুতরাং মানুষের প্রশ্ন যে তাদের যে সমস্ত ফতোওয়া বিভিন্ন বর্ণনাতে উল্লেখ রয়েছে, তাতে না আছে দলিলের কোনো প্রশ্ন, না আছে প্রকাশ্য কোনো দলিল। তাই তাকলিদে শখসী ছিল যে, একজনের উপর সারাদেশ একত্রিত হয়ে যেত এবং দলিল চাওয়া ব্যতীত তাঁর ফতোওয়ার উপর আমল করত।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা হযরত আবু মুসা আশ্আরী রা. এর নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর একই মাসয়ালা হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি হযরত আবু মুসা রা.-এর বিপরীত বললেন। যখন হযরত আবু মুসা রা. জানতে পারলেন, তখন বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইবনে মাসউদ রা.-এর মত জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থকাবেন. তোমরা আমার নিকট কোন মাস্আলা জিজ্ঞেস করবে না। প্রকাশ্য কথা হলো, লোকদের তামাম মাস্আলার মধ্যে একদিকে মনোনিবেশ করানো এবং লোকদেরকে তার উপর আমলদার বানানো, যাতে কোনো দলিল-প্রমাণ চাওয়ার প্রশ্ন নেই, তাকেই বলে তাকলিদে শখসী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলিদ।

মদিনাবাসী সাধারণত হযরত যায়েদ ইব্ন সাবেত রা.-এর ফতোওয়ার উপর আমল করতেন। অতএব, হযরত ইকরামা রা.-এর রেওয়াত, যা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে বললেন আমরা যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর বিপরীত আপনার কথার উপর আমল করব না। এতে প্রমাণিত হয় যে মদিনাবাসীদের ইমাম ও মুফতি ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা.। আর লোকেরা তাঁর কথামত আমল করত। চাই তিনি নস্ থেকে হুকুম দিতেন, চাই নস্ না থাকবস্থায় কিয়াস থেকে হুকুম দিতেন।

হযরত উসমান গনি রা.-এর সাত হুরুফের কুরআনকে এক হরফের

সংক্ষিপ্ত করা এবং ইসলামি বিশ্বের সকল সাহাবা রা. ও তাবেঈদের তা কার্যকরীরূপে গ্রহণ করে নেওয়া তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলিদ নয় তো কি ছিল? কারণ, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো হাদীসের হুকুম বিদ্যমান ছিল না। একটি ইল্লাতের উপর যাকে হযরত উসমান গনি রা.-এর বোধশক্তি উপলব্ধি করেছিলেন, সেই হুকুম চলমান ছিল। যখন তাঁর নিকট ওই ইল্লাতে সময় শেষ হয়ে গেল, তখন সাত হরফের হুকুমও শেষ হয়ে যায়।

অতএব উক্ত রেওয়ায়েতের শব্দাবলির উপর গভীর চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয় যে, ওই কিয়াসী হুকুমকে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং কেউ দলিল-প্রমাণ তালাশ করেননি। এমনিভাবে আরো কিয়াসী আহকামেও সাহাবাদের যুগে তাকলিদে শখসী করা হয়েছে। যেমনটি হযরত উমর রা.-এর ঘটনা ইতিপূর্বে পেশ করেছি যে, হযরত উমর রা. শস্যদানাকে এই শর্তে করজ দিতে অপছন্দ করেন যে, সে তা অন্য শহরে আদায় করবে এবং বলেছিলেন, মাল পরিবহনের ভাড়া কে বহন করবে? সেই ফতোওয়ার উপর মানুষ আমল করেছিল। আর তিনি উক্ত ফতোওয়া কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন। কারণ, সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নস্ বিদ্যমান ছিল না।

অতএব, তাকলিদে শখসীও হয়েছে এবং কিয়াসী হুকুমেও হয়েছে।

যাহোক তাকলিদে শখসীর আমল সাল্‌ফের যুগেও প্রচলিত ছিল। আজ যেহেতু লোকেরা বিভিন্ন প্রকার ইলমি ও আমলি এবং সার্থক কর্মের শিকার, যেগুলোর বিশদ বর্ণনা একটু পূর্বে করা হয়েছে। ইজতিহাদের আযাদী দ্বারা সন্দেহের ফিৎনা ছড়িয়ে পড়ে আর তাকলিদের আযাদীদের দ্বারা খাহেশাতের ফিৎনা ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাতে ওয়াজিব হওয়ার শান সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, তা ওয়াজিবের শিরোনাম হয়েছে। আর তা ছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বেঁচে থাকা অভ্যাসগতভাবে দুরুহ হয়ে গেছে। সেজন্য তাকলিদের শখসীও জরুরী ও আবশ্যক হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়াজিব বিল গাইর (অন্য কারণে ওয়াজিব) প্রথম যুগে উক্ত সন্দেহ ও খাহেশের ফিৎনা প্রকাশ্যমান ছিল না। সেজন্য সেকালে নির্দিষ্ট তাকলিদ জায়েযের পর্যায়ে ছিল। আর আজ যেহেতু বিস্তৃত প্রসারিত, তাই ওয়াজিবের পর্যায়ে।

সারকথা, মুত্বলাক (সাধারণ) তাকলিদ এবং নির্দিষ্ট তাকলিদ কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে প্রমাণিত হল এবং আমল করার মাসয়ালাও সুস্পষ্ট হল। মুতলাক তাকলিদ তো কুরআনি নস্ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা জ্ঞানী না হও।
[সূরা নাহল : আয়াত ৪৩]

আর নির্দিষ্ট তাকলিদ উল্লিখিত বিনাশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিতাব ও সুন্নতের মূলনীতি, হাদীসের অধ্যায়, সালাফদের আমল, উম্মতের সম্মিলিত মত এবং বিজ্ঞ উম্মাতে মারহুমার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং গাইরে মুজতাহিদদের জন্য তাকলিদ আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু শুধু মতভেদপূর্ণ মাসায়েলগুলোর মধ্যে যে এগুলোর মধ্যে বিপরীত মতের ইজতেমা অথবা বৈপরীত্য মাসায়েলে চলমান থাকার কোন সুরত সৃষ্টি হলো, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্লভ যে, দীনের মধ্যে তানাকুয দুর্লভ বস্তু হতে পারে না।

এজন্যে সাধারণত সমগ্র আকাবীরে উম্মত এবং প্রত্যেক যুগের বুদ্ধিজীবী উলামাগণ যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন, তারা নির্দিষ্ট তাকলিদের বাউন্ডারী থেকে বের হননি। বড় বড় হুফ্ফাযে হাদীস এবং অধিকাংশ আরবাবে সুনান ও জামেউস্ সুনান মুকাল্লিদ হয়েছেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মুহাক্কিকগণ, দার্শনিকগণ এবং বিশেষ করে ওয়ালী উল্লাহী বংশ এবং সিলসিলার এবং সমস্ত আকাবির যাঁদের অনুসন্ধানকর্ম এবং সূক্ষ্মতা ও মারেফত আইম্মায়ে মুজতাহিদদের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁরা নিজের জন্য এবং শাগরেদ ও মুরিদদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলিদকেই আবশ্যক মনে করতেন। তাঁরা কখনও তার সীমারেখা হতে বের হননি। দীনের ব্যাপারে এটি এমন আদশ, যা উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে উলামায়ে দেওবন্দ পর্যন্ত পৌঁছে। আর ওই নিরাপদ পদ্ধতি ও পথকে দারুল উলুম দেওবন্দ পথ হিসেবে ইখতিয়ার করেছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেমুল উলুম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ., রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., দেওবন্দের দ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক, তৃতীয় পৃষ্ঠপোষক এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক (সদরুল মুদারিরস) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ., ৪র্থ পৃষ্ঠপোষক ও দ্বিতীয় সদরুল মুদাররিস হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহ., ৫ম পৃষ্ঠপোষক হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী সাহেব রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরি সাহেব রহ., ৪র্থ প্রধান ইত্যাদি যাঁদের তাকরীর

বয়ান ও লেখনিকে ইজতিহাদী সমুদ্রের নদী মনে হতো, এমন দার্শনিক চিন্ত ধারা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট তাকলিদের বাউন্ডারি হতে নিজেরাও কোনো দিন সরেননি এবং আপন হালকার প্রভাবকে বের হতে দেননি। তারপর দারুল উলুম দেওবন্দের হাজার হাজার শাখা মাদরাসা, যা ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোর দার্শনিক আলেমগণ তাঁদের হালকাওয়ারী প্রভাব সেই পুরাতন মাসলাক ও মাযহাবের উপর জমে রয়েছেন এবং মানুষদের জমিয়ে রেখেছেন।

বিশেষ করে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেমুল উলুম ওয়াল খাইরাত নানুতুবী রহ. নিজের বিশেষ রং ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে ইমাম আযম রহ.-এর ফিকাহ-র তাকলিদ করেছেন এবং সাথে-সাথে দার্শনিক আন্দাযে সমস্ত ফিকাহ্ এবং ইলমে কালামের মৌলিক দর্শনও এমনভাবে প্রকাশ করে প্রদর্শন করেছেন, যার ফলে তাকলিদ একটি পৃথক দর্শন মনে হতে থাকে এবং যার ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের হাজারো ফুয়ালা এবং ছাত্র ও শাগরেদগণ মুকাল্লিদও হয়েছেন এবং তাকলিদে দার্শনিকও গবেষক হয়েছেন।

এমনিভাবে তারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পৃথিবীর কোনায়-কোনায় তাকলিদের মাসয়ালার মাধ্যমে মানুষের সহীহ দীনের হেফাজত করেছেন। অন্যথায় দেশের মূর্খ পার্সন, যারা দেশের সংখ্যাধিক্য ছিল, তারা চিন্তা-চেতনায় এমন পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রথাকে ইসলাম এবং তাদের অন্ধ বিশ্বাসের তাকলিদকে ইসলামের অনুসরণ মনে করে প্রত্যেক ভদ্র-অভদ্র এর তাকলিদে লিপ্ত ছিল। ফলে তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিদয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল।

অপরদিকে ১৮৫৭ সালের পর আধুনিক শিক্ষা এবং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া মুক্তচিন্তার কারণে চিন্তা-চেতনার ওই স্বাধীনতা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি মুজতাহিদে মুতলাক হওয়ার দাবিদার এবং তাকে নিজের বৈধ অধিকার ভাবছিল। আনুষঙ্গিক বস্তু আকল ও দেমাগের উপর এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, ধর্মীয় বর্ণনা ও রেওয়ায়েতের রদ ও গ্রহণ এর মাপকাঠি আকল ও যুক্তিকে মনে করত।

মোটকথা, একদল তাকলিদে জামেদ তথা অনুভূতিহীন তাকলিদের শিকার হয়েছিল, একদল মুতলাক ইজতিহাদের চেতনায় ডুবেছিল আর একদল তাকলিদের রশিকে গর্দান থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিল। একদল তাকলিদি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে সবাই আবেদ ও ফকিরের বেশ ধারণ করে এমনকি প্রত্যেক দাবিদারের মুতলাক তাকলিদ করাকে দীন বলে ডাকছিল। অতএব

অনুভূতিহীন মুকাল্লিদ বা অনেক সু ও খারাপ মানুষের সামনে মাথা নত করত এবং তাদের কর্মের অনুসরণ করতে করতে বিদয়াত ও দীনের আবিষ্কৃত কাজে লিপ্ত হয়ে এবং খাহেশাতের ফিৎনায় নিপতিত হয়েছে। আর মুক্তচিন্তা কারো সামনে নত না হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করে, নিজের আকল ও যুক্তির গোলামে পরিণত হয়েছে, যা তার আকলে বুঝে আসবে, তা মেনেছে আর যা আসেনি তা অস্বীকার করে বসেছে।

এভাবে মানুষ সন্দেহের ফিৎনায় গ্রেফতার হয়েছে। যদি এমন দিন ও রাত তথা অবস্থা থাকত, তাহলে হিন্দুস্তানের পুরাজগতে সন্দেহ ও খাহেশাতে প্রবেশ করে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দীনকে নষ্ট করে ফেলত। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ নাযিল করুন উম্মতের ওই সুলতানবর্গ ও মুজাদ্দিদদের উপর, যাঁরা ইজতিহাদ ও তাকলিদের ওই মধ্যমপন্থার চিন্তা ধারা গ্রহণ করে, যেগুলো সত্যিকারে কুরআন ও হাদীসের আত্মা ছিল উম্মত সামাল দিয়েছেন এবং ভারতবর্ষে এবং বহিরবিশ্বে হানাফিয়্যাত ও হানাফী মাযহাবের শিকড়কে মজবুত করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট তাকলিদের বাউন্ডারীকে ছাড়েননি এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার শানকে হাতছাড়া করেননি। একদিকে কিতাব ও সুন্নাতের সুপ্রশস্ত ইলমের আলোকিত মিন্বরকে পথের দলিল হিসেবে গ্রহণ করলেন। ফলে তাঁদের ইলম মানকুল বর্ণনা থেকে মাকুল তথা যুক্তি সম্মত, তারপর মাকুল থেকে মাহসুস তথা বোধগম্য অনুভবযোগ্য হয়ে মুশাহাদা তথা দৃশ্যমান হয়ে যায়, উপস্থিত হয়ে যায়।

অর্থাৎ যে ইলম উপরওয়ালাদের হতে শ্রবণ করেছিল, প্রথমে তা দলিল দ্বারা বুঝেছেন এবং তারপর তা ব্যবহার করে তাকে নিজের হাল বানিয়ে নিয়েছেন, যার ফলে পূর্ণ শরীয়ত আপন জাহের ও বাতেনসহ তার উপর উন্মুক্ত হয়েছে এবং তার হাল হয়ে তবিয়তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, এ পরিপূর্ণ উন্মোচিত হওয়া এবং সম্পূর্ণ জাহের ও বাতেন অর্জন হওয়া সত্ত্বেও যখন এমন মানের দার্শনিক ও আরেফবিল্লাহগণও দীনি খাতিরে তাকলিদের আঁচল কখনও ছাড়েননি, অতএব এমন যুগে যখন আমাদের ইলম নিঃশেষ ও ঢিলে হয়ে প্রথাগত রয়ে গেছে এবং ইসলাম কমজোর ও দুর্বল হয়ে নামসর্বস্ব হয়ে গেছে, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং আমলে জযবাত ও উৎসাহ শীতল ও থেমে গেছে, উচ্চ চিন্তা ও বোধ দুনিয়া হতে উঠে গেছে, কাজের কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু দাবি অগণিত, অসংখ্য।

অবাক হচ্ছি, আজ অনেক মহান ব্যক্তি ওই সহজ-সরল দীন হেফাজতের কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাকলিদ হতে যা সালফে সালেহীনদের ও

সাহাবাদের সময় থেকে দীন হেফাজতের খাতিরে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কোন সহজতার গ্রহণ করবেন। এতো তো কোনো খারাবী নেই। কিন্তু যদি এমনটি না হয়, তবে কমপক্ষে এতটুকু করতেন যে, এই কর্মপদ্ধতি যারা ইখতিয়ার করেছে, তাদের ভৎসনা না করতেন যে, তারা তো কোনো বিদয়াত বা শরয়ী নিন্দনীয় কাজ গ্রহণ করেনি। বরং একটি দলিলের সাথে তা গ্রহণ করেছেন যে, নিজেদের দীন ও আমলকে হেফাযত করতে পারবেন যেমনটি পূর্বসূরীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী সমগ্র উম্মাতে মুসলিমাও নিরাপদ ও শান্তি এতেই দেখতেন।

কিন্তু অবস্থা এমন হয়েছে যে, ইমামদের মাসলাক এবং তার অনুসারীদের প্রতিটি ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের টার্গেট বানানো হয়েছে। তাদেরকে কোনো প্রকার হামলা থেকে বিরত রাখা হয়নি। কোথাও বলা হচ্ছে, মুকাল্লিদরা ঝগড়াটে হয়, যুদ্ধবাজ হয়। কখনও বলা হয় মুকাল্লিদরা গাইরে মুকাল্লিদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, যার জন্য তারা ঐতিহাসিক সাক্ষী পেশ করে, যাতে ঘৃণার বীজ যথেষ্ট মজবুতির সাথে অন্তরে বসে যায়। কোথাও বলা হচ্ছে, মুকাল্লিদীন বা হানাফীরা হুকুমতের জোরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের মাসলাক ও মাযহাব প্রসারিত করেছে। নাউযুবিল্লাহ! কেমন যেন ফিকহে হানাফী অথবা অন্যান্য ফিকাহ্ কল্পনা ও অশ্লীল কথনের সমষ্টি ছিল, যার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা ছিল না, ছিল না কোন আকর্ষণ, সেজন্য জোর যবরদস্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রসারিত করা হয়েছে?

এগুলো এবং এধরনের আরো অনেক জঘন্য জঘন্য মন্তব্য রয়েছে, যেগুলো চার মাযহাব এবং এগুলোর পালনকারীদের সম্পর্কে প্রকাশ করা হয়। আমার এ প্রবন্ধ তাদের মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য নয়, যা আমি প্রথমে আরয করেছি যে, এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কোন রদ ও নিন্দা-মন্দ বলা বা মুনাযারা নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু একথা পেশ করা যে, এহেন জঘন্য প্রকার কুধারণা ও চিন্তাধারা কমপক্ষে মুহাক্কিক উলামা ও উম্মতের মুরুব্বীদের শান নয়। যদি কোনো ব্যক্তি বা জামাত ও দলে ব্যক্তিগত ও দলীয় দুর্বলতা থাকে, তাহলে তাতে মাযহাব বা মাসলাকের কি দখল আছে যে, তা তার দিকে সম্বোধন করা হবে? আজ যদি মুসলমানরা আপন জযবায় প্রভাবিত হয়ে পরস্পর মারামারি বৈধ রাখে, তাহলে তাতে ইসলামের কি দখল রয়েছে এবং কিভাবে বৈধ হবে যে, মুসলমানদের এহেন দুর্বলতাকে ইসলামের সিদ্ধান্ত বলা যাবে?

যাহোক, মুকাল্লিদ বা গাইরে মুকাল্লিদ কোনো সময় পরস্পর আলোচিত

আন্দাযে পরস্পর ঝগড়াও যুদ্ধ করতে থাকে। তাহলে এতে তাকলিদ বা অতাকলিদের কি দখল হাত থাকতে পারে? এগুলো স্রেফ তাদের জযবা, যা আপন আপন রঙে প্রকাশ হচ্ছে। এগুলোর সম্পর্ক তো কোনো শরয়ী মাসয়ালার সাথে নেই, না কোনো শরয়ী মাসলাকের সাথে আছে। ইজতিহাদ ও তাকলিদ তো শরয়ী মাসয়ালা; তা তো আপন আপন স্থানে অবস্থান করছে। আর এ দুর্বলতা আপন স্থানে। এ দুর্বলতার উপর অভিযোগ আপন স্থানে যতই সঠিক হোক কিন্তু এই শরয়ী মাসায়েল বা তার অনুসারীদের উপর কোনো অবস্থায় আরোপিত হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকার এর অধিকার এক তবকার অপর তবকার উপর সর্বদা রয়েছে। কিন্তু এতটুকু যে, লিপ্ত ব্যক্তিরা সতর্ক হয়ে যায়। এমন সীমারেখা পর্যন্ত নয় যে, এই আমর বিন মারুফই একটি পৃথক ঝগড়া বনে রণাঙ্গন কায়েম করে ফেলবে। আর পরস্পর ঘৃণার বীজ বপণ করতে থাকবে এবং পানি সেচ দিতে থাকবে, উত্তেজিত করতে থাকবে।

এজন্য আমার সহমর্মিতাপূর্ণ আহবান যে, মাসায়েলকে মাসায়েলের স্থানে রেখে সকল হযরাত চাই তিনি তাকলিদের সাথে সম্পর্ক রাখেন অথবা তাকলিদ পরিহারের সাথে সম্পর্ক রাখেন মূল দীনের হেফাজতে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করার চিন্তা-ফিকির করবেন এবং শাখাগত মাসায়েলের মতানৈক্যের মাঝে যা আজ থেকে মতানৈক্যপূর্ণ নয় বরং সাহাবাদের যুগ হতে এভাবে চলে আসছে একটি ইখতিলাফি দিক পালনকারীদের পক্ষ হতে এ দলিল যথেষ্ট মনে করে নেন যে, অমুক তবকার লোকেরা অমুক ইমামের ফতোওয়ার উপর আমল করছেন, তা আবিষ্কৃত ও বিদয়াত নয়। এমন দলিলকে উক্ত মাসায়েলে সর্বযুগে ঝগড়া দূরকারী মনে করা হতো। ঝগড়া সৃষ্টিকারী মনে করা হতো না। এজন্য আল্লাহ তাকে আজও ঝগড়া দূরকারী বানিয়েছেন। ঝগড়ার কারণ বানাননি। প্রয়োজন হলো সকলে সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে সমগ্র জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিন্তা করা এবং সবাই মিলে এমন কর্মপদ্ধতি ও প্রোগ্রাম নিয়ে চিন্তা করা, যা সকল মুসলমানের এক সমতায় নিয়ে আসবে আর ইসলামী শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্র কোনভাবে বন্ধ করতে পারে, প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

জনাব! আমাদের পরস্পর ইত্তেহাদে কমপক্ষে সাহাবা রা.দের ওই উত্তম আদর্শকে পথচলার মশাল বানিয়ে নেয়া উচিত যে, কুরআনুল কারীমের কিছু দুর্লভ আয়াত যেগুলোকে জুমহুরে সাহাবা রা. কুরআনের অংশ হিসেবে

স্বীকৃতি দেন না। কিছু সাহাবাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। যেগুলোকে তাঁরা ইজমার বিপরীতে কুরআনের অংশ মনে করতেন।

কিন্তু কোনো বর্ণনায় এর প্রমাণ নেই যে, ইজমার সদস্যরা তাঁদের বিপক্ষদের জন্য এবং তাঁরা তাঁদের বিপক্ষদের জন্য কোনো রনাঙ্গন কায়েম করেছেন। সুতরাং তাকলিদকারীগণ যখন তাকলিদ পরিহার ইজমার পরিপন্থী কাজ মনে করেন, তখন তাকলিদ পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে ওই সাহাবাদের আদর্শ ইখতিয়ার করেন, যাঁরা নিজেদের ইজমা থাকার পরও ইজমাবিরোধীদের বিরুদ্ধে কোনো রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেননি, কোন যুদ্ধের সূচনা করেননি। বরং বোধশক্তির ও বোঝানোর হক আদায় করার পর তাঁদের তাহকীকের উপর তাদেরকে অপারগ মনে করে তাঁদেরকে সর্বদার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

অপরদিকে তাকলিদ অস্বীকারকারীগণ যদি তাকলিদের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা থাকার সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তাহলে ওই সাহাবাদের পথ অবলম্বন করুন, যাঁরা দর্লভ আয়াতের ব্যাপারে নিজেদের তাহকীককে পরিহার করেননি এবং ইজমাওয়ালাদের বিরোধিতাও করেননি। তাঁদেরকে তাঁদের আমলের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। তাকলিদের দু-গ্রুপ এমনকি সকল ইসলামী ফিরকা ও দল যতক্ষণ না সাহাবাদের উন্নত মানসিকতাপূর্ণ আদর্শ গ্রহণ করবে, উম্মতের ঐক্যবদ্ধ কোন সমস্যা হলে সমাধা হবে না।

আজ উম্মতে মুসলিমার ব্যাপক শিক্ষার অনেক প্রয়োজন যে, মূর্খতার জীবাণু জাতির জাতীয় দেহকে একটি লাশে পরিণত করেছে। তেমনি আজ ব্যাপক তাবলীগ করা অতীব প্রয়োজন যে, মাসায়েলের অজ্ঞতা জাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছে। তেমনি উম্মতের চরিত্র সংশোধন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কারণ, অসৎ চরিত্র পুরাতন ক্ষতের মত জাতির দেহে লেগে আছে।

তেমনিভাবে পরিষ্কার ও স্বচ্চ লেনদেন আজ চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রয়োজন। কারণ, বদ মুয়ামালা জাতির চালিকাশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তেমনিভাবে রাজনৈতিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করার অনেক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, রাজনীতি না থাকার কারণে জাতির শান ও শওকত এবং শক্তিকে একবারেই নষ্ট করে ফেলেছে।

কিন্তু এ সকল ইজতেমায়ী কর্মকাণ্ড আপনারা তখনই পূর্ণতায় পৌছাতে পারবেন, যখন শাখাগত মাসয়ালার ইখতিলাফকে ঝগড়ার কারণ না বানাবেন এবং বর্ণনাসমূহের দীনি মতভেদসমূহকে আপন সীমারেখায় কায়েম রেখে ইসলামী সীমান্ত রক্ষার চিন্তা-ফিকির করা হবে এবং জাতির ঐক্যবদ্ধ চাকাকে

ফের নতুনভাবে চালানোর চেষ্টা করবে, যা পদদলিত হয়েছে এবং ওই ঝগড়া-বিবাদের কারণেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়েছে। আমি আশাবাদী 'অল ইন্ডিয়া আহনাক কনফারেন্স' উক্ত ইজতেমায়ী এবং ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে নিজেদের বুনিয়াদী উদ্দেশ্যসমূহের সাথে একীভূত করে সেগুলোকে বেশি বেশি নিজেদের কার্যাবলিতে নিয়ে আসবে।

'অল ইন্ডিয়া আহনাক কনফারেন্স'-এর দাওয়াতী পোষ্টার দেখে যাতে গাইরে মাসলাক আলেমদেরকে প্রশস্ত মনে এবং হৃদয় খুলে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, এ কনফারেন্সের ইখলাসপূর্ণ আমলি জযবাত, অনুদারতার ঊর্ধে উঠে নিজেদের মাঝে ইজতিমায়ী রুহ বিদ্যমান এবং মখলিস কর্মীরা, সদস্যরা মুসলিম জাতির ইত্তেহাদের অনেক আকাঙ্ক্ষী। সেজন্য এ কনফারেন্স থেকে এমন আশা করা অতিরঞ্জন হবে না যে, পেশ করা উদ্দেশ্যসমূহ এর বুনিয়াদী মাকসাদ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং তার অধীনে উন্নতি ও অগ্রগতি হবে।

পরিশেষে কনফারেন্সের সকল দায়িত্বশীলদের পুনরায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যারা নিজেদের উন্মুক্ত হৃদয়ে আমার মত নাচিজকে আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর আমার জ্ঞান অত্যন্ত সামানহীন হওয়া সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করে অনেক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা সকল দায়িত্বশীল, সদস্য এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের ইখলাসপূর্ণ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আপন মর্জি মোতাবেক কাজ করার তাওফীক দিন। আর আমাদের সকলকে উত্তম ও সুন্দর পরিসমাপ্তির দৌলত দ্বারা সম্মানিত করুন। আমীন।

বয়ান : ৫

ইসলামি আযাদীর পরিপূর্ণ প্রোগ্রাম

[সভাপতির ভাষণ, জমিয়তে উলামা বোম্বাই প্রদেশ শাখার সম্মেলন]

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি আযাদী প্রোগ্রামের অংশটিকে স্রেফ কিতাব ও সুন্নাতের দ্বারা পেশ করতে। আমার ক্ষুদ্র ধারণামতে, যেগুলো শরয়ী রাহনুমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, আবশ্যক হলো কোনো প্রোগ্রাম-প্লান যুগের রাজনৈতিক কংকালের উপর ভর করে এবং তা থেকে গবেষণা করে না নেওয়া। এহেন ধোঁকাবাজির রাজনীতি পরিহারযোগ্য, যা পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে বরবাদ ও ধ্বংস করে ফেলছে, তা কার্যকর করার যোগ্য নয়। তবে অবশ্যই তা বুঝে অতঃপর আযাদীর প্রোগ্রামগুলোর সম্পর্ক শুধু শরয়ী রাজনীতির সঙ্গে হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রপূর্ণ জাগতিক রাজনীতি দূর হতে পারে এবং অন্তরের উপর থেকে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ উধাও হতে পারে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.

ভূমিকা

১৯৪৪ সালের বোম্বাই শাখা জমিয়তে উলামার বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহ.কে নির্বাচন করা হয়েছিল। তখন তিনি উক্ত সম্মেলনে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে সভাপতিমূলক যে মৌখিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তা বোম্বেবাসীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুভূতি ও উপলব্ধি জাগ্রত করতে আশ্চর্যজনক কাজ করেছিল। তাতে কবুল ও প্রভাবের একটি বিশেষ স্রোত ছিল, যা চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার শ্রোতার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল।

পশ্চিমা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারার বাহক ও আসক্ত উভয় চেতনার লোকেরা উক্ত ভাষণের উপর একইভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকারি ও বেসরকারি, মাযহাবী ও নন-মাযহাবী, মুসলিম এবং অমুসলিম কোনো তবকা এমন ছিল না, যাদের উপর হাকিকত ও মারেফতের ওই আবেহায়াতের কোনো ছিটাফোটা পড়েনি। আর সে বিভোর স্বপ্ন থেকে হুঁশিয়ার হয়নি, স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গেনি। বোম্বের কর্ণগুলো জীবনের প্রথমে এমন একটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম শ্রবণ করেছে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং শুধুই কুরআন ও হাদীস দ্বারা সংকলিত ও সাজানো হয়েছিল। আর যাতে মানবজাতির, জগতের বর্তমান অবস্থাতে সকলকাম ও সৌভাগ্য অর্জন করার সহজ উপায় এবং বিশ্বাসযোগ্য ও নিশ্চিত পদ্ধতিও বিদ্যমান ছিল এবং পরকালীন মুক্তির সামানও ছিল।

বোম্বে, যেখানকার কিছু হৃদয়বান ও নেক মুসলমানদের একটি সুবিধাবাদী জামাত (দল) নিজেদের আত্মপুঁজা এবং মুনাফা অর্জনের স্বার্থে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল এবং

ইখলাসপূর্ণ দীনি আগ্রহকে ভ্রান্ত রাস্তায় প্রবাহিত করে, সত্য সঠিক দীন পেশ করনেওয়ালা এবং সত্য কথা বলনেওয়ালাদের উপর এমন পর্যায়ের ঘৃণ্য ও ভীতিগ্রস্ত বানিয়ে ফেলেছিল যে, তারা তাদের নিকটে যাওয়া অথবা তাদের কোনো কথা শোনার জন্য কখনও প্রস্তুত ছিল না। সেই লোকগুলো যখন জমিয়তে উলামার প্লাটফর্ম থেকে ওই সমস্ত জাগ্রত করা হজ্বের আওয়াজ শ্রবণ করল, তখন তারা চমকে উঠল। তারা বুঝতে পারল, অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারল যে, স্বার্থপর লোকেরা বছরের পর বছর তাদের ধর্মীয় জযবাতকে যে সমস্ত পথে প্রবাহিত করে, উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে যে মশাল ও ঘৃণা সৃষ্টি করেছে, সেগুলো সরাসরি বাতিল ও ভ্রান্ত। হক ও সত্য এটিই যে, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও সফলতা এবং নববী শিক্ষার সঠিক আদর্শ যদি কারো নিকট থাকে, তাহলে তা উলামায়ে হকের নিকট আছে। উক্ত অনভূতি জাগ্রত হওয়ার পর আলীশান বোম্বে শহরের আনাচ-কানাচ থেকে হক ও সত্য অন্বেষণকারীগণ দলে দলে হযরতের খেদমতে এই আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে থাকে যে, আমাদের এলাকার মুসলমাদের কর্ণকে ওই হকের আওয়াজকে পরিচিত করান, যা থেকে এখন পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, বাহানা ও ভ্রান্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বোম্বেবাসীদের সত্য অন্বেষণ এবং কঠিন শরণাপন্নতা ও আশ্রয়প্রার্থীরা হযরত মুহতামিম সাহেবকে বাধ্য করে যে, তিনি নিজের প্রোগ্রামে বোম্বের নিবেদিতপ্রাণ ও সত্যান্বেষীদের জন্য যতটুকু সময় বের করতে পারবেন তা বের করবেন। সুতরাং তিনি যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকু সময়কাল বোম্বে অবস্থান করেছেন। আর সেখানে প্রত্যেক অংশের হাকিকত ও মারেফাতপিপাসুদের আপন ইরশাদ ও সুন্দর ওয়াজের মিষ্টতা এবং স্বচ্ছ ও পরিষ্কার চলমান পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণের প্রচেষ্টা করেছেন। পিপাসুদের পিপাসার অবস্থা এমন ছিল যে, জগের পর জগ ভরে ভরে পান করতেন আর 'আরো আছে কি' বলে বলে ডাকতেন। হযরতের উপর

যেহেতু দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় আজিমুশ্বান কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী ও দায়িত্ব ছিল সেজন্য আনুমানিক তিন সপ্তাহের বেশি বোম্বে অবস্থান করতে পারেনি। দেওবন্দের অসুবিধার কারণে ফিরে আসেন।

একই বৎসর জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলনের সুযোগে জমিয়তের দায়িত্বশীলতা, পুনরায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব কবুল করার জন্য অনেক পীড়াপীড়িসহ আবেদন করেন এবং বোম্বেবাসীদের ইশক ও মহব্বতকে জোরেশোরে প্রকাশ করেন। অতএব, বোম্বের নিবেদিতপ্রাণদের দাওয়াত গ্রহণ করতে হয়। তারপর বোম্বে শহরে উপস্থিত হয়ে সভাপতির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। সে বছর বোম্বেবাসী মুসলমানদের আনন্দ-উল্লাস ও আগ্রহ-উদ্দীপনা বেশি ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে উপস্থিতির সংখ্যা এক লাখের বেশি ছিল। জমিয়তের সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর শহরবাসীদের পক্ষ থেকে এলাকাভিত্তিক মাহফিলের ধারা শুরু হয়। সে সকল মাহফিলে তিনি মানবজাতির মুক্তি ও তাদের জীবনের বিভিন্ন কোণের সফলতা ও কল্যাণের ওই প্রোগ্রামগুলো পেশ করেন, যা কুরআন ও হাদীস থেকে সংকলিত ও সাজানো। সেসকল খুতবা বা বয়ান বোম্বেবাসী মুসলমানদের ঈমানে চমক ও জ্যোতি সৃষ্টি করে। বাতিল লোকের প্রতারণা, সন্দেহ সৃষ্টি এবং বানোয়াটি মিথ্যা ও অপবাদ দ্বারা অনেক বছর মেহনত করে দেওবন্দি জামাতের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও দুশমনির যে ইমারাত ও প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা মাকড়সার জালের মতো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং সেখানের বুদ্ধিমান মুসলমানদের বিরাট একটি অংশে দেওবন্দিদের মহব্বত ও আত্মবিশ্বাসের গভীর নকশা প্রতিষ্ঠা হয়। 'তা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান তাকে দেন।'

৫ সফর ১৩৬৪ হিজরী জমিয়তে উলামা বোম্বে শাখার বার্ষিক সম্মেলনে হযরত হাকীমুল ইসলাম যে খুতবা পেশ করেছিলেন, সেটি দেওবন্দ থেকে বোম্বে যাওয়ার পথে রচনা করেছিলেন। লিখিত পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ

হয়নি। মূলত এটি সভাপতির ভাষণের বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া ছিল, যা চলন্ত অবস্থায় শুধু বিষয়বস্তু স্মরণ রাখার জন্য সংকলন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ চিন্তাকে সামনে রেখে যে রচনা শ্রবণে শ্রোতাদের তবিয়ত জটিলতা বোধ এবং কষ্টদায়ক ভাবে। পাশাপাশি লিখিত বক্তৃতার দ্বারা মাসায়েল হৃদয়ঙ্গম করাতে বিভিন্ন চিন্তা ও খেয়ালের শ্রোতাদের পুরোপুরি লক্ষ রাখা যায় না। সেজন্য তিনি লিখিত খসড়ার উপর মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করা অধিক উপযুক্ত মনে করেন। সেই মৌখিক বয়ানে লিখিত রচনা হতে অনেক বিষয় অতিরিক্ত ছিল। আর সম্মেলনে সেই বয়ানের অনেক গভীর প্রভাব পড়েছে।

হযরতের ইচ্ছা ছিল খুতবাকে দ্বিতীয়বার দেখার সময়, বক্তৃতাকালে বের হওয়া আরো অতিরিক্ত রহস্যাবলি ও বিষয়বস্তু সংযোগ করে নিবেন। কিন্তু হযরত যখন তাকরীর সমাপ্ত করেন, তখন বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন পাণ্ডুলিপি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তাদের দিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ, তারা বক্তৃতার যে নোট গ্রহণ করেছে, উক্ত পাণ্ডুলিপি অবশ্যই তা থেকে বিস্তারিত হবে। সেজন্য পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেওয়া হয়। সেটিকে বোম্বের উর্দু, ইংরেজি, গুজরাটী এবং মিরাঠী ইত্যাদি ভাষার পত্রিকায় প্রকাশ হয়। কিছু পত্রিকা সম্পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করে, কিছু পত্রিকা বিশেষ বিশেষ অংশ প্রকাশ করে। এমনকি কিছু কিছু পত্রিকাওয়ালা মানুষের বেশি চাহিদার ভিত্তিতে পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একাধিকবার প্রকাশ করে।

বোম্বে থেকে ফেরার পথে হযরত উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয় নজর করে ওই সকল বিষয় সংযোজন করেন, যেগুলো বক্তৃতাকালে বিশেষভাবে বের হয়ে এসেছিল। এখন সংযোজন ও বিয়োজন হওয়ায় এ পাণ্ডুলিপি আপন পূর্ণ কলেবরে সংকলিত হয়। যেহেতু এ-খুতবাটি প্রথাগত সাধারণ খুতবা থেকে ভিন্ন এবং তাকে যুগের প্রয়োজনে মুসলমানদের সর্বোত্তম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেজন্য রেসালায়ে দারুল উলুমের

সম্পাদকের আবেদনে হযরত রহ. সংযোজনকৃত পাণ্ডুলিপি পত্রিকার অফিসে দিয়ে দেন, যাকে ইনসাফের সাথে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

রেসালায়ে দারুল উলুমের যে সকল সংখ্যায় উক্ত বয়ানটি প্রকাশ করা হয়েছে, সে সংখ্যাটি অতি দ্রুত পুরিয়ে গেছে। মানুষের আরো চাহিদা এখন জারি আছে। সেজন্য আগ্রাহীদের ও পাঠকদের পীড়াপীড়ির কারণে হযরত কারী তৈয়ব সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্ত বয়ানটি কাসেমুল উলুম দেওবন্দ। খুতুবখানার পক্ষ থেকে কিতাব কিতাবাকারে প্রকাশ করা হয়।

– প্রকাশক, কুতুবখানায়ে কাসেমুল উলুম, দেওবন্দ।



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى○ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ○ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ○ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ○ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○ وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ○ هٰرُوْنَ اَخِيْ ○ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ○ وَ اَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ○ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ○ وَّ نَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ○ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ○ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى○

وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ○ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ○ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى○ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ○ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ

مَعَكُمَآ اَسۡمَعُ وَ اَرٰى ○ فَاۡتِيٰهُ فَقُوۡلَاۤ اِنَّا رَسُوۡلَا رَبِّكَ فَاَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِىۡۤ
اِسۡرَآءِيۡلَ ۙ وَ لَا تُعَذِّبۡهُمۡ ؕ قَدۡ جِئۡنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنۡ رَّبِّكَ ؕ وَ السَّلٰمُ عَلٰى مَنِ
اتَّبَعَ الۡهُدٰى ○ اِنَّا قَدۡ اُوۡحِىَ اِلَيۡنَاۤ اَنَّ الۡعَذَابَ عَلٰى مَنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

হে মুসা! ফেরাউনের নিকট যাও, সে ভীষণ উদ্ধত হয়ে গেছে। মুসা আ. বলল, হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন। অর্থাৎ আমার ভাই হারুনকে, তাঁর মাধ্যমে আমার শক্তিকে মজবুত করুন এবং তাকে আমার কাজের অংশীদার বানান, যাতে উভয়ে বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। আর বেশি পরিমাণ আপনার যিকির করতে পারি। নিশ্চয়ই আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। ইরশাদ হলো, হে মূসা! তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো, যা চেয়েছে তোমাদের দেওয়া হলো।' *[সূরা ত্বহা : আয়াত ২৪-৩৬]*

তারপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার জন্য নির্বাচন করেছি। আমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলিসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও। সে অত্যন্ত সীমালঙ্ঘন করেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে নসিহত কবুল করবে অথবা ভীত হবে। উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রভু, আমরা আশংকা করি, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে, বাড়াবাড়ি করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সব শুনি ও দেখি। অতএব, তোমরা তার নিকট যাও এবং বলো আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল। অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং এমন ব্যক্তির জন্য শান্তি যে সৎপথে চলে। আমাদের নিকট ওহী

এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪১-৪৮]*

আমার সবচেয়ে বড় ইজ্জত ও সৌভাগ্য

আপনারা দীর্ঘ এক বৎসর পর ফের পূর্বের ন্যায় আমার সম্মান বৃদ্ধি করে আমাকে ওই স্থানে সমাসীন করেছেন, যেস্থানে গত বৎসর বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার নৈতিক দায়িত্ব হলো এ-উৎসাহ প্রদানের উপর আপনাদের সকলের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

কিন্তু আমি যতটুকু বুঝি, আমার সবচেয়ে বড় সম্মানবর্ধক এটি, চাই আমার জাতকে যতই তুচ্ছ মনে করা হোক যেমনটি বাস্তবেও আছে। কিন্তু এই পয়গামকে সতর্ক কর্ণে শ্রবণ করে অন্তরের গভীরে স্থান দেওয়া হয়, যা আমি সভাপতির সামনে বসে দিতে চাই। তাহলে এটি আমার জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান ও সৌভাগ্য হবে। যদিও আমার জাতকে যে কোন দৃষ্টিতে দেখা যাক।

বাদশাহদের পয়গাম সর্বসাধারণদের কর্ণে সাধারণত মেথর ও সুইপারদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। কিন্তু তা গ্রহণ করায় মেথরদের জাতিগত তুচ্ছতা ও নিম্নশ্রেণীতা প্রতিবন্ধক হয় না।

হে শ্রদ্ধাভাজনগণ!

আমাকে খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারের একজন সামান্য মেথর হিসেবে জ্ঞান করবেন। এমনকি ওখানের মেথরদের মর্যাদা এখানকার রাজা-বাদশাহদের চেয়ে বেশি। আমি কিছুই না। যাহোক একজন সাধারণ মেথর তুচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও যদি বাদশাহর পয়গাম মেনে নিতে প্রতিবন্ধক না হয়, তাহলে আমার মতো নিম্ন মর্যাদার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পয়গাম শুনতে এবং মানতে প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত।

আমি আমার জন্য এ সময় ওই উদাহরণ পেশ করতে পারি, যা মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. বিশেষ এক তাবলীগের স্থানে হয়েছিল। তিনি নর্তকী ও বেশ্যাদের সত্যের তাবলীগ করার জন্য পৌঁছে গেছেন। তখন তার খাদেম ও মুরিদগণ এ বলে বাঁধা দিলেন যে, হযরত এমন খারাপ গ্রুপের সামনে তাবলীগের জন্য যাওয়া ইলমকে বেইজ্জত করার নামান্তর। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! যদি ইসমাঈলকে গাধার উপর আরোহণ করিয়ে তার মুখ কালি দ্বারা কালো করা হয় এবং জুতার মালা তার গলায় ঝুলানো

হয় আর তার পিছনে পিছনে শিশু-কিশোররা হৈহুল্লোড় করতে করতে শহর থেকে বের করতে থাকে আর ইসমাঈল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলতে বলতে যেতে থাকে, তাহলে এমনটিই তার জন্য সর্বোচ্চ ইজ্জত ও উন্নতি, যারপর তার আর ইজ্জতের প্রয়োজন নেই।'

অতএব, আমি এর চেয়ে বেশি আর কি বলতে পারি যে, আপনারা যদি আমাকে কোনো প্রকার সম্মান না করতেন এবং আপন উন্নত ও উত্তম চরিত্রের প্রমাণ পেশ না করতেন; কিন্তু এ-পয়গামের আযমত ও সম্মান করতেন, যা আমি পেশ করতে চাচ্ছি, তাহলে নিঃসন্দেহে তা আমার জন্য সম্মান বৃদ্ধির কারণ হতো যে, এরপর আমার আর কোনো ইজ্জতের প্রয়োজন নেই।

পুরাতন আলোচনা

জনাব! বোম্বে শাখা জমিয়তে উলামার প্লাটফর্ম থেকে কোন নতুন ও দুর্লভ পয়গাম দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, যে পয়গাম আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কারণ, প্রথমত এ-পয়গাম কুরআনি পয়গাম। আর কুরআন হলো চৌদ্দশত বছরের পুরাতন গ্রন্থ। তাহলে তার পয়গাম নতুন কিভাবে হতে পারে?

তারপর প্রাচীনতা ও পুরাতনের এ-সীমাবদ্ধতা ও সময়সীমা কুরআনুল কারীমের শব্দ হিসেবে, যার বয়স চৌদ্দশত বছর থেকে বেশি। অন্যথায় কালামে নাফসী (অর্থগত কুরআন) এর স্তর, তাতে আল্লাহর কালাম এবং তার পয়গাম যা অনাদি ও অনন্ত প্রাচীন। তা তো আল্লাহর সিফাত, যার প্রাচীনতার কোনো সীমা ও প্রান্ত হতে পারে না। তার মাথা হতে পা পর্যন্ত তথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই প্রাচীন ও অনাদি। সেজন্য আমার পয়গাম এর মধ্যে সামান্য পরিমাণও নতুনত্ব থাকবে না, তারপর এ-পুরাতন পয়গাম ও পয়গামদাতারা বারংবার দিচ্ছে যে, চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কুরআন ও তার ভিতরে সংরক্ষিত পয়গাম প্রত্যেক আলেম ও সাধারণদের যবানে হাজার হাজারবার উচ্চারিত হয়েছে। সেজন্য তাবলীগ হিসেবে এ-পয়গাম নতুন নয়। তবে হ্যাঁ, বয়ানের শিরোনাম ও দলিল-প্রমাণ পেশ করা হিসেবে হয়তো নতুন হতে পারে। আর এ-হিসেবেও যদি নতুন না হয়, তাহলে তাও সঠিক কথা। আসল উদ্দেশ্য হল আলোচনা। আর আলোচনা সর্বদা পুরাতন বিষয়ে হয়।

সংক্ষিপ্ত পয়গাম

এ-পয়গাম উল্লিখিত কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আয়াতসমূহ হতে, কয়েকটি নম্বারে তুলে ধরতে চাচ্ছি, যাকে উল্লিখিত আয়াতগসমূহের শব্দাবলি এবং ভ্রগ ও পরের যোগসূত্র থেকে উদ্ভাবন করে নাম্বারওয়ার সাজানো হয়েছে। বিশদ বর্ণনার পূর্বে পয়গামের সারসংক্ষেপ হলো এই যে– আমরা দাসত্বের জিবাতে বন্দী, আমাদের পূর্ণ আযাদী ও স্বাধীনতার নেয়ামত লাভ করা প্রয়োজন। সেজন্য আমার সম্পূর্ণ বক্তব্যের সারনির্যাস হলো গোলামি (দাসত্ব) ও আযাদীর শরয়ী আলোচনা, শরয়ী দৃষ্টিকোণে গোলামি ও আযাদীর মর্ম, উভয়ের প্রভাব, আযাদী লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং লাভ করার পথ ও পন্থা ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা কয়েকটি নাম্বারে পেশ করা।

পয়গাম এবং তার দফাসমূহ, বৃটিশদের হঠকারিতা

আয়াতগুলোর শিরোনামভিত্তিক অনুবাদ আপনারা বুঝেছেন। এবার ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর মর্ম ও বিস্তারিত বর্ণনার উপর গভীর মন দেওয়া যাক। বনি ইসরাইল জাতির ফেরাউন ও ক্বিবতিদের গোলামি করা অবস্থায় যখন একটি দীর্ঘ সময় পার হল, তখন আল্লাহ পাকের রহমতের জোশ এল। তিনি হযরত মুসা আ.-এর বরকতময় সত্তাকে গোলামি ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○

হে মূসা! ফেরাউনের নিকট যাও; সে অনেক ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ২৪]*

ফেরাউনের সীমালঙ্ঘন ও ঔদ্ধত্য দেখানোর সবচেয়ে বড় সুরত ছিল বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রাখা।

(১) সুতরাং কুরআনুল কারীম উক্ত গোলাম বানানোকে এবং ফেরাউনের গোলাম বানানোর জযবাকে ঔদ্ধত্য বা বিদ্রোহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, কোনো জাতির কোনো জাতিকে গোলাম বানানো সৃষ্টিকর্তার কায়েনাত থেকে বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার শামিল। তা ক্রোধ ও প্রতিশোধের উৎস। কারণ, তুগইয়ান ক্রোধেরই উৎস হতে পারে, রহমত ও উদারতার উৎস হতে পারে না।

এ আয়াত দ্বারা ইউরোপের ওই জাতি গোষ্ঠীগুলির পজিশন উন্মোচিত হয়ে যায়, যাদের দিন ও রাতের ফিকির ও আলোচনা এবং পেশা ও নেশাই হল জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে ইউরোপের গোলামির ফাঁদে ফেলে রাখার স্কীম আবিষ্কার করা এবং সেগুলোকে কার্যকর করা, যেকাজে বিশেষ করে বৃটিশদের অগ্রগতি অর্জন হয়েছে, তারা অনেক আগে বেড়েছে। তাদের কর্মকে কুরআন ফাসাদে বলে ব্যক্ত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

ফেরাউন তার দেশে অনেক উদ্ধত হয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং কন্যাদের জীবিত থাকতে দিত। নিশ্চয় সে বড় অনর্থ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল। *[সূরা কাসাস : আয়াত ৪]*

গোলামির কারণসমূহ

(২) এতে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, স্বয়ং গোলামি আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় বস্তু। কারণ, যখন তার প্রতিষ্ঠাকারীদের বিদ্রোহী ও ঔদ্ধত্যকারী বলা হয়েছে। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, তাদের প্রতিষ্ঠা করা বস্তু (গোলামি) প্রশংসনীয় ও পছন্দনীয় হবে। তার কারণ হল, এই যে মানুষের মানসিক দাসত্ব একটি জাতির জন্য সর্ব প্রকার বেইজ্জতি ও লাঞ্ছনার মূল এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য অবজ্ঞার বুনিয়াদ উৎসস্থল। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে কোনো জাতির ইজ্জতের কারণ চারটি হতে পারে– ১. তাদের নিজস্ব বুনিয়াদী জ্ঞান, যা দ্বারা তাদের অভ্যন্তরীণ মজবুতি কায়েম হয়। ২. তাদের অর্থনৈতিক এবং অর্থ সম্পর্কিত অবস্থান, যা দ্বারা তাদের বাহ্যিক শক্তি কায়েম হয়। ৩. তাদের প্রথাগত ও প্রসিদ্ধির অবস্থান (মর্যাদা), যা দ্বারা তাদের পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪. তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্গত সম্পর্কের ধরন, যা দ্বারা তাদের দলীয় প্রভাবে প্রশস্ততা এবং বুনিয়াদসমূহে মজবুতি ও শক্তি সঞ্চয় হয়।

যখন কোনো প্রভাব বিস্তারকারী জাতি, কোনো দেশ অথবা জাতিকে

নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়, তখন গোলাম জাতির ইজ্জতের উক্ত চারটি স্তম্ভ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে সেই জাতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তি, অবস্থান, মর্যাদা এবং সুপ্রসিদ্ধি সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। পরিণামে গোলাম ও প্রভু জাতির মধ্যে নিম্ন চরিত্র ও চালচলনে এমন খারাপ জীবাণু সৃষ্টি হয়, যার ফলে শুধু সৃষ্টজীবের নিকট নয় বরং সৃষ্টিকর্তার নজরও ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় হয়ে যায়। ওই পর্যন্ত আল্লাহর গাইরত ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের অবস্থান খারাপ এবং মন্দ থেকে আরো খারাপ হতে থাকে। তাদের জাতীয় ইলমের ধারাধারা শুকিয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে পড়ে। যে কারণে না তাদের জাতিগত বর্ণনা স্মরণ থাকে, না জাতীয় রুচিবোধ উচ্চারিত হয়। আর না বাকি থাকে কওমী মেজাজ ও তবিয়ত। আর যদি তাদের জ্ঞান অন্বেষণ করতে হয়, তাহলে বিজয়ী জাতির নিজস্ব জ্ঞান অর্জন করাকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করে, যার জন্য তাদের অপারগ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলাফল এমন হয় যে, অনুপ্রবেশকারী যবর-দখলকারীদের ইলমকে নিজেদের ইলম মনে করে তাদের মতো হয়ে যায়। আর এমন যদি নতুন জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের বাহ্যিক কোনো ইজ্জত মিলে যায়, তাহলে তা আসলে তাদের জাতিগত ইজ্জত নয় বরং রাষ্ট্র দখলকারী জাতিরই ইজ্জতের একটি প্রতিবিম্ব।

সাথে-সাথে তাদের অর্থনৈতিক মর্যাদা-অবস্থান পিষে ফেলার জন্য এমন আইন প্রণয়ন করে দেয় যে, ফলে শাসিত জাতি দিন দিন দরিদ্রতার গহ্বরে পতিত হয় এবং তাদের অমুখাপেক্ষিতা ও স্বণির্ভরতা এবং গায়রত ও আত্মসম্ভ্রম বোধের রক্ত ওই গর্তের কিনারায় প্রবাহিত হতে থাকুক, যাতে সেই দরিদ্র ও নিঃস্বদের অসহায়ত্বের সময় তাদের মূল্যবান ঈমান সস্তা দামে খরিদ করতে পারে। পরিণামে আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বনির্ভরতার কল্পনাও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা মুশকিলাতকে মোকাবেলা করে তা অবশিষ্ট রাখার চেষ্টা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বাকি থাকবে না। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা মিটানোর জন্য তাদের কর্মশক্তিকে নিম্নমানের কাজে এবং তুচ্ছ পেশায় ব্যয় করা, নিয়োগ করা, দেশের সর্বোচ্চ সোসাইটি এবং চাকরির মধ্যে ও পদের মধ্যে না স্বয়ং তাদের স্থান থাকে, না তাদের নিজেদের ইলমি ও আখলাকি সম্পদের কোন উঁচু মর্যাদা অর্জন হয়। পরিশেষে ওই গোলামির সৃষ্টি করা মূর্খতা ও অজ্ঞতা এবং অসচ্চরিত্রতা, পাশাপাশি শাসক জাতির গোপন খাহেশ ও প্রচেষ্টার বদৌলতে শাসিত জাতির পরস্পর সম্পর্কও খারাপ হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কও ধ্বংস হয়ে যায়। তাদেরকে আপনদের স্বজাতি থেকে

বিচ্ছিন্ন করে এমন আতুর ও দুর্বল বানিয়ে দেয় যে, তাদের কেউ একই মতালম্বী থাকে না। ফলে তাদের জীবন শাসকদের দয়া ও করুণার উপর বেঁচে থাকে।

একথা সুস্পষ্ট যে, যে জাতির অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত মাধ্যম বন্ধ হয়ে যাবে, যাদের অস্তিত্ব ও উন্নতির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আসবাব হারিয়ে যেতে বা লোপ পেতে থাকবে, তাদের রোগাক্রান্ত দেহ ও আত্মা গলে গলে হঠাৎ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে যায়। গোলামি যেহেতু এ-চারটি ধ্বংসাত্মক আসবাব নিজের সাথে বহন করে, যেগুলোর দ্বারা জাতির সিংহাসন উল্টে যায়, সেজন্য কুরআনুল কারীম গোলামিকে নিন্দনীয় শাস্তি বলেছে। বনী ইসরাইল জাতির গোলামি যা ফেরাউন ও কিবতিদের মনীবদের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন তা নিম্নের শব্দাবলি দ্বারা আলোচনা করেছেন–

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

হে বনী ইসরাইল! স্মরণ সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের নাজাত দিয়েছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তির (গোলাম) স্বাদ আস্বাদন করাত। *[সূরা বাকারা : আয়াত ৪৯]*

ইলমের বিনাশ

উদাহরণস্বরূপ ফেরাউন জাতি বিজয়ী ও শাসক হয়ে বনি ইসরাইলদের সাথে ওই পন্থা অবলম্বন করে, যা সাধারণত প্রত্যেক মনীব জাতি আপন গোলাম জাতির সাথে করে থাকে। অর্থাৎ গোলামি আর দাসত্বের চুতষ্টয় উপাদান পূর্ণ করে। সর্বপ্রথম বনি ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদের ইলম বিলুপ্ত ও খতম হয়।

ফেরাউনের কি প্রয়োজন ছিল যে, বনি ইসরাইলদের বর্ণনাগত তালিমের প্রচলন চালু রাখবে? তার প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবে অথবা ইবরাহিমী এবং ইসরাইলী জীবনব্যবস্থা মোতাবেক তরবিয়ত প্রতিষ্ঠা করবে?। অন্যথায় তার খোদায়িত্ব কবে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেত? এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফলাফল এমন হল যে, তাদের আসলাফ ও আকাবিরগণ যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ পয়গম্বরদের নসিহত ও উপদেশাবলিও তাদের মেধায় যিন্দা ছিল। যখনই তারা বিদায় নিতে লাগল, তখনই তাদের থেকে বর্ণনাগত ইলম নিঃশেষ হতে থাকে। তাতে বনি ইসরাইলের দিগন্তে

মূর্খতার ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়ে। ফেরাউন একে বাড়িয়ে বাড়িয়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয়, যাতে তারা তাদের বংশীয় বর্ণনাগত ইলম একেবারেই ভুলে বসে এবং কখনও তাদের মধ্যে জাতীয় অধিকারের অনুভূতিও সৃষ্টি না হয়।

এ কারণেই বনি ইসরাইল গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুসা আ.-এর নিকট ইলম ও আমলসম্বলিত একটি জীবন বিধান (প্রার্থনা) আবেদন করল। তিনি তাওরাত এনে দিলেন। এতে প্রমাণিত হয়, তাদের নিকট কোনো বিধান ছিল না, তাদের ইলম অবশিষ্ট ছিল না। অন্যথায় এমন আবেদন করার প্রয়োজন ছিল না। তথাপিও দীর্ঘকাল মূর্খতা ও মিসরী মূর্তিপূজারীদের সংশ্রব, যা গোলামি যুগের স্মারক ছিল হযরত মুসা আ.-এর সংশ্রব পাওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও মূর্খতাপূর্ণ কাজে উৎসাহী হতো। আরিহা নামক স্থান অতিক্রমকালে গাভীর আকৃতিতে পিতলের মূর্তির পূজা দেখে মিথ্যা আবেদন করে বসল–

يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

হে মুসা! আমাদের জন্য এমন খোদা বানিয়ে দিন, যেমন (আরিহাবাসীদের) খোদা রয়েছে।

তাদের আবেদনের পর হযরত মুসা আ. তাদের মূর্খতার পর্দা উন্মোচন করলেন–

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

তোমরা মূর্খ জাতির মতো কথা বলছ।

তারপর তাদের মূর্খতার অবস্থা এমন ছিল যে, সামেরী যখন স্বর্ণ-রূপা দ্বারা বাছুর তৈরি করল, তখন তাদের বড় একটি অংশ বাছুরের পুঁজা-পাঠে লিপ্ত হয়ে গেল। না তাদের মুসা আ.-এর চোখের ক্রোধের কথা স্মরণ হলো, না তাওহীদের উপদেশ ও নসিহত এর কোনো ধ্যান হলো। তাদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য বলা হলো। তখন শর্তারোপ করে বসল, যতক্ষণ আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখব, ঈমান আনয়ন করব না। কালামে ইলাহীর কথা বলা হলে তারা বলল, আমরা কালামে খোদা কিভাবে মেনে নিব, যতক্ষণ তা নিজ কর্ণে না শ্রবণ করব? তাওরাত এনে দেওয়া হলো। কিন্তু ইবাদাতের জন্য আগ্রহী হল না যতক্ষণ না তাদের মাথার উপর পাহাড় খাড়া করা হলো। আর বলা হলো, তাওরাত মেনে নাও অন্যথায় মাথা থেতলে দেওয়া হবে। তখন আগ্রহী হল।

মোটকথা, বছরের পর বছর মূর্খতার মধ্যে থাকার দরুন এমন প্রভাব হয়েছিল, যা গোলামি যুগের স্মরণিকা ছিল যে, তাদের কল্পনা কখন কোন্ দিকে ধাবিত হত। আল্লাহর দিক ব্যতীত গাইরুল্লাহর দিকে যেত। অভ্যস্ত রীণ এর স্থলে সুরত ও অনুভবযোগ্য বস্তুর দিকে মন যেত। সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর স্থলে অনুভব ও বাহ্য আকৃতির খোদার দিকে তাদের তবিয়ত চলত, যা তাদের অজ্ঞতার স্বয়ংক্রিয় ফলাফল।

বাহ্যিক ও প্রথাগত মর্যাদা ধ্বংস

অপরদিকে যখন নিজেদের নিজস্ব ইলম ছিল না আর থাকলেও তা দ্বারা উৎসাহ দেওয়া হতো না। যেহেতু হুকুমত সেই ইলমের ছিল না। অতএব অর্থনৈতিক মর্যাদা ও অবস্থান কিভাবে ঠিক রাখবে? ফলে দরিদ্র, নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হয়ে গেল। তাদের উপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ছিল না। প্রথমে তো অপারগ হয়ে, পরবর্তীতে স্বয়ং তবিয়তের আকস্মিক পরিবর্তনে তুচ্ছ ও নিম্নমানের খেদমত বা চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করে। অর্থাৎ চাপরাশী, খানসামা পরিচারক, বর্গাচাষী, কর্মচারী ইত্যাদি বনে জীবন যাপন করেছে। সর্বোচ্চ সোসাইটিতে তাদের কোনো স্থান ছিল না। ফলে তারা উন্নত সোসাইটিকে অনেক কিছু মনে করত।

ফেরাউনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সুরতহাল এমন করে দিয়েছিল যে, কিবতিদের জন্য এককভাবে উঁচু-উঁচু পদমর্যাদা ছিল, মোটা অংকের বেতন ছিল। জমিদারী ছিল। আর সাবতিদের জন্য নিম্নমানের, নিম্ন শ্রেণীর চাকরি ছিল। তারা উচ্ছিষ্টের মত ছিল। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হওয়া আয়াত থেকে বোধগম্য হয় যে, 'তাদের একদলকে দুর্বল করে রেখেছিল।' তবে হ্যাঁ সাবতিদের মধ্য হতে কেউ যদি উন্নতি ও প্রমোশন পেত, তাহলে তা আপন বংশীয় ইলম ও বর্ণনাগত ইলমের কারণে নয়। বরং তা ফেরাউনি হুকুমতের সংবিধানিক ইলম দ্বারা পেত। যেমন কারুন বনি ইসরাইলের লোক ছিল। এক বর্ণনামতে, সে মুসা আ.-এর চাচার সন্তান ছিল। সে ফেরাউনের পেশকার হয়েছিল। তার ইলম কোনো পয়গাম্বরি বা ওহীর ইলম ছিল না। অন্যথায় এই ইলম দ্বারা এমন পদমর্যাদা, ফেরাউনি রাষ্ট্রে সে কিভাবে পেল। বরং তার ইলম ও জ্ঞান আসমানি ইলম ছিল না। মানবরচিত ইলম ছিল, যা ফেরাউনী পরিবেশের কারণে অর্জন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা সেই ইলমের প্রতি কারুনের কথার মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন। যখন সে বলেছিল–

انما اوتيته على علم عندى

এ ধন-সম্পদ আমার ইলম ও যোগ্যতা কৌশলের বদৌলতে দেওয়া হয়েছে যা স্বয়ং আমার নিকট আছে।

যা সুস্পষ্ট যে, ফেরাউন হুকুমতে প্রচলিত প্রথাগত জ্ঞানের বিপরীত কখনও হতে পারে না। অন্যথায় এই সম্মান পাওয়া কখনও সম্ভব ছিল না। নিঃসন্দেহে তার জন্য ধন-সম্পদ এবং ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সে অগণিত মাল পুঁঞ্জিভূত করে, যার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআন দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, শাসকশক্তি যেহেতু নিজেদের তাহজিব-তামাদ্দুন, নিজেদের কৃষ্টি-কালচার এবং নিজেদের রচিত ইলমি পুঁজি-সামান প্রসার প্রচার করতে চায়, সেজন্য পরাজিত ও শাসিত জাতির উলুমের চেতনা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে, সম্মান ও মর্যাদা সবই নিজেদের প্রচলন করা ইলম ও জ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়, যাতে তাদের রচিত কালিমা প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। আর পরাজিত ও শাসিত জাতির অর্থনৈতিক অবস্থান, প্রথাগত অবস্থান-শাসন সবই নতুন জ্ঞানের অনুগামী বনে যায়। আর শাসিত জাতি যদি এই ইলম দ্বারা সম্মান লাভ করে তাহলে তা তাদের নয় বরং ওদেরই ইজ্জতের ছায়া অর্জন করবে– আসল নয়।

অর্থনৈতিক ধ্বংস

গোলামির কারণে বনি ইসরাইলের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাও ধ্বংস হয়েছিল, তাতে ধস নেমে ছিল। যেমন– বনি ইসরাইল যখন মিসর হতে ভেগে যাওয়ার জন্য বের হলো, তখন তাদের কিবতি মহল্লা থেকে তাদের স্বর্ণ-রূপার মুদ্রা ও অলংকারাদি নিয়ে বের হওয়ার সাহস হয়েছিল, যা তারা কর্জ ও ভাড়া হিসেবে নিয়েছিল। অন্যথায় যদি তাদের নিজস্ব সম্পদ ও সামান যথেষ্ট হতো, তাহলে তাদের নিকট চাওয়ার সুযোগই পেত না। যদি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হতো, তাহলে তারা কি এমন দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রদর্শন করত, যার তারা মিসর থেকে হিজরতকালে প্রমাণ দিয়েছিল?

বহির্সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত

অতঃপর বনি ইসরাইলদের বহির্দশের সঙ্গে সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন ছিল। এমনকি স্বয়ং তাদের আসল জন্মভূমি এবং ইবরাহিম আ.-এর সমাধিস্থল (শাম এবং

বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত তাদের নিকট অপরিচিত হয়ে গেছিল। যদি তারা নিজ দেশে যেতে পারত এবং ওখানকার সাথে সম্পর্ক ঠিক থাকত। তাহলে মুসা আ.কে 'আমাদের সাথে বনী ইসরাইলদের যেতে দাও' এ-ফরমান পৌছানোর প্রয়োজন ছিল না। অতএব, তারা মিসর ত্যাগ করতে পারত না এবং ইজ্জতের সাথে থাকতেও পারত সেজন্য মুক্তি পাওয়ার পর, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য তাদের পৃথকভাবে পবিত্র ভূমিতে পৌছার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। বলা হয়–

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

হে কওম! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন, দান করেছেন। *[সূরা মায়েদা : আয়াত ২১]*

যাহোক ফেরাউনী হুকুমত বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে, তাদের ইলমি মর্যাদাও অবস্থান এবং শিক্ষাগত পদমর্যাদাকে বরবাদ ও ধ্বংস করে, যার ফলে তাদের মধ্যে জাতীয় ইলম অবশিষ্ট থাকেনি, তাদের মর্যাদার অবস্থান বাতিল করে, যার কারণে তাদের উপলব্ধি ও আত্মসম্মানবোধ বাকি থাকেনি। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস করে দেয়, যার কারণে তাদের মধ্যে স্বনির্ভরতা থাকেনি, যা চারিত্রিক মর্যাদার ফাউন্ডেশন। তাদের সম্পর্ক সমগ্র জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, এমনকি তাদের আসল মাতৃভূমি থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, যার কারণে তাদের মধ্যে স্বজনহীনতা সৃষ্টি হয়।

বৃটিশদের কর্মপদ্ধতি

যদি ওই চারটি বস্তু বাস্তবে গোলামির চতুষ্টয় ও মূল উপাদান হয় আর অবশ্যই হবে। কারণ, কুরআনুল কারীম সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করি, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা কি গোলাম নয়? তাদের উপর কি একটি ভিনদেশী অপরিচিত শাহেনশাহীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নয়? অবশ্যই। আর যখন আছে, তাহলে বাস্তবে মুসলমানদের হাত-পায়ে এমনকি ভারতবাসীর সকলের হাত ও পায়ে গোলামির ওই চারটি ভিত্তির চারটি পেরেক ঢুকে আছে না? অবশ্যই আছে এবং নিঃসন্দেহে বিশেষ করে মুসলমানদের উক্ত চারটি উদ্দেশ্যের কারণে তাদেরকে বেশি পেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। সুতরাং সর্বপ্রথম তাদের রেওয়ায়েতি তালিম ধ্বংস করার চেষ্টা

করা হয়। বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কুরআন মুসলমানদের হাতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা কমবে না। যতক্ষণ ইসলামি রেওয়ায়েতি জ্ঞান তাদের মস্তিষ্কে যিন্দা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আত্মসম্মানবোধকে হারাতে পারে না। যাহোক বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী প্রথম-প্রথম মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতি চালু রেখেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করে প্রাচীন শিক্ষা এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

মুসলিমদের শিক্ষা পদ্ধতি ধ্বংস করার বৃটিশ ষড়যন্ত্র

এ-ব্যাপারে স্বয়ং ইংরেজদের সাক্ষ্য বেশি কার্যকর ও উপযুক্ত হতে পারে। তারা মুসলমানদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছে এবং তাদের জীবনের চারটি মূল শাখাকে কেমন পোষণ করেছে। ডব্লিউ ডব্লিউ হেন্টার আইসিএইচ বাঙ্গাল সম্পর্কে ১৮৭১ সালে 'হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান' বই রচনা করে এ সম্পর্কে সরকারি নথিপত্র থেকে অনেক তথ্য ফ্লাশ করে দেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে একস্থানে লেখেন 'আমরা আমাদের শাসনকালে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত, দেশের শৃঙ্খলার খাতিরে ওই শিক্ষাপদ্ধতি (মুসলমানদের শিক্ষা কারিকুলাম) থেকে লাগাতার উপকৃত হতে থাকি। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিও প্রচলন করতে কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। অতঃপর যখন একটি প্রজন্ম এ-নতুন শিক্ষা কারিকুলামের অধীনে সৃষ্টি হলো, শিক্ষিত হলো, আমরা মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষা কারিকুলামকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালাম। ফলে মুসলমান ও জোয়ানদের উপর থেকে প্রত্যেক প্রকার সরকারি (রাজনৈতিক) যিন্দেগীর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।' *[পৃঃ ২৪৭]*

হেন্টার এর বই থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি নির্ভরশীল ছিল ওয়াকফ) রাজস্বমুক্ত জমির উপর, যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমান আমির উমারা এবং শাসকবর্গ ওয়াক্ফ করতেন। হেন্টার লিখেন, বাঙ্গাল প্রদেশ এর উপর আমরা যখন হস্তক্ষেপ করি, তখন সেই সময়কার গ্রহণযোগ্য খাদ্য ও সম্পদ অফিসার মিষ্টার জিমস্ গ্রান্ড এর বর্ণনা যে প্রদেশের আমদানির আনুমানিক এক চতুর্থাংশ হুকুমতের হাতে ছিল না, তাদের হাতে পৌঁছাতো না। ১৭৭২ সালে ওরান হে স্টংগার রাজস্বমুক্ত ভূমির এলাকাগুলো থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন; কিন্তু বিফল হন। ১৭৭৩ সালে লর্ড কার্নওয়ালিস পুনরায় সেহ বিষয়টি উত্থাপন করেন। কিন্তু

তখনকার শক্তিশালী হুকুমতও কাবু করতে পারেননি। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর পর ১৮১৫ সালে হুকুমত পুনরায় উক্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত জোরে শুরু করার উদ্যোগ নেন; কিন্তু কার্যকর করার দুঃসাহস হয়নি। পরিশেষে ১৮৩৮ সালে ৮ লাখ পাউন্ড ব্যয় করে মামলা-মুকাদ্দামার মাধ্যমে মাআফিয়াত এবং শিক্ষার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদের উপর হুকুমত কর্তৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। আর শুধু ওয়াক্‌ফ ভূমি হতে হুকুমতের আমদানি বৃদ্ধি পায় তিন লাখ পাউন্ড, যা প্রায় ৪৫ লাখ রুপির সমপরিমাণ।

উক্ত আমদানি যখন মুসলিমদের প্রাচীন শিক্ষানীতির অধীন থেকে হাতছাড়া হয়ে গেল এবং শিক্ষক স্টাফ তা থেকে বঞ্চিত হলো, ডব্লিউ ডব্লিউ হেন্টার এর শব্দাবালি বর্ণনা থেকে তার ফলাফল এমন প্রকাশ পায়–

'হাজারো পুরাতন-প্রাচীন বংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুসলিমদের শিক্ষানীতি যা নির্ভরশীল ছিল মাআফিয়াত সম্পদের উপর তা ওলটপালট হয়ে পড়ে। আর মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আঠার সালের লুটপাটের ফলে এক প্রকার বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।' *[হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ-২৫৭]*

তিনি আরো লিখেন–

কিন্তু মুসলিমদের এ-অভিযোগের উত্তর দেওয়া যাবে না যে, আমরা তাদের শিক্ষা ওয়াকফ ভূমিকে অবৈধভাবে ব্যবহার করেছি। এহেন বাস্তবতাকে মুসলিমদের নিকট গোপন করে কি লাভ যে, যদি আমরা তাদের অর্পিত সম্পদকে সঠিক স্থানে ব্যয় করতাম, তাহলে বাঙ্গাল প্রদেশে আজও অত্যন্ত উঁচুমানের এবং শান্দার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকত।' *[হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ২৫৮]*

একটু অনুমান করে দেখুন, ইসলামি হুকুমতের একটি প্রদেশে যখন ৪৫ লাখ রুপি ব্যয় হয় শিক্ষা খাতে, তাহলে অন্যান্য প্রদেশসমূহ মিলে কি পরিমাণ ব্যয় হতো? আর এক প্রদেশ হতে যখন ৪৫ লাখ রুপি আমদানি করে তারা অনায়াসে উড়াল, তাহলে সব প্রদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহণ করে তাদের আধুনিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে এবং এ-কাজে তারা কি পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে।

তারপর নতুন শিক্ষা এবং নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হলো। তাতে মুসলিমদের ঝোঁক রাখার কোনো অর্থ হতে পারে না। ইংরেজ শাসক তাদের নিজেদের প্রবণতা প্রচলন করতে চায়। তারা কি মুসলিমদের প্রবণতার কোনো পরোওয়া করবে, যা মিটানোর জন্য প্রাচীন শিক্ষানীতি বিলুপ্ত করা

হয়েছে! সেজন্য ধর্মীয় শিক্ষার কোনো অংশ সেখানে রাখা হয়নি। হেন্টার একস্থানে স্কুল এবং কলেজগুলোতে মুসলিম ছাত্রদের অসাধারণ কম উপস্থিতির অজুহাত দেখাতে গিয়ে লিখেন, 'তৃতীয় কারণ, আমাদের শিক্ষানীতিতে মুসলিম যুবক শ্রেণীর জন্য ধর্মীয় শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।' *[হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ-২৫২]*

আরো আগে বেড়ে তিনি আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, একজন উচ্চ পর্যায়ের অফিসার লিখেন, তারপরও এটি কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় হতে পারে যে, মুসলিমরা এই শিক্ষানীতিকে পরিহার ও পরিত্যাগ করে আছে, যার ভিতর তাদের তবিয়তগত প্রবণতা ও ঝোঁকের কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। আর তাদের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না, যাকে তারা নিজেদের জন্য অনেক প্রয়োজন মনে করে। বরং যা অকাট্যভাবে তাদের উন্নতির বিরোধী এবং তাদের জাতীয় বর্ণনাগত ইলমের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা কিভাবে তারা গ্রহণ করবে।' *[হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃষ্ঠা–২৫৩]*

যাহোক, মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এবং নতুন শিক্ষাকে ইসলামি প্রবণতা থেকে একেবারেই খালি রেখে তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় লাগানো হয়। এর উদ্দেশ্য 'লর্ড মিকাল' এর প্রসিদ্ধ বাক্যাবলিতে এছাড়া আর কি হতে পারে যে– 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো এমন নওজোয়ান সৃষ্টি করা, যারা রং এবং বংশ হিসেবে ভারতীয় হবে আর মন ও মস্তিষ্ক হিসেবে একজন ইংরেজি হবে।'

সুতরাং উক্ত ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। আজ তাদের শিক্ষা পাওয়ার পর কোন্ ভারতীয় মানুষ রয়েছে, যে এশিয়া বা প্রাচ্যপ্রেমিক। তাদের তাহজিব ইংরেজি, তামাদ্দুন ইংরেজি, আকিদা-বিশ্বাস ইংরেজি এবং ধর্ম পর্যন্ত ইংরেজি।

বৃটিশদের লুটতরাজ

যাহোক, ইলম ও দীনি শিক্ষার সাথে এহেন জঘন্য ব্যবহার করল। এখন মুসলিমদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে কিরূপ হৃদয়হীন ও নির্দয় আচরণ করা হয়েছিল, তা দেখা যাক। মুসলিমদের অর্থনৈতিক শান্তি নিঃশেষ করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এমন করা হয়েছিল। মি. হন্টার বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে বলেন– 'আজ হতে দেড়শত বছর পূর্বে বাংলার খান্দানি মুসলিমদের বেলায় একথা সম্ভব ছিল না যে, তারা কেউ গরিব নিঃস্ব হতে পারে। কিন্তু আজ

একথা অসম্ভব যে, তাদের কেউ নিয়ম মাফিক ধনী।' *[উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২২১]*

আরো কিছু আগে বেড়ে লিখেন- 'গত পঁচাত্তর বছর পূর্বে বাংলার মুসলিমদের ঘরোয়া সম্পদের মাধ্যম বন্ধ ও বিলুপ্ত করে দেওয়ার কারণে হয়তো ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারে না ফেরার দেশে চলে গেছে। অথবা ওই লোকদের মোকাবেলায় তারা একেবারে তুচ্ছ এবং নিম্ন শ্রেণীর, যাদেরকে আমাদের হুকুমত (সম্পদ অর্জনের মাধ্যম দ্বারা) সম্মানিত করেছেন।'

উক্ত বইয়ের ২২৬ পৃষ্ঠায় ১৭৬৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে, যা সে সময়কার মুসলিমদের পোষণের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ পলিসির সহযোগিতায় করা হয়েছিল। সে সম্পর্কে লেখা হয়, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক আঘাত, যা আমরা প্রাচীন ব্যবস্থাপনার উপর করেছি। তা এতো পরিমাণ ধোঁকা ছিল যে, তা আরোপকালে মুসলিমরা আন্দাযই করতে পারেনি। সেই ধোঁকাপূর্ণ পলিসির প্রভাব কেমন হয়েছিল? তিনি নিজেই বলেন- 'এহেন বন্দোবস্তু হিন্দু কালেক্টারদেরকে যারা পূর্বে সাধারণ চাকুরী করত, তাদের উন্নতি ও প্রমোশন দিয়ে জমিদার বানিয়ে দেয়। তাদের ভূমির মালিকানা অর্জন হয়। এখন তারা ওই সম্পদ সঞ্চয় করছে, যা মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের হক ছিল।' *[পৃষ্ঠা-২২৭]*

আরো বেড়ে সর্বশেষ ফলাফল লিখেন- 'যা সেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ স্বাধীন তালুকদাররদের তাদের তালুক থেকে পৃথক করার দ্বারা অনেক মুসলিম খান্দানের আযমত মাটির সাথে মিশে যায়।' *[পৃষ্ঠা-২২৭]*

সে যুগে মুসলমানদের আমদানির দুটি বড় মাধ্যম ছিল। একটি হলো সামরিক বিভাগ, আরেকটি হলো অর্থনৈতিক বিভাগ- অর্থ মন্ত্রণালয়। উভয়টির পথ মুসলিমদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের নিচে পতিত হয়। হন্টার লিখেন- 'আমরা মুসলিমদের ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করিনি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমাদের নিরাপত্তা হলো তাদেরকে বেদখল করে দেওয়ার মধ্যে। আমরা তাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা বিভাগ থেকে এজন্য বের করে দিয়েছি যে, এমনটি করা হুকুমত ও সাধারণের উন্নতির জন্য অনেক প্রয়োজন ছিল।' *[পৃষ্ঠা-২৩০]*

আরো সামনে চাকুরী এবং পদমর্যাদার একটি নকশা পেশ করেছেন, যাতে মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের তুলনায় শূন্য কোটায় রাখা হয়েছে। যখন তাদের

থেকে তাদের নিজস্ব ইলম এর দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ধন-সম্পদকেও প্রতারণার মাধ্যমে এবং প্রকাশ্যভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, তখন তাদের মর্যাদা এবং বাহ্যিক প্রথাগত অবস্থান ও ইজ্জত কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

হন্টার লিখেন– 'বাস্তবে কলিকাতার সরকারি অফিসসমূহে আজ মুসলিমরা এর চেয়ে বেশি আশা করতে পারে না যে, কুলিগিরি, চাপরাশি, দোয়াতে কালি ঢেলে দেওয়া এবং কলম-খাতা ঠিক করা অর্থাৎ পিয়ন হওয়া ব্যতীত আর অন্য কোন চাকুরী পাবে।' *[পৃষ্ঠা-২৩৬]*

তবে হ্যাঁ, যারা তাদের শিক্ষায় ভাগ্যবান হয়ে মন ও মানসিকতা তাদের দেওয়ার কাজে পটু হয়ে গেছে এবং তারা হুকুমতের প্রচলিত শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছে, অবশ্যই তারা তাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তারা গোলাম হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতিতে উন্নতি লাভ করতে পারছে।

যেমন– কারণ, গোলাম হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউনের দরবারে একজন পেশকার হয়েছিল এবং অঢেল সম্পদ অর্জন করেছিল। সংগ্রহ কৃতি উদ্ধৃতিগুলো পড়ে কেউ বলতে পারে যে, হন্টার সাহেব তো বাংলা প্রদেশের কথা পেশ করেছেন। হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশ ও অঞ্চলগুলোকে এর উপর কিভাবে কিয়াস করা যেতে পারে?

তাদের উত্তর এই যে, যেহেতু তারা সর্বপ্রথম বাঙালি প্রদেশের সর্দারি আর নেতৃত্ব হস্তগত করে, সেজন্য তারা সর্বপ্রথম সে প্রদেশকে পদদলিত ও ধ্বংস করে এবং গাদ্দারীর মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে ধ্বংস করে, যার স্বীকারোক্তি হন্টার প্রকাশ্যভাবে করেছেন। যখন তাদের আচার-আচরণ এক প্রদেশে এমন হয়েছে আর তা একটি নির্দিষ্ট করা পলিসির অধীনে সহযোগিতায়, এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়, যা মূলত হুকুমতের পলিসি ছিল। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, এহেন পলিসি অন্যান্য প্রদেশে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

অতএব, যেখানে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পৌঁছেছে, তারা সেখানেও এমনটিই করেছে। স্বয়ং হন্টার তার উত্তর দিয়ে লিখেন যে– 'আমি তাও বলে দিচ্ছি যে, আমার এ-বর্ণনাগুলো দক্ষিণ বাঙ্গলার সাথে সম্পর্কিত। কারণ, এটি এমন একটি প্রদেশ, যার সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানি ও চিনি। আর আমি যতটুকু জানি, মুসলিমরা বৃটিশ হুকুমতের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি ওই ক্ষতিগুলোর সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর আমি যদি অন্যদের এ-বিশ্বাস দেই এবং স্বয়ং আমারও ধারণা যে, এই বর্ণনাগুলো সমস্ত ভারতবর্ষের

মুসলমানদের উপর ব্যবহার করা সঠিক হবে, তাহলে এ-ব্যাপারে আমাকে ক্ষমার নজরে দেখবেন।' *[পৃষ্ঠা-২১০]*

এতে প্রমাণিত হয়, এমন হালত শুধু বাংলা প্রদেশের জন্য ছিল না বরং সারা ভারতবর্ষের একই চিত্র ছিল। বাংলা শুধু প্রাথমিক নকশার স্থান ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের নকশা আরো পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিত ছিল, যা অন্যান্য প্রদেশে প্রয়োগ করা হয়।

ভারতীয় মুসলিমদের মুসলিম জাহানের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য বৃটিশদের ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন

যাহোক, ভারতীয় মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তো দীনি ইলম, দীনদারী, অর্থনৈতিক অবস্থান তো ধ্বংস করে দেওয়া হলো। কিন্তু তাদের বহিরাগত পলিসি তার চেয়ে আরো বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল। কারণ, ইহার সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলিমদের বহিরাগত সম্পর্ক কোনো কালে তাদের অভ্যন্তরীণ পলিসির উপর প্রভাব ফেলবে। কারণ, ভারতীয় মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল বহির্দেশের মুসলিম জাহানের সাথে। আর আফগানিস্তান থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত মুসলিম হুকুমতের পৃথক একটি সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্য সম্ভাবনা ছিল যে, তাদের জন্য বহির্বিশ্ব হতে কোন শক্তিশালী আওয়াজ উঠবে। অথবা নৈতিক চিন্তা-চেতনার বা জাগতিক কোনো সাহায্য পাবে। সেজন্য সমগ্র মুসলিম জাহানকে দুর্বল করার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায় ও পন্থা ব্যবহার করা হয় এবং তাদের এমন চিন্তা ও পেরেশানি তৈরি করা হয়, যাতে সেগুলোতে তারা নিমগ্ন থাকে।

সুতরাং মতানৈক্য ইত্যাদির যেগুলো উপসাগরীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধক তৈরি করা হয়েছে, তা-ই সারা মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রচলন করা হয়। কখনও ইরান ও আফগানিস্তানের বিষয়, কখনও ইরান ও তুরস্কের সমস্যা, কখনও তুরস্ক ও আরবিস্তানের সমস্যা, কখনও শাম ও ফিলিস্তিনের সমস্যা, কখনও ইসলামি খেলাফতের সমস্যা।

এভাবে তারা মুসলিমদের পরস্পর যুদ্ধ থেকে ফায়দা উঠিয়ে একদিকে তুর্কিস্তানকে বহুধাবিভক্ত করছে। অপরদিকে ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। কখনও আফগানিস্তানকে উত্তেজিত করছে, কখনও ইরানকে যা পরিশেষে হজম করে ফেলেছিল ধ্বংস হয়েছে। তারা এমন এমন মুসলমান দাঁড় করিয়েছে, যারা নিজেরা সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং পরবর্তীতে

সেগুলোর সমাধান বৃটিশদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বসুলভ এমন সংবিধান প্রকাশ হতো, যার কারণে বাদী ও বিবাদী কারো অধিকার বাকি থাকে না বরং উভয়ের অধিকার বিচারকের হাতে চলে আসে।

স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলিমদের বদনাম রটানোর স্কিম!

এদিকে ভারতবর্ষে যে সমস্ত মুসলমান দীন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য স্লোগান উচ্চারণ করছেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, তাদের সঙ্গে মুসলমানদের সুসম্পর্ক নষ্ট করার জন্য কী-কী তদ্বির অবলম্বন করেছে, সেগুলো হন্টারের গ্রন্থ অধ্যয়নে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন ষড়যন্ত্র ছিল এমন যে, স্বাধীনতাপ্রিয় জামাতকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। পরিশেষ তাদেরকে ওহাবী উপাধি দিয়ে বদনাম রটানোর চেষ্টা করা হয়, যা কার্যকরীরূপে আজও জারি রয়েছে। এ-ষড়যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা হন্টারের বই অধ্যয়নে জানা যাবে। এখন কি কেউ একথা বিশ্বাস করবে যে, ভারতসহ সারা মুসলিম জাহানের মুসলিমদের রাজত্বে, শান ও শওকতে, ঐশ্চর্যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এবং বিত্তশালী এবং দীন ও দীনদারীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে যে ঘুণ ধরেছে এবং পরিশেষে যা সবগুলোকে ধ্বংস করেছে, তা কি বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং তাদের তৈরি করা রাষ্ট্রীয় সংবিধান ব্যতীত অন্য কিছু ছিল?

অতএব, ফেরাউন বনী ইসরাইলদের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের সম্পদের উৎসস্থল বন্ধ করেছে। তারপর তাদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্য তাদেরকে কুলি, চাপরাশি এবং সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী বানিয়েছে। অতঃপর তাদের বহিরাগত এবং ভিতরগত পরস্পর সম্পর্ক নষ্ট করেছে।

এমন ব্যবহার বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ভারত মুসলিমদের সাথে করেছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা খোদ ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হন্টারের বই থেকে স্বয়ং ইংরেজদের স্বীকারোক্তি পেশ করেছি। গোলামির এহেন নিদর্শন জানার পর কে বলবে না যে, কোনো গোলাম জাতির দাসত্বের উপর সন্তুষ্ট থাকা মৃত্যুতুল্য নয়? এজন্য কুরআনুল কারীম একে নিকৃষ্টতম আযাব এবং এর প্রতিষ্ঠাকারীদের বিদ্রোহী উপাধি দিয়েছে। যেমনটি উপরের আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়।

বুনিয়াদী সমস্যা

সাথে-সাথে এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিমদের বুনিয়াদী ও আসল সমস্যা, মূর্খতা দূর করা নয়; অর্থনৈতিকতা অর্জন নয়, না অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সম্পর্ক, না বাহ্যিক ও পদগত মর্যাদা। বরং তাদের আসল ও বুনিয়াদী সমস্যা হলো ওই সকল মসিবতের শিকড় উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা আর সেই গোলামি, যার এক প্রান্ত ভারতবর্ষের মুসলিমদের গর্দানে পড়ে আছে আর অপর প্রান্ত সারাবিশ্ব মুসলিমদের গলায় ঝুলে আছে। আজ হিন্দুস্তানী মুসলমান এবং সারা মুসলিম জাহানের জন্য এমন একটি সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সংবিধানের হাতকড়া (বাঁধা) এবং সাথে-সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ফাঁস ঝুলে আছে, যা মুসলিম জাহানকে উন্নতি করতে দেয় না। নিঃসন্দেহে এতে একটি শক্তির হাত রয়েছে আর তাহলো বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং তাদের স্বৈরাচারী ও গোলাম বানানো, যার বন্ধন খুলে দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

সেজন্যই হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলদের জন্য সর্বপ্রথম তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার দোয়া করেননি, যার সাথে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্পর্ক ছিল। না তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি জোর নজর দিয়েছেন, যাতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হতো। না অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেছেন, যেগুলো দ্বারা তাদের ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি পেত। বরং সর্বপ্রথম তাদের বিনাশ সাধনকারীর (গোলাম) উৎসস্থলের শিকড় অনুসন্ধান করেছেন এবং ফেরাউনকে সম্বোধন করেছেন–

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

বনি ইসরাইলকে মুক্তি দাও, তাদেরকে আমার সাথে যেতে দাও। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৭]*

যাতে তারা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারে এবং নিজেদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উন্নতি ও উন্নয়ন আপন ইচ্ছানুযায়ী করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং আজ ভারতবাসীদেরও বুনিয়াদী বিষয় হলো নিজেদের ও সারা মুসলিম জাহানের স্বাধীনতা, যা ভারত স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যাতে বিশ্বের মুসলিম জাতি নিজেদের মর্জি মোতাবেক তাদের দীনি ও ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঠিক করতে পারে। অতএব,

মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, কোন প্রথাগত ও প্রচলিত নীতি নয় বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্ব, যার জন্য নিজেদের পুরো ঐক্যবদ্ধ শক্তি ব্যয় করা আবশ্যক।

স্বাধীনতার প্রচেষ্টা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব

(১) এদিকে যখন বনি ইসরাইলকে মুক্ত করার জন্য হযরত মুসা আ.কে ফেরাউনের নিকট পাঠানো হলো; অর্থাৎ তাকে পাঠানোর প্রথম উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ফেরাউনের নিকট গিয়ে বলো– 'বনি ইসরাইলকে আমার সাথে মুক্ত দাও এবং গোলামির শাস্তি থেকে তাদেরকে মুক্তি দাও।'

সুতরাং উক্ত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, গোলামি হতে মুক্তি এবং তার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব যার জন্য পৃথকভাবে এজন্য প্রেরিত নবীর সংশ্রব আমলে এসেছে। উক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমের মুক্তি অর্জন এবং তার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা কি জরুরি এবং একটি দীনি ওযীফা তথা প্রাত্যহিক কর্ম নয়? যদি সেকালে ভিনদেশী হুকুমত থেকে বনি ইসরাইলদের স্বাধীনতা জরুরি হয়ে থাকে, তাহলে আজ মুসলিমবাসীদের ভিনদেশী হুকুমত থেকে স্বাধীনতা অর্জন ধর্মীয়ভাবে জরুরি হবে। যাহোক, اذهب الى فرعون এ আয়াত দ্বারা গোলামি জাতিগতভাবে এবং তার নিদর্শনাবলি ও প্রভাবের দিক থেকে মন্দ কর্ম হওয়া সুস্পষ্ট। সাথে-সাথে তা দূরীকরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা দীনি কর্ম এবং দীনি ওযীফা হওয়া সুস্পষ্ট হয়।

স্বাধীনতা লাভের প্রোগ্রাম

এ আলোচনার পর স্বাধীনতা লাভের আলোচনা থেকে যায়। তাই কুরআনুল করীম উক্ত আয়াতের মধ্যে মূলনীতি আলোকপাত করেছে। যে আয়াতে স্বাধীনতা লাভের বনি ইসরাইলদের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে মূসা আ.কে সম্বোধন করা হয়েছে, সে-আয়াত দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হয় যে, গোলামি দূরীকরণের তদ্বির করার সময় প্রথমে গোলাম জাতিকে সেই রোগের কেন্দ্রস্থলের প্রতি দৃষ্টি ফিরাতে হবে যে, উক্ত গোলামির জীবাণু কোথা হতে সৃষ্টি হয়?

ইতিহাস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বনি ইসরাইলের গোলামির উৎসস্থল ছিল ফেরাউনের ঔদ্ধত্য, যার ভিত্তি ছিল স্বৈরাচারিতা এবং গোলাম বানানো।

স্বৈরাচারীতার কারণে সে নিজের ব্যক্তিগত হুকুমতের জাল ছড়িয়ে রেখেছিল, যার চূড়ান্ত ফলাফলের বহিঃপ্রকাশ হল তার খোদায়িত্বের দাবি, যাতে সে রাজা ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সমস্ত অধিকার নিজের জন্য প্রমাণ করেছে এবং বলেছে–

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক।

তারপর নিজে ব্যতীত অন্যদের থেকে উক্ত পদমর্যাদাকে রহিত করে বলেছে–

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ

আমি আমার ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ আছে বলে মনে করি না। *[সূরা কাসাস : আয়াত ৩৮]*

অতঃপরঃ যে পবিত্র সত্তার একক অধিকার রয়েছে, তাঁর সাথে শুধু মোকাবেলা করতে চাইনি বরং নাউযুবিল্লাহ! তার ধারণা মতে আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করেছে এবং আপন মন্ত্রী হামানকে আদেশ করেছে–

فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

হে হামান! আমার জন্য মাটিতে আগুনে গরম কর (অর্থাৎ শক্ত ইট তৈরি কর) তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ কর, যাতে আমি মুসার খোদাকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমি তো মুসাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। *[সূরা কাসাস : আয়াত ৩৮]*

আর গোলাম ও দাস বানানোর জযবা থাকার কারণে বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। কুরআনুল কারীম হযরত মুসা আ.-এর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তাও বর্ণনা করেছে–

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তার পরিবর্তে তুমি বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। *[সূরা শু'আরা : আয়াত ২২]*

অথচ তা অনুগ্রহ নয়। তাও ছিল জুলুমের নতিজা। তুমি বনি ইসরাইলদের

সন্তানদের হত্যা না করতে, আমার মাতা আমাকে সিন্ধুকে ভরে নদীতে না ভাসাতেন, তোমার প্রাসাদে পৌছত এবং না তুমি আমার লালনপালন করতে। অতএব আমার প্রতিপালনের মানশা ছিল বনি ইসরাইল সন্তানদের হত্যা করা, যা তোমার চূড়ান্ত পর্যায়ের জুলুম।

বৃটিশদের গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতা

(৪) উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, বনি ইসরাইলকে গোলাম বানানোর উৎপত্তিস্থল হলো ফেরাউনের স্বৈরাচারিতা; অর্থাৎ তার শাহানশাহী ও রাজত্ব, যে সম্পর্কে হযরত মুসা আ.কে انه طغى বলে সতর্ক করা হয়েছে।

তেমনিভাবে আজ হিন্দুস্তানী গোলামদের একথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, তাদের গোলামির উৎসস্থল বৃটিশদের শাহানশাহী এবং তাদের স্বৈরাচারিতা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ফেরাউনের স্বৈরাচার ব্যক্তিগত ছিল আর বৃটিশদের ক্ষেত্রে জাতিগত। ওখানে ব্যক্তিগত আর এখানে গণতন্ত্রের পোশাক পরানো হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারী ও গোলাম বানানোর জযবা ও-ই যা ফেরাউনের ছিল। ফেরাউন যদি মিসর রাষ্ট্রের ক্ষমতা পাওয়ায় দাম্ভিক হয়ে খোদায়ী দাবি করে এবং আল্লাহর মোকাবেলা করতে চায়, তাহলে আজ ইউরোপিয়ান উন্মাদ জাতিও ক্ষমতাসীন হওয়ার জযবায় অহংকারী হয়ে প্রকৃত খোদার মোকাবেলা করছে। রাশিয়ার বলশেভিকদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন হওয়ার পর তারা নিজেদের রাজত্বে আল্লাহর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করে দিল, জার্মানিদের হাতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা আসার পর, তারা দেশীয় প্রীতির জযবায় বলে উঠল, যদি খোদা জার্মানে থাকত, তাহলে জার্মান জাতি তাকে মেনে নিতে পারত। বৃটিশদের হাতে বিশাল ভূখণ্ড হলে তাদের কিছু দায়িত্বশীল নিজেদের সাম্রাজ্যের বিশাল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখে বলেছিল, যদি আকাশও আমাদের দেশের উপর পতিত হতে চায়, তাহলে আমরা আকাশকে বন্দুকের বেয়নেটে রাখতে পারব।

মোটকথা, এই স্বৈরাচারী দাবি ও-ই, যা ফেরাউন করেছিল। তার যেমনভাবে গোলাম বানানোর জযবা ছিল, তা আজ ইউরোপিয়ান উন্মাদ জাতিরও রয়েছে। যার ফলে আজ পৃথিবীর জাতিগুলোকে গোলাম বানিয়ে রাখতে এবং গোলাম বানানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আর উক্ত কাজের জন্য পরস্পর দরকষাকষিও হচ্ছে। কোথাও প্রকাশ্যভাবে দেশ দখল করার আদলে, কোথাও নিজেদের প্রতিনিধি বসিয়ে। আর কোথাও অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং

অভ্যন্তরীণ প্রভাব খাটিয়ে প্রকাশ করছে। আর 'একদলকে দুর্বল করে রাখে' এর প্রকাশ হচ্ছে, যা ফেরাউনের রাজত্বকালে হয়েছিল। মোটকথা, গোলামির উৎসস্থল এখান থেকে নির্দিষ্ট হয়।

নবীসুলভ নেতৃত্বের প্রয়োজন

(৫) বনি ইসরাইল জাতিকে পরাধীনতা হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য হযরত মুসা আ.কে নির্বাচন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া এবং তাকে اذهب الى فرعون এর আদেশ দেওয়া, একথার সুস্পষ্ট দলিল যে স্বাধীনতার চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য নবীদের সাহায্য গ্রহণ করা জরুরি। অর্থাৎ তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথ সুগম করা, অতিক্রম করা। প্রকাশ থাকে যে, পয়গম্বরগণ আবিষ্কৃত পথ ও পন্থা বলেন না। বরং আল্লাহপ্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে পেশ করেন। ফলে আল্লাহর বাতলানো প্রোগ্রাম প্রকাশ হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতা অর্জনের ওই সমস্ত চিন্তাধারা ও চেতনা নিঃশেষ হয়ে যায়, যেগুলো শুধু আবিষ্কার ও মানবরচনার দ্বারা প্রকাশ্যে আসে এবং আসছে। আর আল্লাহর মানশা দ্বারা বের হয় যে, স্বাধীনতা কর্মের নেতৃত্ব কোনো দার্শনিক বা স্বভাবজাত বা দুনিয়াদার আলেমের স্থলে, কোনো রব্বানী ও হাক্কানী আলেম ব্যক্তির হাতে থাকা উচিত, যিনি ওহীয়ে ইলাহীর সাহায্যে প্রোগ্রাম বানাতে পারবেন, যাতে তিনি জাতির মুক্তি সাথে-সাথে তাদের আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহও করতে পারবেন, যা নষ্ট হওয়ার ফলে গোলামির জীবাণু সৃষ্টি হয়। অন্যথায় আত্মশুদ্ধি ব্যতীত আত্মা মুক্তি পাওয়ার পরও তার রোগ ও জীবাণু ফিরে আসার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

অতএব যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে, তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রাথমিক খড়ি শুধু এই হতে পারে যে, তারা যুগের নুবওয়াত অর্থাৎ খাতামুন নাবীয়্যিনের নবুওয়তের নেতৃত্বে ধাবমান হবে, যার সুস্পষ্টতর প্রোগ্রাম হলো আল কুরআন এবং তার উদ্ভাবিত শরীয়ত, যার একটি বাজু এবং প্রাথমিক তাফসীর হলো হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দ্বিতীয় হলো তার ফিকহী ব্যাখ্যাসমূহ। সুতরাং মুসলমান এমন কোনো নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না, যা কিতাব ও সুন্নাত ব্যতীত নতুন পৃথক কোনো পথ ও পন্থা দেখায়।

হ্যাঁ, কিতাব ও সুন্নাতের মাপকাঠি দ্বারা পরখ করে নিঃসন্দেহে তা গ্রহণ করা ও পরিহার করার ফয়সালা করা যেতে পারে, যার কারণ এই–

লুণ্ঠনকারী জাতির সাথে জিহাদের হুকুম

(৬) এখন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নবুওয়তের আনীত প্রোগ্রাম সুস্পষ্ট যে, তা মূলনীতিগতভাবে দুভাগে বিভক্ত হতে পারে। কঠোরতা ও অকঠোরতা। তবে এদের স্বস্থানে স্ব-স্ব ব্যাখ্যা রয়েছে।

যদি বিজয়ী জাতি পরাজিত জাতিকে তাদের দেশ থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং তাদের দেশকেই নয় বরং দেশকে দেশ দখল করে নেয়; ফলে তারা বন্ধুত্বহীন ও অসহায় হয়ে দেশ হতে দেশে দ্বারে-দ্বারে উদ্বাস্তুর ন্যায় ঘুরতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় দেশমুক্তিতে নবীদের নেতৃত্বের সুরত হলো কঠোরতা অর্থাৎ যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে উক্ত জালেম ও লুণ্ঠনকারী জাতির হাত থেকে আপন দেশকে মুক্ত করা। সেজন্য বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বাইতু মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার জন্য, যা আমালেকা জাতি দখল করে বনি ইসরাইলকে দেশছাড়া করেছিল। তাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তা তামীল করেনি, কার্যে পরিণত করেনি। ফলে তিহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদ্ভ্রান্তের মতো পেরেশানির জীবন যাপন করতে হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন পাকের ৬ষ্ঠ পারাতে রয়েছে। অথবা যেমনভাবে হযরত শাম্বিল আ.-এর যুগে, যখন জালুত বনি ইসরাইলদের দেশকে দখল করে তাদেরকে দেশ হতে বের করে দেয়, তখন পয়গাম্বরের নির্দেশে তালুতের নের্তৃত্বে তাদেরকে দেশ মুক্তির জিহাদের আদেশ করা হয়। আল্লাহ পাকের ইরশাদ–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۭ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۗىِٕنَا

(হে নবী!) তুমি কি মুসার পর বনি ইসরাইলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, জিহাদের হুকুম করা হলে তোমরা জিহাদ করবে না? তারা বলতে লাগল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা জিহাদ করব না;

অথচ, আমাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও সন্তানসন্ততি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে? *[সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৬]*

অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বোত্তম যুগে, যখন তাকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। তখন মদিনা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে দেশমুক্তির জন্য জিহাদ করার আদেশ করা হয় যে, মক্কাকে কাফেরের হাত থেকে মুক্ত কর।

আল্লাহর ইরশাদ–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝
ٱلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করতে অবশ্যই সক্ষম, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। *[সূরা হজ্জ : আয়াত ৩৯]*

যাহোক দেশান্তর করার সুরতে দেশ মুক্তির প্রক্রিয়া হলো শক্তি সঞ্চয় করার কঠোরতা তথা যুদ্ধ, যা পয়গম্বর এবং তাঁর আদেশপ্রাপ্তদের নেতৃত্বে করা হবে।

অহিংসার মাধ্যমে প্রতিবাদ

কিন্তু যদি বিজয়ী জাতি শুধু রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, পরাজিত ও প্রজা জাতিকে নিজেদের দেশ হতে বিতাড়িত না করে, কিন্তু গোলাম বানিয়ে রাখে, তাদের ইচ্ছাধীন বহির্দেশেও যেতে পারে না এবং দেশের ভিতরেও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না, তাহলে এমতাবস্থায় তার সমাধান হলো নবীদের নেতৃত্বে অকঠোরতা অবলম্বন অর্থাৎ পুরোপুরি প্রশান্ত থেকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ফেরাউনি সাম্রাজ্যে বনি ইসরাইলরা এমন ছিল যে, না তাদের অন্য দেশে যাওয়ার অধিকার ছিল, না স্বাধীনভাবে বসবাসের ক্ষমতা।

হযরত ইউসুফ আ.-এর সময়কাল থেকে রাজত্ব বনি ইসরাইলদের হাতে

ছিল। মিসর তাদের ছিল, ফেরাউন ক্ষমতা গ্রহণ করে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে নিল। তাদের মিসর ত্যাগের অনুমতি ছিল না। অন্যথায় হযরত মুসা আ. এমন খাহেশ কেন করলেন যে– 'হে ফেরাউন! বনি ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠাও।'

এবং মিসরে তাদের আরাম-আয়েশে থাকারও অনুমতি ছিল না। অন্যথায় হযরত মুসা আ. কেন বললেন, বনি ইসরাইলকে কষ্ট দিয়ো না। অতএব, বৃটিশ সাম্রাজ্যেও যখন মুসলিম জাতির জন্য না আছে যাওয়ার অনুমতি, না আছে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি। তাই দেশমুক্তির জন্য হযরত মুসা আ.-এর পদ্ধতি অসহিংসা ও অকঠোরতার নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং হুকুমতের নিকট দাবি পেশ করতে হবে যে, মুসলিম জাতিকে স্বাধীনতা দাও।

অসহিংস প্রতিবাদের পাঁচটি হাতিয়ার

(৭) যেমনভাবে কঠোরতার অস্ত্র হলো তীর ও বল্লম এবং তোপ ও বন্ধুক, তেমনি অকঠোর আন্দোলনের জন্যও কিছু অস্ত্র রয়েছে, যেগুলো আযাদীর লড়াইয়ের জন্য হযরত মুসা আ. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। এবং اذهب الى فرعون انه طغى এর আদেশ পালন করার উত্তরে তিনি আল্লাহর নিকট আবেদন করলেন, আমার কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন। যেগুলো ওই জালেম বাদশার জন্য অপছন্দনীয় হবে, যেগুলো আল্লাহ তায়ালা رب اشرح لى আয়াত থেকে শুরু করেছেন। আয়াতের তরজমা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে শুধু ওই অবাহ্যিক এবং চারিত্রিক অস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হবে, যেগুলো আয়াতের শিরোনামে হযরত মুসা আ. হক তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। নিম্নে অসহিংস আন্দোলনের পাঁচটি হাতিয়ার পেশ করা হলো–

(১) শারহে সদর তথা বক্ষ প্রশস্তকরণ। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো উদ্দেশ্যের জন্য বক্ষ প্রসারিত না করা এবং ওই উদ্দেশ্য অন্তরের অভ্যন্তরীণ দাবি এবং জযবাসহ পরিস্ফুটিত না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত হিম্মত বৃদ্ধি পায় না, মানুষ শক্তিশালী জোরদার এবং ওজনদার ভাষায় তা পেশ করতে পারে না।

(২) তাইসীরে আমর তথা কাজ সহজকরণ। কেননা, শারহে সদর হওয়া সত্ত্বেও যদি ওদিক থেকে সাহায্য ও তাওফীক এবং মাধ্যম ও সামগ্রীর ব্যবস্থা না হয়, তাহলে শুধু অভ্যন্তরীণ জযবা কোনো কাজে আসবে না।

(৩) হল্লে উক্‌দাতে লিসান তথা জিহ্বার জড়তা দূরীকরণ। যদি ভাষার অলংকার দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা না থাকে, কথার মধ্যে সাহিত্য এবং মিষ্টতা না থাকে, তাহলে সম্বোধিত ব্যক্তির উপর মাকসাদের প্রভাব পড়ে না। আর ওই ঐক্যবদ্ধ মাকসাদে না নিজেরা একত্র হতে পারে, না শত্রুদের সোসাইটিকে ভাঙ্গতে পারে। বরং সে সত্যায়ন হওয়ার স্থলে আরো মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়, উৎসাহী হয়।

(৪) ইয়ানতে কার ও ইশতেরাকে আমল তথা কাজে সাহায্যকরণ এবং সম্মিলিত কর্ম। যদি কাজে সম্মিলিত কর্ম না থাকে এবং কোন ভরসা ও সাহায্যকারী না হয়, তাহলে এককভাবে কোনো সম্মিলিত কাজ চলতে পারে না। আবার মানুষের অভ্যাস হলো, যখন সে কোনো সাহায্য ও সহযোগিতা না পায়, তখন সে টিকে থাকতে পারে না। সাথে-সাথে বাতেনি ও অভ্যন্তরীণ মাকসাদে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা অর্জন হতে পারে না। এই বিষয়টি এমন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দুই উমর হতে এক উমরের ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেছিলেন, যা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর ব্যাপারে কবুল হয়েছিল, তাঁর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন মন্ত্রিত্বের পদ পূরণ হয়েছিল।

(৫) এমন বস্তু উল্লিখিত সকল বস্তুর আত্মা ও অদৃশ্য শক্তি, তাহলো আল্লাহর যিকির এবং পবিত্র সত্তার তাসবীহ ও তাকদীস বর্ণনাকরণ। কারণ, যদি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ না হয়, তাহলে শারহে সদর হবে না, কাজ সহজ হবে না, জিহ্বার জড়তা দূর হবে না এবং সম্মিলিত কর্মের তাওফীক হবে না এবং প্রভাবও হবে না।

ইউরোপের গোলামি হতে মুক্তি লাভের পথ

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, দেশমুক্তির আন্দোলনের সূচনা হওয়া উচিত যিকরুল্লাহ, দোয়া, আল্লাহর স্মরণ এবং তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ এর মাধ্যমে। এ-সংক্রান্ত সম্মেলনের আলোচনা ও পর্যালোচনা ইত্যাদিতে যিকরুল্লাহ থাকা উচিত। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের রুখ ও প্রত্যাবর্তনস্থল নির্বিশেষে হক তায়ালার সত্তার দিকে হওয়া উচিত, যাতে এমন ইখলাসের বদৌলতে আন্দোলন ফলদায়ক হয় এবং জাহেরী ও বাতেনীর সফলতা ও উপকারিতার পথ আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্মুক্ত হতে থাকে। সারকথা হলো, দেশ মুক্তির মহৎ দীনি রং এবং ইসলামি ঢংয়ে শুরু করা

চাই। ইউরোপের প্রস্তুতকৃত এবং লোকদেখানো প্রদর্শনী থেকে স্বাধীনতাকর্ম মুক্ত হওয়া চাই। তেমনি প্রথাগত ও প্রচলিত আন্দোলন না হওয়া চাই। অন্যথায় যে গোলামি হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আন্দোলন করা হবে, অবশেষে সেই গোলামি আরো শক্ত হয়ে যাবে। ইউরোপ থেকে বাঁচার জন্য ইউরোপিয়ান ফাঁদ কাঁধে ঝুলবে, যাকে বাঁচা বলা হবে না বরং আরো ফেঁসে যাওয়া হবে। আর ফলাফল এমন হবে যে, জাহেরী গোলামির পাশাপাশি বাতেনী গোলামিও মাথার উপর এসে পড়বে।

সম্মিলিত কর্মের প্রয়োজনীয়তা

উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে কিছু তো এমন, যা হযরত মুসা আ. নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যেমন– বক্ষ প্রশস্ত করা, কাজে সহজতা এবং জিহ্বার জড়তা দূর করা। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি তিনি চেয়েছেন, তাহলো 'আমার কাজে আমার ভাইকে শরীক করুন।' এতে প্রমাণিত হয়, দেশমুক্তির প্রচেষ্টায় সম্মিলিত কর্ম হলো প্রথম ধাপ। আর তাও আপনাদের সঙ্গে নিয়ে। এতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, আজ মুসলমানদের পরস্পর সম্মিলিত কর্ম অত্যন্ত জরুরি। অন্য জাতির পূর্বে তাদের নিজেদের প্রথমে আপন করে নেওয়া উচিত। জমিয়তে উলামা থেকে কারা এ-কাজের বেশি অধিকারী যে, তারা মুসলমানদের সকল দলের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার হাত প্রসারিত করবে এবং মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকগুলোকে আইনি এবং প্রথাগত আন্দাযে নয় বরং বাস্তব আন্দাযে দূর করে ভেঙ্গে যাওয়া দলকে মিলানোর জন্য পদক্ষেপ নিবে। তারা আপত্তি ও ওজর পেশ করবে না। বরং বাধাসমূহ উপেক্ষা করে একতার জন্য অনেক অনেক ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করবে এবং নিজে নত হয়ে অন্যদেরকে নিজের সামনে নত করবে। চাই তারা লীগওয়ালা হোক বা আহরারওয়ালা হোক। আল্লাহ তায়ালা এ-সকল বাতেনি আসবাব ও অস্ত্র হযরত মুসা আ.কে প্রদান করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছিল–

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰى ○

হে মুসা! নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা তোমাকে দেওয়া হবে।
[সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৬]

তারপর শান্ত্বনাদায়ক কথা বলে পুনরায় প্রাথমিক আদেশকে এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়–

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ○ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ○
اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○

'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার জন্য নির্বাচন করেছি। তুমিও তোমার ভাই আমার নির্দেশনাবলিসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে।' *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪১-৪২-৪৩]*

নেতৃত্বের মাপকাঠি

(৮) এতে সুস্পষ্ট হয় যে, এই সম্মিলিত কর্মের কর্মী-অংশীদারগণও নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন যাকিরীনদের জামাত হবে। গাফেল ও অলসদের নয়. যাদের নিকট না আছে আল্লাহর মারেফত ও মহব্বত, না আছে তাঁর পথ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি। তারা মুসলমানদের কর্মকে ইসলামি নমুনার কখনও নির্মাণ করতে পারবে না। সাথে-সাথে একথা ভুলে পাওয়া উচিত নয় যে, যে ব্যক্তি জাতির কোনো না কোনোভাবে বড়ত্ব ও মর্যাদা সৃষ্টি করে, সে যেন মুখলিস হয় এবং সামান্য তুচ্ছতা অথবা অবজ্ঞা যেন অপছন্দ করেন। কারণ, সম্মিলিত কর্মে শুধু ব্যক্তিই নয়, সামাজিকতার সম্পর্কও রাখা অপছন্দনীয় বস্ত । অন্যথায় ব্যাপক সামাজিকতা সৃষ্টি হবে না, যা জাতীয় স্বাধীনতার প্রাথমিক সৌন্দর্য। তবে হ্যাঁ, তাদের সুগঠিতকরণ এবং ভ্রান্ত পথের সংশোধন, মহব্বত ও অনুগ্রহ এবং নিষ্ঠার সাথে অবশ্যই জরুরি, যাতে তারাও কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতীত হক কর্মের প্রতি ধাবিত হয় এবং অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরিবর্তনের সুযোগ আসে। মোটকথা, এমনিভাবে দুজন নবীকে নেতা বানিয়ে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন।

স্মারকলিপি পেশ করার ভিত্তি

(৯) এখানে এ-বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হুকুমতের নিকট গমনকারীগণ (যারা স্বাধীনতা চাওয়ার জন্য যাচ্ছেন) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে যাবে। ব্যক্তিগত তাকাজায় যাবে না। যেমন মুসা ও হারুন আ. নিজেদের পক্ষ থেকে যাননি। তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। এতে ফলাফল এমন হবে যে,

পরিণামের সকল যিম্মাদার হুকুমতে তাদের পাঠানো হয়েছিল। এতে ফলাফল এমন হবে যে, পরিণামের সকল যিম্মাদারী হুকুমতে ইলাহীর উপর আরোপিত হবে, জাতির উপর কোনো খারাবী ও আঁচড় লাগবে না। মোটকথা, এ-সকল ব্যবস্থাপনাসহ ইরশাদ হলো, তোমরা ফেরাউনের নিকট পৌঁছ। এই অবস্থার জন্য আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَإِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۭ اَلَا يَتَّقُوْنَ ○

আর যখন আপনার প্রভু মুসাকে ডেকে বললেন, তুমি জালেম সম্প্রদায় অর্থাৎ ফেরাউন জাতির নিকট যাও। আর ভয় করো না। *[সূরা শুআরা : আয়াত ১০, ১১*

হুকুমত ও জাতির মাঝে বোঝাপড়া প্রয়োজন

(১০) এতে সুস্পষ্ট হয় যে, স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় শুধু হুকুমতের নিকট যাওয়াই জরুরি নয় বরং শাসকদের জাতির নিকট যাওয়া এবং তাদের সাথে মিশে আলোচনা-পর্যালোচনা করাও জরুরি। কখনও এমন হয় যে, শাসকগণ অহমিকায় পড়ে দাবিদারদের প্রতি কর্ণপাত করেন না। কিন্তু শাসকদের জাতিরা তা বোঝে, অনুভব করে এবং কখনও এর বিপরীতও হয়। যাহোক, শাসক ও তাদের জাতি উভয়ের সাথে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করা জরুরি। হযরত মুসা আ.-এর উক্ত দুটি আদেশের ব্যাপারে দুটি সংশয় জন্ম নিয়েছিল, যা তিনি প্রকাশ্যরূপে আবেদন করলেন। তিনি হুকুমতের পক্ষ থেকে আশংকা করলেন, বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ির ফলে ফেরাউন কোনো স্বেচ্ছাচারীমূলক কর্ম গ্রহণ করে বসতে পারে। কারণ, তার হাতে তো ক্ষমতা আছে। তাই তিনি বললেন–

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ○

আমরা ভয় করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে, বাড়াবাড়ি করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৫]*

আর জাতির প্রতি আশংকা হয়েছিল স্বজনপ্রীতি এবং হঠকারিতার যে, তারা কথা মানবে না, আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। কারণ, তারা স্বনির্ভর ছিল। তাই তিনি প্রার্থনা করলেন–

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ○

হে আমার পালনকর্তা! আমার আশংকা হয় যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিবে। *[সূরা শু'আরা : আয়াত ১২]*

আল্লাহ তায়ালা উত্তরে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন–

لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ○

তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সব শুনি ও দেখি।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ○

কখনও নয়; তোমরা উভয়ে আমার বিধান নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে আছি। *[সূরা শু'আরা : আয়াত ১৫]*

এতে পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহর প্রতিনিধি ও দূত হয়ে যদি বিধানাবলি এবং শাসক জাতির সাথে মিলানো হয়, তাহলে ক্ষতির যিম্মাদারি স্বয়ং আল্লাহর উপর বর্তায়।

অর্থাৎ কাজ আল্লাহর নামে এবং তাঁর দেওয়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী সূচনা করলে তার ফলাফল ও প্রভাব ভিন্ন হবে। যদি আমরা নিজেদের আবিষ্কৃত প্রোগ্রামসমূহ এবং নিজেদের জাতিগত শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা কাজ শুরু করি, তাহলে ফলাফল ভিন্ন হবে। এতে ওই শক্তি ও প্রভাব আসবে না, যা প্রথম সুরতে আসবে।

নেতার চালচলন বা রীতিনীতি

(১১) এজন্য উপরের আয়াতে হযরত মুসা ও হারুন আ.কে শুধু এমন আদেশ দেওয়া হয়নি যে, তোমরা শুধু আল্লাহর দূত হিসেবে ফেরাউনের দরবারে যাও। নিজেদের পক্ষ থেকে যেও না এবং না শুধু আমার পয়গাম পৌঁছাও, নিজেদের পক্ষ কিছুই বলবে না। অর্থাৎ তোমাদের আবিষ্কৃত প্রোগ্রাম গ্রহণ করবে না। এমনকি এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, পয়গাম পৌঁছানোর ধরন ও আমার নির্ধারণ করা পদ্ধতি গ্রহণ করো। নিজেদের পৌঁছানো পদ্ধতি নির্ধারণ করো না। তিনি বলে দিলেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

অতঃপর ফেরাউনের সাথে নরম স্বরে কথা বলো। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৫]*

অর্থাৎ কথোপকথনের সময় কঠোরতা অবলম্বন করো না। যেহেতু এটি বাড়াবাড়িহীন ঠাণ্ডা যুদ্ধ। আর একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা আ. ছিলেন উক্ত স্বাধীনতার যুদ্ধের কায়েদে আযম (প্রধান নেতা), তিনি অভ্যাসগতভাবে তেজস্বী মেজাজের মানুষ ছিলেন, তাঁর জালালি শান প্রকাশ পেত। তাঁর তবিয়তী উপকরণে তীব্রতা ও কঠোরতা ছিল। আর যেহেতু এই কঠোরতাপ্রিয়তার কয়েকটি ঘটনাও তার থেকে প্রকাশ পেয়েছিল যে, জোশের সাথে এক কিবতিকে থাপ্পর মারার ফলে তার মাথা দেহ থেকে পৃথক হয়ে দূরে নিক্ষেপ হয় এবং মরে যায়। শিশুকালে ফেরাউনের খোদায়ী দাবি শ্রবণ করে, দু-একটি থাপ্পরও কষে দেন, তার দাড়িতে ধরে ফেলেন ইত্যাদি। তাই আশংকা ছিল, ফেরাউনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ, ধৃষ্টাতপূর্ণ ও বেয়াদবিমূলক উত্তর শুনে মুসা আ. নিজের সুঅভ্যাস মোতাবেক ওলটপালট করে চলে আসেন এবং নসিহত ও দয়ার্দ্রতা অথবা দলিল-প্রমাণ পূর্ণ করার কাজ তছনছ হয়ে যায়।

সেজন্য উভয়কে এই তাকিদ দেওয়া হয় যে, মিষ্ট ভাষায় এবং নরম স্বরে কথা বলবে, যাতে হয়তো দুশমন সুন্দর চরিত্র দেখে খুশি হয়ে যাবে অথবা তারপর প্রকাশ্যরূপে তার সীমালঙ্ঘন উন্মুক্ত হয়ে তার উপর প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। একথা কার জানা নেই যে, হযরত মুসা আ.-এর এই জোশ ও চিৎকার (উত্তেজনা), নাউযুবিল্লাহ! মানসিক ছিল না যে, নবুওয়তের বিচারালয় ও দরবার এ-থেকে পবিত্র। বরং তা ছিল বুগযফিল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য দুশমনি করা, রাগ করা যা শরয়ীভাবে কাম্য বস্তু। কিন্তু স্থানের সংকীর্ণতা এবং সামাজিকতা রক্ষার্থে আবশ্যক ছিল যে, ওই জযবাকে যদিও তা দীনি ছিল গোপন করে, অন্য দীনি জযবা আল্লাহর জন্য নমনীয় হওয়া, সবর করা, সহনশীল হওয়াকে কাজে লাগানো। কারণ, আসল উদ্দেশ্য তো এতটুকু নয় যে, মুসা আ. তাবলীগ করে নিজের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবেন এবং ফেরাউনের কথা শুনে চলে আসবেন। অতএব তাবলীগের ফরিজা পালন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে ফেরাউন ও তার জাতি জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে যাক। বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল সংশোধন এবং কার্যসম্পন্নকরণ এবং ফেরাউনের নিকট এমন জযবার সাথে যাওয়া যে, সে কোনোভাবে সঠিক পথে ফিরে আসে। শুধু এ-নয় যে, আমি পয়গাম পৌঁছিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাব।

একথা সুস্পষ্ট যে, সংশোধন ও তরবিয়তের ইচ্ছার সাথে সম্বোধিত ব্যক্তিদের অবস্থার রেয়ায়েত করতে হয়, নিজের অবস্থার নয়। এমতাবস্থায় এ-বিষয়টি প্রকাশ হয় যে, আজও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নেতা এবং সর্দার শ্রেণীগণ, চাই যত বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল হোক বা নিজের কাজে যতই বড় হোক তার মধ্যে নমনীয়তার চালচলন ও রীতিনীতি থাকা উচিত। নরম কথা এবং নমনীয় বচন তাদের শানে প্রবল থাকে যে, তারা নিজেরা না ভেঙ্গে যান এবং অন্যরা অপরিচিতি না থাকেন। কঠোরতা সর্বদা বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়। আর নমনীয়তা ও নম্রতা সর্বদা মিলন ও বন্ধুত্বের কারণ হয়। শর্ত হলো এতে কপটতা ও গাইরুল্লাহর রেযামন্দি না থাকে। অতএব, মুসলিম লিডারগণ অধিক হকদার যে رحماء بينهم এর মিসদাক হবেন এবং اشداء على الكفار (কাফেরদের প্রতি কঠোর) হয়ে হেকমত ও নমনীয়তা অবলম্বন করে নসিহত করাকে হাতছাড়া না করেন।

ফেরাউনি নেতৃত্ব ও শক্তির সঙ্গে কথোপকথনের পদ্ধতি

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে দখলদার শাসকদের অত্যাচার এবং সাংবিধানিক প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলমানদের শান-শওকত ধ্বংসে গভীর কর্মকাণ্ড, ইসলামি দেশগুলোকে খুঁজে খুঁজে পদদলিত করা, ইসলামি শওকতকে ধ্বংস করে খ্রিষ্টধর্মের আধমত ও প্রতিনিধিত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, পবিত্র স্থানসমূহের অসম্মান করা, ভারতের ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি এবং অঙ্গীকারসমূহকে পেছনে ফেলে দিয়ে সেগুলোর প্রকাশ্য বিরোধিতা করা, ভারতবর্ষের জাতিসমূহের সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করে তাদের আহম্মক ও বেকুফ বানানো এবং তাদের পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়ে নিজেদের হুকুমতকে মজবুত ও প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যাবলি যে ইসলামি গায়রত ও সম্ভ্রমবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের উপর মুসলমানদের এবং তাদের নেতাদের যত পরিমাণ জোশ ও কঠোরতা প্রকাশ করবে, তা কমই হবে। আর যে পরিমাণ রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করবে তা তাদের অধিকার-

فان لصاحب الحق مقالا

কেননা, অধিকারওয়ালাদের কথা বলার অধিকার রয়েছে।

আসল উদ্দেশ্য জোশ প্রদর্শন করা নয়; বরং নিজেদের স্বাধীনতা এবং বিরোধী জাতিকে অধিকারের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত করা। আর একথা স্পষ্ট যে,

সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা রাগ ও ক্রোধের দ্বারা সম্ভব নয়। বরং নমনীয়তা ও নম্রতার দ্বারা সম্ভব। হযরত মুসা আ.-এর মতো আমরা আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হতে পারব না। কিন্তু তাঁকেও অকঠোর যুদ্ধের সময় নরম কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় অধিক বুযুর্গ কোন্ মাখলুক হতে পারবে? তাঁকেও মক্কার মুশরিকদের মোকাবেলায় যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি এমনকি পরিশেষে দেশ ও ঘরবাড়ি থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু মক্কী জীবনে, যা অকঠোরতা ও নমনীয়তার জীবন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ধৈর্য ধারণ কর, সহ্য কর, কোন জযবা প্রকাশ কর না, দয়া ও কল্যাণ কামনা করো, সৃষ্টজীবের হাত থেকে কষ্ট পেয়ে বিরক্ত হয়ো না–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ

আপনি সবর করুন, যেমনিভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণ সবর করেছে এবং তাড়াহুড়া করবেন না। *[সূরা আহকাফ : আয়াত ৩৫]*

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

অতএব, আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দিন। *[সূরা হিজর : আয়াত ৮৫]*

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ○

অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে একাই যথেষ্ট।' *[সূরা হিজর : আয়াত ৯৪]*

এ-কারণে তাঁর উপাধি হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন। তাঁর উপাধি হয়েছে রহমতুন মুহদাতুন। আর তারপর সৃষ্টজীবের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়াদ্রতা এবং হিত কামনার এমন অবস্থা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার তাঁকে অসাধারণ দয়াদ্রতা থেকে ফিরিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার আদেশ করতে হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○

সম্ভবত আপনি আপনার প্রাণকে নিপাত করে ফেলবেন তাদের মুমিন না হওয়ার পরিতাপে। *[সূরা শু'আরা : আয়াত ৩]*

যাহোক এই বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, কঠোরতাহীন যুদ্ধে ও আন্দোলনে দুশমন এবং ফেরাউনচরিত্রের দুশমনদের সামনে নম্র কথা বলা জরুরি। রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করা নয় এবং স্বয়ং তাদেরও হেদায়েত করা প্রয়োজন, শুধু নিজেদের নাজাত ও স্বাধীনতা লাভ নয়। এতেও হযরত মুসা আ. আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, ফেরাউন আমাদের উপর বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে বসে। অর্থাৎ নম্রতা ও নমনীয়তা প্রদর্শন সত্ত্বেও তার মেনে নেওয়ার আশা নেই। বরং একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার আশঙ্কা। অর্থাৎ এহেন বিদ্রোহী ও অবাধ্যের জন্য আবার নম্রতার কী প্রয়োজন? কিন্তু তারপরও ইরশাদ হয়েছে, তার দায়িত্ব আমি নিলাম যে, তোমার উপর তার বাড়াবাড়ির কোনো প্রভাব পড়বে না। আমি দেখি ও শুনি এবং সবকিছু জানি। তুমি উপদেশদাতা হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে আন্তরিকতার সাথে কথা বলো। এমনটিই হেকমতপূর্ণ ও উপকারী কাজ।

উচ্চ আওয়াজে দাবি পেশ করার নিষেধাজ্ঞা

(১২) এতে এও সুস্পষ্ট হয় যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ও সর্দারগণ বিনয়ী এবং সংকোচহীন হওয়া উচিত, যারা নিজেদের অন্তরের প্রতিটি খটকা ও সংশয় অনায়াসে ও নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে বলতে পারেন এবং কোনো প্রথাগত গাম্ভীর্য তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে প্রতিবন্ধক না হয় এবং না তাতে তাদের গৌরব ও অহংকার নষ্ট হয়।

হযরত মুসা আ. একজন শক্তিশালী নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভয় এবং দুশমনদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা যা অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি প্রকাশ্যে এবং নিঃসংকোচে প্রকাশ করলেন যে, আমার ফেরাউনের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের আশংকা হচ্ছে এবং তার জাতির পক্ষ থেকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার এবং হঠকারিতার আশংকা করি।

এজন্য আজ আমাদের জন্যও যখন আমরা একটি স্বৈরাচারী হুকুমতের সামনে আবেদন পেশ করার ইচ্ছা রাখি, দাবি করি, তখন অহমিকার ভঙ্গিতে ও

অহংকারী ভাষা প্রকাশ করা কোনভাবেই উচিত হবে না। আমাদের জন্য এমন দাবি কখনও শোভা বর্ধন করবে না যে, না আমরা হুকুমতকে ভয় করি, না আমরা ফাঁসির ভয় করি, না আমাদের জেল-জুলুমের পরোয়া আছে। আমরা এই করব, সেই করব, কিছু করে দেখিয়ে দেব। আল্লাহ করুন! আমাদের অন্তর গাইরুল্লাহ থেকে এমন ভয়হীন এবং নির্ভীক হোক; কিন্তু জোর দাবি করার তারপরও নিষেধ, যতক্ষণ পর্যন্ত জোর দাবি পেশ শরয়ী কোনো প্রয়োজন না দেখা দেয়। আমরা সাধারণত সর্বাবস্থায় এবং বিশেষ করে কোনো শক্তিশালী দুশমনের সম্মুখে পড়ে আল্লাহর জন্য বিনয়ের ঘোষণা করা এবং দুর্বলতা স্বীকার করার ব্যাপারে কখনও সামান্যতম ভীত না হওয়া উচিত। আর পালনকর্তার সামনে নিঃসন্দেহে এবং নিঃসংকোচে নিজের আসল ও সঠিক অবস্থার নকশা পেশ করে তার থেকে সাহায্য পাওয়ার দোয়া করা চাই। কারণ, না কৃত্রিম বাহাদুরী কাজে আসবে, না কৃত্রিমতার প্রদর্শনী আমাদের আসল পথ-পন্থা হতে পারে যেমনটি উপরের আয়াতসমূহে হযরত মুসা আ.-এর আদর্শ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে, যাতে সকল দায়িত্ব হুকুমতের উপর থাকে। আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার একজন কর্মী হিসেবে বিরোধপূর্ণ শাসকদের সামনে পেশ হয়েছি।

মুসলিম নেতাদের প্রাথমিক দায়িত্ব

ওই প্রাথমিক আচরণ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর প্রতি আদেশ হলো–

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

> অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং বলো আমরা উভয়ে তোমার পরওয়ারদেগারের দূত। *[সূরা শু'আরা : আয়াত ১৬]*

(১৩) এতে পরিষ্কার হয়েছে যে, নেতৃবর্গের দল শাসকদের দরবারে এবং শাসক জাতির প্রাসাদসমূহে পৌঁছে সর্বপ্রথম নিজেদের প্রকৃত পজিশন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করবে যে, আমরা কারা এবং কী? হযরত মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হারুন আ.কে আদেশ দেওয়া হলো, প্রথমে ফেরাউনকে জ্ঞাত করাও তোমরা কারা।

অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও যে, আমরা রাসূল এবং আল্লাহর দূত হয়ে এসেছি। অর্থাৎ আমরা নিজেরা আসিনি, আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

আমরা বনি ইসরাইল হিসেবে জাতিগত জযবার অধীনে বা সহযোগিতায় আসিনি। বরং দীনি লোক হিসেবে এসেছি। আমরা ধর্মীয় পয়গাম ও বাণী নিয়ে এসেছি। নিজেদের তৈয়ার করা কোনো অভিমত অথবা নিজ দলের কোনো সিদ্ধান্তকৃত কোনো প্রস্তাবনা পেশ করার জন্য আসিনি।

এতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিম সর্দার ও লিডারগণ যারা উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হবেন, তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো, তারা শাসক এবং শাসক জাতির সাথে মিলিত হওয়ার সময় পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের পজিশন প্রকাশ করবে যে, আমরা মুসলমান। অর্থাৎ আমরা ভারতবাসী হিসেবে দেশীয় জযবা নিয়ে আসিনি। বরং মুসলিম হিসেবে ধর্মীয় জযবা নিয়ে এসেছি। আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমান। এমন নয় যে, প্রথমে মুসলিম, শেষে হিন্দুস্তানী। আমরা ধর্মীয় ইঙ্গিতে এসেছি। কোনো আবিষ্কৃত অভিমতের ভিত্তিতে আসিনি। আমরা জাতিগত চিন্তাধারা ও কিয়াসসমূহের মাধ্যমে কোনো পাস করা রেজুলেশন নিয়ে আসিনি। বরং ধর্মীয় দাবিসমূহ নিয়ে এসেছি, যা বিচারক আল্লাহ এবং রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে পাঠানো, যাকে স্বাধীন রাখতে তোমাদের যবানেও দাবি করে থাক।

এই প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা সবচেয়ে বড় উপকার তো এই হবে যে, আমাদের পজিশন ভারী এবং প্রভাবান্বিত হবে। কারণ, হকের ভাষ্যকারের পজিশন সম্বোধিত ব্যক্তির উপর যেমন প্রতিক্রিয়া হবে, তা আমাদের বানানো প্রচলিত পজিশন চাই তা ব্যক্তিগত হোক বা দলীয় হোক ততটুকু প্রভাব ফেলবে না। কেননা, ইসলামি পজিশন অকৃত্রিম ও কুদরতি। আর অনৈসলামিক পজিশন সর্বাবস্থায় তৈরি করা এবং তা নিজের ভিতর কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে। আর তাও অন্যদের নকল করা, যাদের সামনে আমরা আজ প্রতিবাদ করছি। প্রকাশ থাকে যে, মুখাতাব তা থেকে কোনো আযমত ও আকর্ষণের প্রভাব গ্রহণ করতে পারে না বরং তা হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হবে, যা আমাদের জন্য উপকারী হওয়ার স্থলে ক্ষতিকর এবং ভয়াবহ হবে যে, এতে অহেতুক দৌড়ঝাঁপ করার প্রভাব রয়েছে।

আলেমদের জন্য কেন নেতৃত্বআবশ্যক?

এমনকি ইসলামি এবং খালেস দীনি পজিশন নিয়ে যাওয়া এবং প্রথমে পরিষ্কার ভাষায় পরিচয় বলে দেওয়ার দ্বারা আরেকটি উপকার এ-ও হয় যে, সাধারণ নেতৃত্ব মিশ্রিত থাকবে না বরং পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর

স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন নেতৃত্ব এবং দাওয়াত নিয়ে তারাই দাঁড়াতে পারবেন, যারা প্রকৃতপক্ষে উক্ত পজিশন ঘোষণার শক্তি ও যোগ্যতা রাখেন। সবাই এ-কাজের দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, সে আল্লাহর পয়গামের বাহক হয়ে নিজেদের বা অন্যান্য জাতিদের প্লাটফর্মে তা পেশ করবে। এমন নেতৃত্বের যোগ্য শুধু এমন লোকেরাই হতে পারে, যারা দীনি ও রুহানি রঙ্গে উক্ত পয়গামকে প্রমাণ করতে পারে ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারে এবং এর পক্ষ থেকে সকল প্রতিকূলতার প্রতিরোধ করতে সক্ষমতা রাখে এবং কার্যকরী সাহস রাখে।

এতে একথা যাতে না বোঝেন যে, আমি একজন ছাত্র বা আলেমের নাম উল্লেখ করে কোনো দলীয় প্রীতির অবতারণা করছি এবং অহেতুক আলেমদের নেতৃত্ব এবং অনুসরণের সমালোচনা করতে চাই। কারণ, এ-অভিযোগ তখনই যথাযথ হতে পারে, যখন আমি উম্মতের আলেমদের জাতিসত্তার অনুসরণ করার দাওয়াত দিব। অথচ আমার উদ্দেশ্য আলেমদের ব্যক্তিসত্তার অনুসরণ নয়, আর তা বলা আমার অধিকার নেই। বরং আমি হক্কানী আলেমদের যবানে জারি হওয়া আল্লাহর আইনের অনুসরণের প্রতি মজবুর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এমতাবস্থায় নেতৃত্ব দেযা হয় কানুনে ইলাহীর, আলেমদের নয়। কিন্তু যেহেতু কানুন আলেমদের যবান থেকে শ্রবণ করা হয় এবং কিতাবুল্লাহর সঠিক ভাষ্যকার তাঁরাই, সেজন্য গৌণভাবে তাদের অনুসরণ ও নেতৃত্ব প্রকাশ পায়। তবে ব্যক্তিসত্তার নয় বরং ইলমের অনুসরণ হয়।

সাথে-সাথে দলীয় প্রীতির অভিযোগকারীদের এ-বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, আলেমদের নির্ধারিত কোনো খান্দান ও বংশ নেই যে, অন্যান্য বংশ তাদের পতি ধাবিত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। ইলমে ইলাহীর পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। আর প্রত্যেক মুসলমান সব বয়সে আলেম হতে পারে। অতএব, কোনো নন আলেমের যদি কোনো আলেমের অনুসরণ করতে অসুবিধা হয়, তাহলে এর চিকিৎসা এই নয় যে, আল্লাহর আইনকে রদ করতে থাকবে। বরং তার চিকিৎসা হলো, সে নিজে আলেম হয়ে নেতাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং কানুনে হকের অনুসরণ করে অন্যদের অনুসরণ করাবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় মুসলমান থেকে কানুনে ইলাহীর অনুগত্য করতে হবে। চাই আলেম হোক বা অআলেম হোক।

সুতরাং যেখানে আমজনতাকে কানুনে ইলাহীর আনুগত্যের দাওয়াত দিচ্ছি, সেখানে আলেমদেরও আহ্বান করছি। সেজন্য দলীয় প্রীতির অভিযোগের

কোনো অর্থ হতে পারে না।

রিসালাতের ভাষ্যকারদের মারেফতের বাহক হওয়া উচিত

(১৪) এখানে এ-বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয় যে, যখন হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল এমন যে–

إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমরা তোমার পালনকর্তার দূত।

তাঁরা ফেরাউনের সম্মুখে রাসূল হিসেবে নিজেদের পেশ করেছেন, বনি ইসরাইল হিসেবে নয়। আর রাসূলগণ মুখাতাবদের মুরুব্বী হয়ে থাকেন, জাতির উপদেশদাতা হয়ে থাকেন। তারা যেমনভাবে নিজেদের স্বজাতির মুক্তিকামী হন, তেমনিভাবে হামদর্দীর সাথে মুখাতাব জাতির উন্নতি ও সফলতার চিন্তা-ফিকিরও করেন। অতএব হযরত মুসা আ. যেমনভাবে বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তার নিকট গেলেন, তেমনিভাবে স্বয়ং ফেরাউন এবং তার জাতির সংশোধন ও উন্নতির প্রতিও তার বিশেষ নজর ছিল। কারণ, রাসূল অর্থই মানবজাতির মুরুব্বী এবং দয়ালু উপদেশদাতা।

এতে প্রমাণিত হয়, অমুসলমানদের যে সমস্ত নেতৃবর্গ রেসালাতের ভাষ্যকার হিসেবে হুকুমতের সম্মুখে পেশ হবেন, তাঁরা শুধু আপন জাতির মুক্তির চিন্তা করবে না বরং শাসক জাতির ইসলাহ ও উন্নতির প্রতিও নজর রাখবেন। তারা যেভাবে পয়গামে ইলাহীর মাধ্যমে যেখানে পৌঁছেছে, তেমনিভাবে সেই পয়গামে ইলাহীর মাধ্যমে স্বয়ং ওই জাতিকেও প্রভাবিত করবে এবং ঘনিষ্ট বানানোর ফিকির করবে।

কিন্তু হেকমত হিসেবে এমন বলতে পারে যে, আমরা যে ইসলামকে এবং তার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে স্বাধীন করার জন্য এসেছি, সেই ইসলামের হাদিয়া তোমাদের জন্যও নিয়ে এসেছি। পরাজিতরা যুদ্ধ হিসেবে সামনে পেশহওয়া এক প্রকার প্রতিক্রিয়া হবে আর কল্যাণকামিতার সাথে বিরোধীদের ইসলাহের প্রোগ্রাম গ্রহণ করার দ্বারা অন্য রকম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হবে।

আজ সবচেয়ে বড় মসিবত ও দুঃখ হলো এই যে, শাসক জাতির পয়গাম ও আবেদন হয়তো পৌঁছে না অথবা পৌঁছে কিন্তু অলস রাজনৈতিক রঙে

পৌঁছে। আর ওই রাজনৈতিক রং স্বয়ং শাসকগোষ্ঠীর আবিষ্কার করা থাকে। ফলে শাসকদের উপর উক্ত পয়গামসমূহের প্রকৃত দীনি মর্যাদা সুস্পষ্ট হয় না। আর কোনো প্রকার হলেও শুধু দাবি হিসেবে হয়। কোনো অবস্থান বা শান হিসেবে নয় অথবা কমপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন পর্যায়ের হয়, যা তাদেরকে সেই হিসেবে প্রভাবিত করতে পারে। তার বড় কারণ হলো এই যে, আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদানকারীগণ যারা মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের গর্ব নিজেদের অন্তরে অনুভব করেন, তারা নিজেরা দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, কিছুই অবগত নয় এবং দীনের কোন রং ও শান নিজের মধ্যে ধারণ করে না। সেজন্য মুসলিম জাতির আসল মেজাজ এবং প্রকৃত স্বভাব মোতাবেক পয়গাম পৌছাতে সক্ষম হয় না। বরং যেমনিভাবে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক দলের আবেদন-স্মারকলিপি প্রথাগত নিয়মে প্রচলিত ধারায় শাসকদের কর্নে পৌঁছে, তেমনিভাবে মুসলমানদের দাবি-স্মারকলিপিগুলোও জাতীয় এবং রাজনৈতিক রঙে ইংরেজদের নমুনায় ইংরেজদের নিকট পৌঁছে। যেগুলোর মধ্যে প্রকৃত ইসলামি রূহ থাকে না যে, অন্যদেরকে প্রভান্বিত করবে।

অতএব যে সমস্ত মানুষ জাতির পয়গাম হুকুমতের কর্নে পৌঁছায়, তারা দীন থেকে দূরে এবং ইংরেজদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্থ। আর অপরদিকে যারা দীনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং দীনি রঙে রঙ্গিন থাকেন, তারা ইংরেজি ভাষা এবং তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অজ্ঞ। তারপর সবচেয়ে বড় মসিবত হলো এই যে, উভয় তবকা পরস্পর অনেক দূরে অবস্থান করেন। তাদের মধ্যে পরস্পর কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক নেই। বরং তাদের মধ্যে পরস্পর না বিশ্বাস রয়েছে, না তা বৃদ্ধি করার জন্য নিজেরা এবং অন্যান্য জাতি অবিরাম চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এমন ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত, যারা উভয় সাইড সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সেজন্য ফলাফল এমন হচ্ছে যে, জাতির সঠিক পয়গাম তার আসলরূপে শাসকদের নিকট পৌঁছে না।

নবুওয়ত নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক

তবে হ্যাঁ, ওই সকল পরিস্থিতির বদলা এই হতে পারে যে, আলেমদের মধ্য হতে শুধু যারা আলেম বিল্লাহ এবং আরেফবিল্লাহ, যাদের অন্তর রূহানিয়্যাত দ্বারা ভরপুর এবং আল্লাহভক্ত, তারা পয়গাম নিয়ে যাবে। তারা নিজেদের ইখলাসপূর্ণ ও স্বার্থহীন রঙে, নবীদের নিয়মে উক্ত পয়গামকে স্বজাতি এবং

শাসক জাতির অন্তরে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন। আর সাধারণ আলেমগণ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাহলে তা যে ভাষাতেই পেশ করবে, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া জাহের হবে। অন্তর স্বীকৃতি দিবে যাবান স্বীকার করুক বা না করুক।

সুতরাং সাহাবাদের মতো যদি আরেফ বিল্লাগণ এ-ময়দানে নেমে পড়েন এবং দলিল-প্রমাণ এর স্থলে হাল ও শানের মাধ্যমে কাজ সাধন করেন, প্রচলিত প্রথার স্থলে হাকিকত ব্যবহার করেন আর সর্বসাধারণ তাদের অনুসরণ করেন, তাহলে ভাষা এবং চিন্তাধারার আলোচনাই থাকবে না। কিন্তু এমনটি অবশ্যই হবে যে, আন্দোলনের নমুনা কিছুটা বদলে যাবে এবং মনমানসিকতা ও আত্মা তাদের মতো তৈয়ার হবে। তারপর সাহাবা রা.-এর নমুনায় প্রচেষ্টা হবে, যার মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ ও প্রচেষ্টা সৃষ্টি হবে এবং শত্রুদের উপর প্রভাব ও ভীতি ছড়িয়ে পড়বে।

যাহোক, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ইসলামি আন্দোলনে তাবলীগি রং-নমুনা এবং উপদেশমূলক ও অনুগ্রহশীল নমুনা না থাকবে এবং দীনকে অগ্রে রেখে প্রচলিত নমুনাকে পরহার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি নমুনার ফলাফর প্রকাশ পারে না। কিন্তু শত আফসোস যে, হয়তো আজ এমন ব্যক্তিত্ব দুষ্কর বা বর্তমানে নেই অথবা তাদের অনুসন্ধান নেই।

ক্ষমতার দম্ভে বৈধ দাবিসমূহ অস্বীকারকারীদের পরিণতি

(১৫) তারপর এই পয়গাম এবং স্মারকলিপি বা আবেদনপত্রের তাবলীগ কি শুধু একবার-দুবার করাই যথেষ্ট? হযরত মুসা আ. এই তাবলীগে বছরের পর বছর অতিক্রম করেছেন এবং বিভিন্ন উপায়ে দাবিগুলা বুঝিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট করেছেন। সেগুলোকে প্রমাণ করে আল্লাহর পক্ষ হতে হুজ্জতপূর্ণ করেছেন। এই দীর্ঘ ও লাগাতার আবেদন ও তাবলীগ করার ফলাফল এমন হয়েছে যে, হক বিভিন্ন দিক থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। অস্বীকারকারী ফেরাউন এবং তার জাতির উপর আল্লাহ তায়ালার হুজ্জত পরিপূর্ণ হয়েছে এবং পরিশেষে তাদের পুনরায় অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী ও আযাব আসার ধারা শুরু হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ দিয়ে ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি ধ্বংস করে ফেরাউনের সামনে পরিষ্কার করে দিল যে, এ সমস্ত বালা-মসিবত শরয়ী ও আল্লাহপ্রদত্ত দাবিসমূহ না মানার কারণে অবতীর্ণ হচ্ছে।

অতএব, সময়-সময় ফেরাউন হযরত মুসা আ.-এর নিকট অপরাধ স্বীকার করে দোয়া এবং ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু সাথে-সাথে প্রতারণার পলিসির উপর স্থির থাকে এবং সকল দাবিকে উপেক্ষা করে বসে। এতে মুসা আ. ও তার অনুসারীদের ধৈর্য ও স্বাধীনতায় ভাটা পড়েনি এবং তাদের মজলুম হওয়া সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পরিশেষে কিবতি এবং সাবতি উভয়ের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে, দুর্বল জাতি গোলামি থেকে মুক্তি পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আর শক্তিশালী জাতি নফসের গোলাম হয়ে উভয় জগতে মসিবতে আক্রান্ত হয়েছে। কুরআনুল হাকীম এ-সম্পর্কে যে-সকল ঘটনার চিত্র এঁকেছে, তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন এবং তরজমা গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করা দরকার। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَ لَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ۭ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○ وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○ وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۭ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

আর আমি ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা বোঝে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে, এটাই আমাদের জন্য হওয়া উচিত, আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ আসত, তাহলে তা মুসা ও তাঁর সাথীদের কুলক্ষণ বলে বেড়াত। শুনে রাখো, তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহর এলেমে রয়েছে অথচ এরা তা জানে না। তারা আরো বলত, আমাদের উপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা কিন্তু তোমার কথা মানব না। সুতরাং আমি তাদের উপর অতিবৃষ্টির তুফান পাঠালাম (এতে ফেরাউন ভয় পেয়ে মুসা আ. সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিন্তু তুফান বন্ধ হওয়ার সাথে-সাথে পুনরায় অস্বীকার করে ফেলে)। তারপর আমি তাদের উপর পঙ্গপাল প্রেরণ করলাম, সেগুলো তাদের ফসল খেয়ে সাবাড় করে দিল। অতঃপর আবার ওয়াদাবদ্ধ হয়। কিন্তু মসিবত চলে যাওয়ার পর পুনরায় নিয়মমাফিক আবার ঔদ্ধত্যের উপর অটল থাকে। তখন আমি তাদের সঞ্চিত সম্পদে ঘুণ (উকুন) পোকা সৃষ্টি করে দিলাম। তারপর আবার মুসার দ্বারা দোয়া করিয়ে যখন উক্ত বালা দূর হলো এবং প্রশান্তি লাভ করল যে এখন শস্য পিষে আহার করা যাবে, তখন পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। তারপর আমি তাদের উপর ব্যাঙ পাঠালাম (যা দল বেঁধে তাদের খাবারে পড়তে থাকে, পাত্রে পড়তে থাকে, ফলে সব খাবার লুটপাট ও ধ্বংস হতে থাকে। আর ঘরে বসবাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তারপর পানি পান করা এমন কষ্টকর হয়ে যায় যে, তাদের সব পানি রক্তে পরিণত হয়। এমন অনেক নিদর্শন একের পর এক আসতে থাকে। সেগুলো ছিল প্রকাশ্য মুজেযা। তারপরও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ জাতি। আর যখন তাদের উপর কোনো আযাব (আসত, পতিত হতো), তখন বলত, হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর, যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে? আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার কথার উপর

ঈমান আনয়ন করব এবং বনি ইসরাইলদের মুক্তি দিয়ে তোমার সাথে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত, যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। তারপর আমি তাদের থেকে বদলা নিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং সেগুলোর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তাদেরকে আমি মালিক বানিয়েছি সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের, যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তোমার পালনকর্তার ওয়াদা (তোমাদের নবুওয়তের বিধানের উপর জমে থাকার কারণে)। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু, যা তৈরি করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চে (ইমারত) নির্মাণ করেছিল। *[সূরা আ'রাফ : ১৩০-১৩৭]*

ফেরাউন ও বনি ইসরাইলদের মধ্যকার পরস্পর আচরণের এই কুরআনি নকশাকে সামনে রাখুন। তারপর বৃটিশ ও হিন্দুস্তানি দুর্বল গোলামদের পরস্পর আচরণ ও ব্যবহারের উপর গভীর নজর দিন। ভারতবাসী নিজেদের গোলামির শিকল ভাঙ্গার জন্য যে পরিমাণ আবেদন, স্মারকলিপি এবং প্রতিবাদ পেশ করেছে তা মুসা আ.-এর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগও কার্যকর হয়নি। আর যাও হয়েছে তা পুরোপুরি সঠিক পন্থায় পেশ করা হয়নি। তবুও যতটুকু হয়েছে তাতে জেল ও জুলুমের মসিবত সহ্য করতে হয়েছে, ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে। ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। সেই পরিমাণ জালেম জাতির উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী এসেছে, জালেম জাতির উপর কমবেশি ভূমিকম্প এসেছে, কখনও কখনও তারা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়েছে। আবার সাথে-সাথে অস্বীকারও করা হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এগুলো তাদের জন্য সতর্কবার্তা। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ফেরাউন যুগের ন্যায়, শাসক জাতির তৈরি করা কারখানাগুলো এবং নির্মাণ শিল্পের বড় বড় ইমারাতগুলো সময়-সময় ধ্বংস

করা হচ্ছে। তাদের সুউচ্চ দালানগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে। তাদের লাখ লাখ মোটা ও বড় মানুষকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় যখন কোনো পরাজয়ের প্রান্ত দেখা দিয়েছে, তখন এই জাতি সাথে-সাথে ঘুরে হিন্দুস্তানী গোলামদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছে এবং সময়ক্ষেপণ ও টালবাহানা হিসেবে কিছু পার্লামেন্টারি পার্টি ভারত স্বাধীনের আওয়াজ উঠাত। তারা ভারতবাসীদের হামদর্দী অর্জন করে নিত। কখনও কোনো সাহেব লোকদেখানো স্বাধীনতার খেলনা নিয়ে ভারতবর্ষে ছুটে আসেন। কখনও রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির বিষয় আলোচনায় আসত। কখনও ভারতবর্ষকে সান্ত্বনাসুলভ তাদের যুদ্ধ বন্ধ করার শর্তে নামকাওয়াস্তে স্বাধীনতার অঙ্গীকারও করা হয়েছে। কিন্তু যখনই পরাজয়ের নিশানা দুর্বল হয়ে বিজয়ের আলামত দেখা দিত, তখন পুনরায় সমস্ত ওয়াদা ও চুক্তি এমনভাবে উঠে যেত যে, কেমন যেন সেগুলো কোনো মুখে ও কলমে কোনোদিন আসেনি। আর পূর্বের ন্যায় একগুঁয়েমি ও ঔদ্ধত্য থেকে যায়। অর্থাৎ যখন আযাব প্রকাশ পেত, তখন ফেরাউনের ন্যায় মজলুমদের প্রতি নজর ফেরাত আর বলা হতো, আমরা অতি সত্বর স্বাধীনতা প্রদান করব।

আর যখন আযাব সামান্য সময়ের জন্য সামনে থেকে সরে যেত, ঐ জাতি প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলত। তখন পুনরায় ওয়াদা ভঙ্গ করত। ফলে অঙ্গীকার বেগার হয়ে যেত। কিন্তু এই টালবাহানার ফলে ও কালক্ষেপণ এবং বাস্তবতা আড়াল করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ প্রতিশোধ টলবে না। অবশ্যই-অবশ্যই প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হচ্ছে, তাদেরকে ভূখণ্ডের পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। আর যারা ক্ষমতার দম্ভে প্রতিবাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না, তাদের নির্মাণ করা কারখানাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাদের উঁচু-উঁচু প্রাসাদগুলো মাথা নুয়ে থাকবে, মাটির সাথে মিশে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা দুর্বল জাতির জন্য পূর্ণ হবে, তোমার রবের সুন্দর বাণী পরিপূর্ণ হবে।

শর্ত হলো, ওই জাতি যেন হযরত মুসা আ. ও হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ না হয়।

ধারাবাহিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিশ্চিত ফলাফল হয়

আর তা এভাবে যে, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তার বাতলানো নিয়মে তাবলীগ ও প্রতিবাদ এবং আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদান করার কাজ এক ও

দুবারের উপর তুষ্ট থাকবে না বরং মুসভী স্টাইলে ধারাবাহিকভাবে উক্ত প্রচেষ্টা জোরদার ও বাতেনি হিম্মতের সাথে চালিয়ে যেতে হবে। মোটকথা, যদি তাবলীগি কাজে ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় এবং দাবি ও প্রতিবাদ জোরেশোরে হতে থাকে অপরদিকে নিজেদের জাতিরও যথাসম্ভব উন্নয়ন হতে থাকে, তাহলে কুদরতিভাবে হুজ্জত পূরণ ও সমাধানকারী ফলাফল এমন প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পাবে, যেগুলো সময়ের প্রকাশ্য আসবাব দ্বারা কল্পনাও করা যায় না–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ

যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য সকল পথ সুগম করে দেন। তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কোন দিন কল্পনাও করেনি। *[সূরা তালাক : আয়াত ২, ৩]*

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *[সূরা তালাক : আয়াত ৩*

আমি একথা বলিনি যে, উলামায়ে হাক্কানীদের বাতলানো কুরআনী প্রোগ্রামের উপর চলার কারণে প্রথম দিন থেকেই সফলতা প্রকাশ পাবে। অথবা সমস্ত মুশকিল প্রথম দিন থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথবা অনুসারী ও অনুশীলনকারীদের পক্ষ হতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

কিন্তু জরুরি হলো, উক্ত কাজে ধৈর্যের সাথে লেগে থাগলে গায়েবী সাহায্য সাথী হবে এবং ফলাফল ও কামিয়াবী নিশ্চিত এবং অকাট্য হবে। হযরত মুসা আ.-এর আদর্শের মধ্যে এই হাকিকত ও বাস্তবতাকে দেখে নেওয়া হোক। হযরত মুসা আ. আপন কওমকে বললেন–

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۖ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

মুসা আ. আপন কওমকে বললেন, আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ-ভূখণ্ড আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকারী বানান আর পরিণামে সফলতা তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করে। *[সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮]*

এতে মুসা আ.-এর কওম কিছুটা ভীত ও অধৈর্য হয়ে বললেন, যেমনটি আজও দুর্বল মনের মানুষ বলে থাকে–

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ

কওমের লোকেরা বলতে লাগল, আমরা তো সর্বদা মসিবতে লিপ্ত থাকি, আপনার আগমনের পূর্বেও এবং পরেও। *[সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৯]*

অর্থাৎ আপনার অনুসরণের দ্বারা পরিণামে আমরা কী পেলাম? আমরা তো গোলামই রয়ে গেলাম আর কিবতিদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়ে গেল।

তখন মুসা আ. বললেন–

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

মুসা বলল, তোমাদের পালনকর্তা অতি শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে দেশের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। অর্থাৎ এমন কাজে তাড়াহুড়ো করা যাবে না, কাজ করে যাও আর গায়েবী সূক্ষ্ম সাহায্যের অপেক্ষায় থাক। *[সূরা আরাফ : সূরা ১২৯]*

সুতরাং আজও বনি ইসরাইলের মতো নবুওয়তের অনুসরণে ব্যাপক তাবলীগ এবং লাগাতার প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং প্রয়োজনীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। অনবরত তাবলীগ করার মধ্যেও শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা করে তাঁর অনুসারী হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং দীনি আন্দাজে এগিয়ে যাওয়া, আর নিজেদের জাতির মুক্তির পাশাপাশি বিরোধী জাতিকে আল্লাহর সত্য পয়গাম অনুসরণযোগ্য প্রভাবের সাথে পৌঁছাতে থাকাই আসল মিশন, যার উপর আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক সফরতা নিশ্চিত।

দীনি লিডারদের নেতৃত্বে এসে প্রথম দিনই বলতে লাগল–

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ

আপনার রাহনুমার পূর্বেও এমন মসিবত ছিল, আপনার

রাহনুমার পরেও তাতে কোন পার্থক্য হলো না।

এমন ধারণা নবুওয়তের মানশার উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং স্বভাবজাত উত্তম আদর্শেরও (সবর ও ধৈর্য) বিপরীত। অতএব আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং প্রচলিত প্রথার উর্ধ্বে উঠে হাকায়েকের আঁচল ধারণ করে তাবলীগি আদর্শে প্রতিবাদ করে যাওয়া এবং সর্বদা তাবলীগ চালিয়ে যাওয়া দরকার, যাতে উম্মতে মুসলিমার পয়গাম প্রতিটি কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় এবং গুঞ্জন করতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা

আজ আমরা যদি তাবলীগি কর্মের ব্যাপারে চিন্তা করি, তাহলে এতটুকু সীমারেখা পর্যন্ত করি যে, নিজেদের স্বজাতির নিকট মাসায়েল তাবলীগ করে তাদের সংশোধনের চিন্তা করি। অবশ্যই তা গুরুত্বপূর্ণ ফরজসমূহের একটি অথবা কোনো উন্নত ও উচ্চতর পদক্ষেপ যদি নিতে চায়, তাহলে ইউরোপ-আমেরিকাতে আমাদের মুবাল্লিগ পৌছানো উচিত। অবশ্যই এতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমাদের একথা ভাবার প্রয়োজন নেই যে, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার নির্যাস হলো, তারা ভারত ও ভারত জাতিকে জোঁকের মতো চুষে খাচ্ছে এবং ঘুণের ন্যায় কেটে দিচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তারা আজ ভারতবর্ষের সিংহাসনে সমাসীন রয়েছে। তারা কি এর হকদার ও অধিকার যে, তাদের কর্ণকে আসল মানবতার পয়গাম দ্বারা পরিচিত করানো হবে, যাতে তারা নিজেরাও মানবরূপী পশুত্ব মনোভাব থেকে বের হতে পারে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাও প্রভাবান্বিত হবে?

আজ আমাদের কি কর্তব্য নয় যে, ইসলামকে আমরা সমগ্র বিশ্বের জন্য সার্বজনীন কানুন জ্ঞান করি। আর যাকে আমরা শুধু ধর্ম সম্পর্কিত দীন মনে করি না বরং রাষ্ট্রীয় দীনও মনে করি। আমরা ইসলামকে শান ও শওকতের সাথে বর্তমান রাজনীতির তৈরি করা আড্ডাসমূহে পৌছাব এবং কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্কেও প্রবেশ করানোর চেষ্টা করব। যারা পৃথিবীকে জন্মগত ও স্বভাবজাত রাজনীতি হতে সরিয়ে প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজির কৃত্রিম এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কাদার মধ্যে মিশ্রিত করে ফেলেছে?

প্রয়োজন হলো, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে নিজেদের জাতিকে রাজনৈতিক উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রদান করেন এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও

স্থবিরতাকে দূর করার চিন্তা-ফিকির করেন, ওখানে একটি ভিন্ন মিশন এবং পৃথক উদ্দেশ্য পূরণ হিসেবে তাদের কর্মপরিধিতে এও থাকতে পারে যে, জাতির যোগ্য ব্যক্তিবর্গ যারা হুকুমতের চেয়ারে বসে আছেন, তাদের কর্নে শুধু স্বাধীনতার দাবিও পৌছাবে না বরং তাদেরকে আল্লাহপ্রদত্ত কানুনগুলোও পরিচয় করাতে থাকবে। অর্থাৎ দীনের তাবলীগও করতে থাকবে। আর তা দশ/বিশ দিন নয় বরং স্বাধীনতার দাবি এবং আন্দোলন ও প্রতিবাদ এবং ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ওই পয়গাম পৌছানোও ততদিন পর্যন্ত কায়েম থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আন্দোলনের ফসল প্রকাশ না হয়।

উদাহরণস্বরূপ যদি দশ-পাঁচ বছর লাগাতার পদ্ধতিতে ইসলামিক কানুন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে-সাথে দীনি ও রুহানি পয়গাম চারিত্রিক গুণাবলিতে তাদের যেহান ও মস্তিষ্কে ঢালতে থাকা হয় এবং চলমান তাবলীগের স্বভাবজাত ও জন্মগত প্রভাব দ্বারা বিশ্বস্ততার সাথে এ কথা বোঝানো হয় যে, বিশ্ব শান্তির রহস্যভেদ এই আল্লাহপ্রদত্ত কানুন ও সংবিধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাহলে কি এমনটি অসম্ভব নয় যে, স্বয়ং শাসক জাতির অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আমাদের স্লোগানদাতা বনে যাবে?

তারপর যে কাজ আমরা সরকারের বাহিরে থেকে আঞ্জাম দিতে চাচ্ছি, সেই কাজ স্বয়ং সরকারের অফিস থেকে আঞ্জাম পেতে থাকবে এবং যে বিষয়গুলো আমরা জাতীয় প্লাটফর্ম দ্বারা কষ্ট করে হুকুমতের অন্তর পর্যন্ত পৌছাতাম, সেগুলো হুকুমতের নিজের বিষয়ে পরিণত হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের এমন চেষ্টার পরও যদি এমনটি না হয় অর্থাৎ ফেরাউনি হুকুমতের ন্যায় বর্তমান বৃটিশ হুকুমতের বক্রতা ও অহংকার দম্ভ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে এতটুকু হবে যে, লাগাতার পয়গাম পৌছানোর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুজ্জত ও দলিল পেশ করা পূর্ণতা লাভ করে এমন গায়েবী সুরত প্রকাশ পাবে যে, হয়তো এই জাতি মাথানত করবে অথবা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এক মুহূর্তে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং তারা নিজেদের মন্দ কর্মে শাস্তি পেয়ে যাবে আর আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

অতঃপর যারা পাপী ছিল তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। আর ঈমানদারদের সাহায্য করা, বিজয়ী করা আমার

দায়িত্ব। *[সূরা রূম : আয়াত ৪৭]*

কিন্তু এই পরিকল্পনা এমতাবস্থায় বাস্তবায়িত হতে পারে যে, স্বয়ং জাতি ভাষ্যকারগণ দীনি এবং চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ড এবং চালচলন ও কথাবার্তা পাশাপাশি সাজসজ্জা ইত্যাদি থেকে বন্দেগীর ইবাদতের আলামত প্রকাশ পাবে। মুখমণ্ডলে আন্তরিক সততা চমকাতে থাকবে এবং যাবনে সত্য কথা ও হেকমত জারি থাকবে। আর তারা বাহ্যিকভাবে জমিনে থাকবে এবং বাতেনিভাবে আরশে থাকবে। তারপর তাদের পক্ষ থেকে প্রদান করা পয়গাম, রাজনৈতিক প্রতারণা ধোঁকাবাজি এবং কথা ও কাজের বিপরীত অন্তরের গোপন উদ্দেশ্য বহন করার স্থলে সুস্পষ্ট সততা ও বাস্তবতা এবং আমানতদারিতা ও লিল্লাহিয়্যাতের আলামাত বহন করবে, প্রকাশ পাবে, যাতে বাস্তবরূপে নিজেদের এবং জগতের সকল জ্ঞাতিসমূহের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষার আন্তরিক মনোনিবেশ থাকবে। যেমনটি ইতোপূর্বে হযরত মুসা আ.-এর আদর্শ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি ফেরাউন ও ফেরাউনদের নিকট স্বাধীনতা লাভের জন্যও গেছেন এবং সাথে-সাথে পরিপূর্ণ রুহানিয়্যাত, পবিত্রতা, স্বচ্ছতার ও সততার সাথে আল্লাহ পাকের পয়গাম স্বয়ং ফেরাউনকেও পৌঁছিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের পরিচয় দিয়েছেন এবং রব হওয়ার দলিলও পেশ করেছেন–

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ

তোমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৫০]*

রিসালাতের হাকিকত বুঝিয়েছেন। অতঃপর ফেরাউনের সাথে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী ভাব প্রদর্শন করেছেন, যাতে কোনো প্রকার রীতি পূরণ করার সামান্যতম অবকাশ ছিল না।

যুগের ফেরাউনকে মুসুভী আদর্শের নেতৃত্বই পরাজিত করতে পারে

তারপর শিরোনাম বর্ণনা করার মধ্যে কোনো প্রকার অহংকারী বা আদেশসূচক ভাব ছিল না–

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ○ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ○

তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। *[সূরা নাযিআত : ১৮-১৯]*

একথা পরিষ্কার যে, এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট এবং সততা ও পবিত্র পদ্ধতির সম্বোধনের, যা মুসুবী ও মুহাম্মদী আদর্শ এবং সকল নবী ও নায়েবে নবীদের আদর্শ, যা কুদরতিভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের অন্তরে যে পরিমাণ প্রভাব ফেলবে, সেই পরিমাণ প্রভাব আমাদের ধোঁকাবাজ রাজনীতি কখনও ফেলতে পারবে না। এই প্রচলিত পন্থায় দুমশন আমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এবং বেশি চতুর প্রমাণিত হয়েছে।

এ-সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

انكم لن تسعوهم باموالكم ولكن تسعوهم باخلاقكم

তোমরা পৃথিবীর জাতি-গোষ্ঠীসমূহের উপর নিজেদের ধন-দৌলত (অর্থাৎ বাহ্যিক মাধ্যম) দ্বারা বিজয়ী হতে পারবে না। তবে নিজেদের চরিত্র তথা আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বিজয়ী হতে পারবে।

সুতরাং এক ব্যক্তির অভিমত অথবা কোনো দলের পাস করা প্রস্তাব অতঃপর ব্যক্তিগত ও দলীয় কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত, আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে; কিন্তু খোদায়ী পয়গাম, যা পরিষ্কার ও স্বচ্ছভাবে সহজতা ও যুক্তিসম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোনো বাহাস ও আলোচনা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর অভিমত ও কিয়াস দ্বারা আবিষ্কার করা প্রোগ্রামসমূহে এমন সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের দাঁড় করাতে পারবে, যারা সেই প্রস্তাবনার মধ্যে বাহাস ও অভিযোগ উত্থাপন করবে, সেগুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য নিজেদের মেধা ও বুদ্ধির যোগ্যতাকে ব্যয় করবে, যা ওই দিনের জন্য তাদের মধ্য সৃষ্টি করা হয়। অথবা সেগুলোর বিপরীত দাবি ও প্রতিবাদ পেশ করবে, যাতে হুকুমতে কাল ক্ষেপন ও গড়িমসি করার সুযোগ মিলে যায়। কিন্তু দীনের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট পয়গাম যখন তা ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী আত্মশুদ্ধি এবং রূহানিয়াত সম্বলিত হবে, তখন বাহ্যপূজারী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিবাদ করানো সহজে সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, এমতাবস্থায় এমন করা সম্ভব যে ঔদ্ধত্য শান প্রদর্শন করে সরাসরি উক্ত পয়গামকে রদ করা এবং ফেরাউনের মতো মুসা গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে একথা বলে দরবার থেকে হটিয়ে দিতে পারবে যে, 'আমি তো মুসাকে

মিথ্যাবাদী মনে করি।'

অথবা ফেরাউনের মতো একথা বলে স্বাধীনতাকামীদেরকে ধমকিয়ে দেবে যে 'আমি তোমাদেরকে বন্দি করব।'

অথবা একথা বলে দিবে যে, 'তোমাদের সবাইকে খেজুর বৃক্ষের শূলে চড়াব।'

অথবা ধমকি ও হুমকি দেওয়া হবে যে, 'আমরা এখনই তাদের ছেলেদের হত্যা করব এবং মেয়েদের জীবিত রাখব। কেননা, আমরা সর্বদিক থেকে জয়ী ও প্রভাব বিস্তারকারী।'

এ-সবকিছু বলা হতে পারে এবং বলা হচ্ছে ও করা হচ্ছে। কিন্তু হাকীকি ইজ্জতকে বানানো হুজ্জত দ্বারা রদ করা যায় না। বরং এমতাবস্থায় পয়গামের শিকড় আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়। আর মুখাতাব জাতির শিকড় অনুভূতিহীনভাবে অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে।

অতএব ফেরাউন যদি উল্লিখিত ধমকগুলো দিয়ে থাকে, তাহলে এতে খোদায়ী পয়গাম অথবা পয়গাম বাহকের মাথা কবে নিচু হয়েছে? বরং এমন হয়েছে যে, এ সকল পরাজয় তারই বাটে পড়েছে, যে প্রতাপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দাবিদার ছিল। সুতরাং আজও যদি উম্মতে মুসলিমার পয়গাম সেই নিয়মে হযরত মুসা আ.-এর সিফাতের সাথে যুগের ফেরাউনের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং এভাবে চলতে থাকে, তাহলে হতে পারে তাদের জেল, ফাঁসি, হত্যা ইত্যাদির ধমকি দেওয়া হবে। কিন্তু এতে খোদায়ী পয়গাম এবং পয়গাম বাহকের মাথা নিচু হতে পারে না এবং না পয়গামের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ খাড়া করতে পারবে। বরং উম্মতের বিজয় হবে এবং দুশমনদের প্রকাশ্য পরাজয় হবে। ফলে গায়েবী ফলাফল প্রকাশ পাবে এবং এই হাকিকত আত্মপ্রকাশ করবে যে–

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ○

অতঃপর হক বিজয়ী হলো এবং তারা যা কিছু বানিয়ে ছিল সবই বেকার হলো। অতএব তারা পরাজিত হলো এবং অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হলো। *[সূরা আ'রাফ :১১৮-১১৯]*

সারকথা হলো, অসহিংস আন্দোলনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো স্বাধীনতার দাবির সাথে সাথে বিরোধী জাতির নিকট হকের পয়গাম পৌঁছাতে

থাকা এবং বিরুদ্ধবাদীদের ধমক ও তিরস্কারকারীদের তিরস্কার ও বদনাম রটনাকে উপেক্ষা করে নববী রঙ্গে রঙিন হয়ে হেদায়েত দিতে থাকা, যার পরিণাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিশ্চিত ওয়াদা লাভ এবং সাথে-সাথে নিশ্চিত গায়েবী সাহায্য।

ইসলামি স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও ফলাফল

যাহোক, হযরত মুসা আ. নিজেকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে পরিচয় করান এবং নিজের পজিশন সুস্পষ্ট করেন। তারপর প্রথমেই এই পয়গাম পৌঁছান যে–

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ

হে ফেরাউন! বনি ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও, তাদের স্বাধীনতা দাও, তাদের কষ্ট দেবে না। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৭]*

(১৬) এতে পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম শাসিত জাতি অমুসলিম শাসক জাতির নিকট পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আবেদন ও দাবি পেশ করবে। আর গোলামির ন্যায় নিকৃষ্ট শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ফরজ। সেজন্য বনি ইসরাইলকে স্বাধীন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীকে প্রেরণ করেন, যিনি ফেরাউনের ভরপুর দরবারে পৌঁছে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় এই আবেদন ও দাবি পেশ করলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা ইতপূর্বে করা হয়েছে।

(১৭) এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। আর তা এই যে, এ-জাতীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ বনি ইসরাইলদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য কোনো দেশ ও জাতীয়তার স্বাধীনতা ছিল না। বরং ধর্মের স্বাধীনতা ছিল। জাতিকে আজাদ করা হয়েছে ধর্মের আজাদীর জন্য। অন্যভাবে বলা যায়, উক্ত আযাদী দ্বারা কোনো জাগতিক প্রাচুর্য বা দুনিয়াবী স্বাদ অর্জন ও পূরণ অথবা কোনো প্রকার প্রচলিত ও বাহ্যিক মর্যাদা ও পদ অর্জন করার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, প্রথমত তো স্বাধীনতার জন্য পয়গম্বরকে নির্বাচন করা হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, একজন পয়গম্বরের টপ টু বটম দীন থাকে। তাঁর কর্ম দীন, তাঁর উদ্দেশ্য ও নতিজা দীন। এজন্য পয়গাম্বর আ.-এর স্বাধীনতা চাওয়া, কেয়ামত পর্যন্ত জাগতিক উদ্দেশ্যে হবে না। একে আয়াতের শিরোনাম ও মর্ম দ্বারা এভাবে বুঝে নিন যে–

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

এ-আয়াতে বনি ইসরাইলের পাঠানো রিসালাতের দাবিকে ف অব্যয় দ্বারা প্রশাখা করা হয়েছে, যার সারমর্ম হলো, আমি যেহেতু পয়গম্বর তাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতা চাওয়ার মানশা ছিল পয়গম্বরি। আর একথা সুস্পষ্ট যে, জাগতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে দুনিয়াবী সম্পদ দ্বারা স্বাধীনভাবে উপকৃত হওয়া, জাগতিক আনন্দের কামনা-বাসনা, আরাম ও প্রাচুর্য ইত্যাদি পয়গম্বরি স্বাধীনতার সাথে একত্রিত হতে পারে না। সেজন্য একজন পয়গম্বর এমন আযাদী ও দাবি করতে পারেন না।

এতে এ-বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, ইসলামি স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হালুয়া-রুটি অর্জন নয়, ধন-সম্পদ ও কোনো কিছু প্রাপ্তি নয়। আজ যদি আমরা আমাদের স্টেইজসমূহ হতে হালুয়া-রুটি এবং জাগতিক কল্যাণের তুচ্ছ উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়াই এবং এহেন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং কয়েক দিনের আনন্দ ভোগের দুর্বল ভিত্তির উপর নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা তথা আন্দোলনের ইমারাত স্থাপন করতে থাকি, তাহলে সেই দিন দূরে নয় যে, এই শিকড়হীন নির্মাণ দুর্বল ভিতের কারণে বিলুপ্ত হতে হবে। আর নাউযুবিল্লাহ! আমাদেরকে এ-আয়াতের মিসদাক ও সম্বোধন স্থির করা হবে–

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○

তারাই সে লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎ কর্ম করছে। *[সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১০৪]*

এ কারণে হযরত মুসা আ. স্বাধীনতা ও জাতির মুক্তির চেষ্টা-প্রচেষ্টার সূচনা দীনি তাবলীগ দ্বারা করেছেন। রুবুবিয়্যাত ও রিসালাতের মাঝে রেখে আযাদীর দাবি করলেন। অর্থাৎ চিন্তা ও ক্রোধ এজন্য ছিল না যে, আমাদের দুনিয়া আযাদ নেই। বরং দীন আযাদ না হওয়ার কারণে ছিল। রুবুবিয়্যাত (প্রভূত্ব) ও রিসালাতের নিদর্শনসমূহ সমন্বয় নয়, এগুলোর অস্বীকারকারীগণ দুনিয়ায় বিজয়ী হয়ে গেছে। তারা পৃথিবীতে দীনহীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে দুনিয়াবাসী জাগতিক তুচ্ছ উদ্দেশ্যে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা শুরু করছে। অপরদিকে দীনি বুনিয়াদের আনুগত্যকারী

দুজন পরাজিত হয়েছে। ফলে দিয়ানত ও আমানতদারদ্বয় একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং তারা দিয়ানতের বিধিবিধানকে পৃথিবীতে প্রচার-প্রসারে করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আর দীনি বিধানকে শিকল পরানো হয়েছে।

সুতরাং এমন অভিযোগ ছিল না যে, আমাদের জাগতিক আরাম ও আয়েশে অথবা হালুয়া-রুটি এবং সাজসজ্জায় ভাটা পড়েছে, স্বাধীন মতো জীবন-যাপন করতে পারছি না। আমাদের বাংলো এবং দালান-কোঠা নেই, আমাদের বাড়িতে প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা নেই অথবা আমরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বা আমাদের অসম্মান করা হচ্ছে এবং ইজ্জত ও মর্যাদা অন্যদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বরং তাদের বাস্তবে অভিযোগ ছিল শুধু দিয়ানত ও দীনদারী পরাজিত এবং স্বাধীন না থাকার। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাওয়া বা ইজ্জত সম্মান চাওয়া বা প্রাধান্য ও নেতৃত্ব চাওয়া যতটুকু ছিল সেগুলোও দীনের খাতিরে চাওয়া হয়েছিল। অন্যথায় এমনটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, হযরত মুসা আ. নিজে ফেরাউনকে জাগতিক কর্মে ডুবে থাকার কারণে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন। তারপর নিজেই নিজেদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থির করবেন সেই জাগতিক কর্মাবলিকে। নাউযুবিল্লাহ!

অতএব হযরত মুসা আ.-এর স্বাধীনতা চাওয়ার সারনির্যাস হলো এমন যে, হে ফেরাউন! যেহেতু তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদাতকারী নও, সেজন্য তোমার অধীনে থেকে বনি ইসরাইলরা আল্লাহপূজারী বলতে পারবে না। না তাদের শরয়ী ইলম অবশিষ্ট থাকবে, না তাদের দীন ও বর্ণিত ধর্ম কায়েম থাকবে, না তাদের আমলি আলামাত উন্নত হবে, না তাদের জাগতিক ও বাহ্যিক জীবনোপকরণ অবশিষ্ট থাকবে, যেগুলো দীন শক্তিশালীকরণে ব্যবহার হবে। সেজন্য বনি ইসরাইলকে মুক্তি দাও, আমার সাথে দিয়ে দাও, যাতে আমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের পথে চালাতে পারি এবং তুমিও তোমার প্রভু এবং তাঁর প্রেরণ করা রাসূলকে চিনতে পার এবং মানতে পার।

এতে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হলো যে, মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবিতে জাগতিক অভিযোগ বা দুনিয়াবী মসিবতসমূহ অথবা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠের আলোচনা বা হালুয়া-রুটি এবং আহারাদীর উদ্দেশ্যে দখল না থাকা উচিত। যদিও সেগুলো আসে, তাহলে দীন বিপর্যয়ের মাধ্যম হিসেবে থাকবে, আসল ও মূল মাকসাদ হিসেবে নয়।

স্বাধীনতার দাবি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে হওয়া উচিত

অতএব ভারতবর্ষের মুসলিম জনগণের পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বাক্যে স্বাধীনতার দাবি ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে করা উচিত। তাদের নিকট দীনি মসিবত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। জাগতিক মসিবত নয়। কারণ, দীনি মসিবত-সমস্যা দূর হয়ে গেলে দুনিয়াবী সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হয়ে যাবে। এ কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য জাতির কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য যদি ভীতিপ্রদ সাব্যস্ত করতেন, তাহলে তা করতেন দীনি মসিবতের কারণে– দুনিয়াবী মসিবতের ভিত্তিতে নয়। সে কারণে নিম্নের নববী দোয়ার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টতা ও লঘিষ্টতার সম্মান ও অসম্মান এবং প্রাধান্য ও পরাস্ততার বর্ণনা রয়েছে; কিন্তু প্রাথমিক মাকসাদ দীনি মসিবত দূরীকরণকে রাখা হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়, যদি ওই সকল দুনিয়াবী মসিবতকে কষ্টদায়ক মনে করে থাকেন, তাহলে তা দীনের খাতিরে করেছেন– দুনিয়ার খাতিরে নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ–

رب لا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের দীনে মসিবত দিয়ো না এবং দুনিয়াকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ বানিও না। আর দুনিয়াকে আমাদের ইলমের উৎসস্থল বানিও না (যে তার প্রাকৃতিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং জাগতিক যিন্দেগীর জোড় ও তোড় তথা কলাকৌশলকে সবচেয়ে বড় ইলম ভাবতে থাকি)। আর আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ প্রান্ত দুনিয়া স্থির করো না। আমাদের উপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিও না, যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না।

হে আল্লাহ! আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, লঘু কর না। আমাদের সম্মান দান কর, অসম্মান থেকে বাঁচাও। আমাদের বিজয় দান কর, পরাজিত কর না।

নিম্নের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, হালুয়া-রুটি তথা ধন-সম্পদ আমাদের নিকট কোনো গুরুত্ব রাখে না এবং দরিদ্রতা ও ক্ষুধার্ততা কোনো বুনিয়াদী মসিবত নয়। আসল মসিবত দুনিয়া তথা সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ–

والله ما اخشى عليكم الفقر ولكن مما اخشى عليكم من بعدى

زهرة الدنيا تفتح عليكم فتهلكم كما اهلكتهم

আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্রতা ও ক্ষুধার্ততার ভয় করি না। কিন্তু আমার পর আমাকে যে জিনিস ভীত করছে, তা হলো, দুনিয়ার শস্য-শ্যামলতা যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। আর তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করবে যেমনভাবে পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে (এবং সেভাবে বর্তমান মানবজাতিকে ধ্বংস করে চলছে)।

উক্ত বাস্তবতাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা.-এর উপর প্রকাশ করলেন। যখন ইলার ঘটনাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত ঘরে অবস্থান করছিলেন, তখন হযরত উমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর ঘরের সর্বসাকুল্য সামগ্রী একটি চামড়ার ব্যাগ, যাতে কিছু মধু রয়েছে, একটি চাটাই যার উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আরাম করেন আর চাটাইয়ের বেতের দাগ তার দেহ মোবারকে অংকিত হয়েছে। তখন কষ্ট পেয়ে হযরত উমর রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই কায়সার ও কিসরা আল্লাহর দুশমনরা নরম গালিচার উপর আরাম করে থাকে আর আল্লাহর রাসূলের চৌকিও জোটে না। আল্লাহর নিকট দোয়া করা হোক তিনি যেন মুসলমানদের স্বচ্ছলতা দান করেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা.কে সম্বোধন করে সতর্কতাস্বরূপ বললেন–

افى شك انت يا ابن الخطاب هؤلاء الذين عجلت لهم طيباتهم فى

الحيوة الدنيا ولا خلاق لهم فى الاخرة

হে খাত্তাবের বেটা! তুমি কি এখনও সন্দেহে পড়ে আছ? (এই কিসরা ও কায়সার) তারা এমন মানুষ, যাদের নেয়ামত

দুনিয়াতেই দিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই (এ বিষয়টি কি এমন কিছু যে তার উপর ঈর্ষা করা যেতে পারে)।

আল্লাহওয়ালারা যেহেতু নবীদের উত্তরাধিকারী হন, সেজন্য তাদেরও উপর নবীদের শান প্রবল হয়। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.কে যখন বৃটিশ সরকারের কর্মচীরা হেরেম শরীফে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদান করে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল হামদুলিল্লাহ! মসিবতের কারণে গ্রেফতার হয়েছি, কোন পাপের কারণে নয়।' (অর্থাৎ আল্লাহর শুকর যে, আমি মসিবতে গ্রেফতার হয়েছি, গুনাহে নয়)। এতে প্রমাণিত হয়, মাসিয়াত দীনি মসিবত। সেজন্য তাতে লিপ্ত না হওয়ার কারণে আল্লাহ শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন।

এতে সুস্পষ্ট হয়, তাদের নিকট দুনিয়ার মসিবত কোনো জিনিসই নয়। আর না তা কোনো অভিযোগ যোগ্য বিষয় যে, দুনিয়ার পরিবর্তন আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বনি আদমের উপকারের জন্য প্রেরণ করা হয়। কখনও তা থেকে মন্দ কাফফারার উদ্দেশ্য হয়, কখনও মর্যাদার উন্নতি।

গুরুতর মসিবত হলো দীনি মসিবত। আর দীনি মসিবতসমূহের চূড়ান্ত ও সম্পূরক ধাপ হলো এই যে, দীন পরাধীন থাকা আর দীনদার লোকেরা গোলামিতে লিপ্ত হয়ে স্বাধীনভাবে দীনের নিদর্শনাবলিকে কায়েম ও পালন করতে না পারা।

সুতরাং আজও যখন হিন্দুস্তানে দীন স্বাধীন নয়, দীনের নিদর্শনগুলোকে মুসলমান মনমতো কায়েম ও পালন করতে পারছে না, না নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক দীনি নিদর্শনাবলিকে সমুন্নত করতে পারছে। অতএব উপরের আয়াতের আলোকে উসুওয়ায়ে মুসুবী হিসেবে মুসলমানদের উপর ফরজ কর্তব্য হলো তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলন করবে, দীনের নামে করবে। দীনি রঙে করবে, দীনি ব্যক্তিদের দ্বারা করবে, সাধারণ জনগণের মধ্যে দীন ও দীনের গুরুত্বের জযবা ও আগ্রহ সৃষ্টি করবে যে, ইসলামে স্বাধীনতা দাবির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো দীনি স্বাধীনতা, যার উপর দুনিয়াবী স্বাধীনতা বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সজ্জিত ও বিন্যস্ত হয়ে যাবে।

ইসলামি স্বাধীনতার দুটি পথ

ইসলামে স্বাধীনতা অর্জনের দুটি পথ– জিহাদ ও হিজরত। অতঃপর প্রত্যেকটির দুটি করে শাখা রয়েছে। প্রথমটি জিহাদ বিস্‌সিনান অর্থাৎ অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করা আর অপরটি হলো জিহাদ বিল লিসান অর্থাৎ সত্য কথা জালেম বাদশাহর কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তেমনি হিজরতেরও দুটি শাখা রয়েছে। প্রথমটি হলো হিজরতে মাকানি তথা কাফেরদের দেশ থেকে মুসলিম দেশে স্থানান্তরিত হওয়া আর দ্বিতীয়টি হলো হিজরতের আরকানি অর্থাৎ পাপ কাজ পরিত্যাগ করা, তবিয়তের এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে শরীয়তের অঞ্চলে চলে যাওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ও হিজরত কোনোটার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হালুয়া-রুটি বা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ নয় অথবা প্রাচুর্য, বিলাসিতা বা জাগতিক সুখ নয়। বরং শুধু দীনের স্বাধীনতা ও সমুন্নত করা উদ্দেশ্য। জিহাদের উদ্দেশ্য তো সুস্পষ্ট যে, শুধু আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা। যে সম্পর্কে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহয় হাজারো সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। হিজরতও এজন্য করানো হয়নি যে, মানুষের মধ্যে জীবনোপকরণ হ্রাস হয়ে পড়েছিল এবং তাদের হালুয়া-রুটিতে ঘাটতি পড়েছিল। তাই তাদের জন্য কাফেরের দেশত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বরং স্রেফ এজন্য ছিল যে, তাদের দীনের উপর মসিবত নেমে আসছিল।

যেমন ইসলামের সূচনাকালে দুটি হিজরত হয়েছিল। হিজরতে হাবশা ও হিজরতে মদিনা। তবে উভয় হিজরত ছিল একই কারণে। আর তা হলো দীনের হেফাজত– জীবনোপকরণের হেফাজত নয়।

আর যেহেতু মদীনা হিজরতের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যের প্রাধান্য ছিল, সেজন্য হিজরতে মদিনা হিজরতে হাবশা হতে উত্তম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, হিজরতে হাবশার মধ্যে মুহাজিরদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আপন দীন হেফাজত করা। অতএব, এ-হিজরতের নমুনা ছিল ফিৎনা হতে দূরে সরে যাওয়া। অর্থাৎ দীনের মাঝে ফিৎনা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ফিৎনার স্থান পরিত্যাগ করা হলো, যাতে দীন হিফাজত থাকে। আর মদীনায় হিজরতের মধ্যে রাসূলকে সাহায্য করা এবং দীনের শান-শওকতের বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ শুধু আপন দীন সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং শান ও শওকতের সাথে অন্যদের নিকট দীনের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল।

উদ্দেশ্য হিসেবে উভয় হিজরত প্রশংসিত ও পুণ্যবান ছিল যে, শুধু আপন দীনের হেফাজতের জন্য দারুল কুফর পরিত্যাগ করাও আসল দীন। আর দীনের মাথা উঁচু করা, দীন সমুন্নত করাও দীন। কিন্তু প্রথম সুরতে নিজেদের কিছুটা দুর্বলতা ও অক্ষমতা ফুটে ওঠে, যাকে সরাসরি ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ বলা যায় না। আর দ্বিতীয় সুরতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা যা সরাসরি ইলায়ে দীন বা দীন সমুন্নত করা। সেজন্য আবশ্যকভাবে হিজরতে মদীনা হিজরতে হাবশা থেকে উত্তম প্রমাণিত হয়। এজন্য হিজরতের কথা বললে সাধারণত মদীনায় হিজরত বুঝে আসে যে, সেই হিজরতই পরিপূর্ণ ও কাফের থেকে হিজরত।

মোটকথা, যে সুরতে হিজরত করুক না কেন কারো উদ্দেশ্য এমন ছিল না যে জীবনোপকরণের সংকীর্ণতা হতে বাঁচা বা দুনিয়াবী মসিবতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ত্যাগ করা। আর যদি কোনো রকম উদ্দেশ্য হয়েও থাকে, তাহলে তাও ছিল দীনের গরজে, দীনের খাতিরে। সেজন্য পরিণামে উভয় হিজরতের মাকসাদ ছিল ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ। এ কারণেই হিজরতের প্রাক্কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার আফসোস ও হতাশা প্রকাশ করেননি যে, মাতৃভূমি ও বাপ-দাদার ভিটেমাটি আমার থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাচ্ছি, মানুষ ও দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বরং বাইতুল্লাহকে আফসোস ও হতাশার সাথে দেখে বলেছিলেন, আমার কওম যদি আমাকে দেশ হতে বিতাড়িত না করত, তাহলে আমি তোমাকে কোনোদিনও ছেড়ে চলে যেতাম না।

এতে প্রমাণিত হয় হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নজরে না মাতৃভূমি ছিল, না বংশ ও গোষ্ঠী ছিল। বরং আল্লাহ ও বাইতুল্লাহ ছিল। মক্কা শহর বা হিজায অঞ্চল এবং স্বজাতি ইত্যাদি যদিও কোনো প্রকার নজরে ছিল; কিন্তু তাও ছিল আল্লাহ ও যিকরুল্লাহ্ তথা দীন ও ইলায়ে দীনের জন্যে। সত্তাগত ও মূল উদ্দেশ্য ছিল না। সারকথা হল, জিহাদ ও হিজরত অনুভবযোগ্য হোক অথবা অর্থগত হোক এবং উভয়ের যে কোনো শাখার হোক না কেন তা বাস্তবায়ন হয়েছে বেদীন জাতির মধ্যে একত্রিত হওয়া, জামাতবদ্ধ তাবলীগ ও ওয়াজ নসীহত, হদ ও দণ্ড কায়েম এবং হক কথার বাধা প্রদান ইত্যাদি কর্মে প্রতিবন্ধক হওয়ায় এবং দীনকে সমুন্নত করার কাজে বাধা আসর কারণে। এমন নয় যে তাদের জীবনোপরণের সংকীর্ণতা, হালুয়া-রুটি এবং খাদ্যে ঘাটতি, আরাম ও স্বাদ, সাজ-সজ্জার কমতি এবং সেগুলো অর্জন ও পূর্ণ করার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল ইত্যাদি হতে বাঁচার

উদ্দেশ্য ছিল। যদি এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইসলামের মধ্যে দরিদ্রতা ক্ষুধার্ততা, রিক্ততা ও আরামশূন্যতার ফযিলত কেন বর্ণনা করা হয়েছে?

এজন্যেই আজ যারা জিহাদে আকবার তথা ইলায়ে কালিমায়ে হক এবং জালিম শাহীর সামনে হক কথা বলার মাকসাদ নিয়ে দাঁড়াবে এবং দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অন্তরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও জীবনোপকরণের অভিযোগ বা আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যের অভিযোগ উদয় হবে না। স্রেফ দীনের হেফাজত এবং ইলায়ে কালিমায়ে হকই লক্ষ্য থাকতে হবে এবং এগুলোই সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ হবে, যাকে সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করবে। তারপর এমনিভাবে কাজের ধারাবহিকতায় সংখ্যালঘু ও গরিষ্ঠতা বা অসম্মান ও সম্মান ইত্যাদির প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিৎ নয়। অর্থাৎ বাহ্য আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতা প্রথার নিকট পরাজিত না হওয়া চাই। বরং যে কোনো উপায়ে বিজয়ী হওয়া চাই। যেমনটি উপরের আয়াতগুলোতে ইশারা রয়েছে এবং হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে।

তারপর হযরত মুসা আ. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ফেরাউনের দরবারে যা কিছু পেশ করেছেন, তা হুজ্জত ও প্রমাণাদির মাধ্যমে পেশ করেছেন। তিনি তাঁর রিসালাত প্রমাণে আল্লাহর নিদর্শন তথা মুজেযা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর লাঠি দেখিয়েছেন, যা লাঠি থেকে সাপ এবং সাপ থেকে লাঠিতে রুপান্তরিত হতো। আলোকোজ্জ্বল হাত প্রদর্শন করেছেন, যা বোগলে প্রবেশ করালে সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং পুনরায় প্রবেশ করানোর দ্বারা আসল হালতে ফিরে আসত, যেগুলোর উত্তর পেশ করতে ফেরাউন অক্ষম হয়ে পড়ে। এ কথা বলা ব্যতীত সে আর কিছুই বলতে পারে না যে, মুসা একজন বড় জাদুকর। সুতরাং সে দেশের সকল জাদুকরদের একত্র করে তাঁর সাথে মোকাবেলা করিয়েছে। তারাও জাদুর মাধ্যমে লাঠিকে সাপের আকৃতি প্রদান করেছে। কিন্তু যেহেতু তাদের জাদুর মধ্যে কোনো বাস্তবতা ছিল না, সেজন্যই সকল জাদুকর অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মুসা আ.কে স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

স্বাধীনতার দাবির পক্ষে দলিল আবশ্যক

(১৮) এ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, আজও যখন জাতির স্বাধীনতার জন্য ইসলামিক নেতৃবৃন্দ দখলদার জাতিসমূহের নিকট যাবে, তখন প্রতিটি

দাবির সাথে হুজ্জত ও দলিল পেশ করবে। আর দলিল পেশ করবে একন ব্যক্তি যাকে অপর পক্ষ যুক্তি দিয়ে হারিয়ে দিতে না পারে। তারা যেনো যুক্তিসংগতভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং উত্তর পেশ করতে না পারে। পার্থক্য এতটুকু যে, ফেরাউনের সামনে মুসুবী মুজেযা পেশ করা হবে, যা হলো কুরআনুল কারীম। যে কিতাব সমস্ত দলিল ও হুজ্জতের সমষ্টি, যাতে আছে বস্তুর বিশদ বর্ণনা এবং হিদায়েত ও রহমত।

কারণ, ফেরাউনের রং ছিল হাকিমসুলভ। সেজন্যে সে লাঠির দ্বারা লা জওয়াব ও পরাজয় স্বীকারকারী হতে পারে। আর যুগের ফেরাউন এর রং-ধরন যেহেতু হেকমতসুলভ, দার্শনিকসুলভ, তাই সে ইলম ও হেকমতের মাধ্যমে পরাজিত হতে পারে, লাজওয়াব হতে পারে।

ফেরাউন আপন দেশের জাদুকরদের নিজ দরবারের নৈকট্য, চেয়ার, পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার অঙ্গীকার দিয়ে মুসা আ.-এর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে মুসা আ. এর লাঠির অবয়বে লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করিয়েছে। কিন্তু সেগুলো কাল্পনিক ছিল।

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ○

অতএব হঠাৎ জাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলো যেগুলো সাপের আকৃতি ধারণ করেছে। তাদের নজরবন্দির ফলে মুসার নিকট এমন মনে হচ্ছিল যে, সেগুলো দৌড়াচ্ছে ও নড়াচড়া করছে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৬৬]*

এজন্য সে সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নিঃশেষ হয়ে যায়, সকল সাপকে হযরত মুসা আ.-এর অজগর গিলে ফেলে। মুজেযার সামনে আত্মসমর্পণ করে।

হুবহু আজও এমন প্রক্রিয়া হবে যে, যখন যুগের নব্য ফেরাউনদের সামনে মুহাম্মাদী মুজেযা (কুরআন)-এর দলিল ও প্রমাণসমূহ পেশ করা হবে অথবা পেশ করা হয়েছে, তখন তারা দেশের জাহেল মৌলভী কিন্তু বয়ানের জাদুকর এমন লেকচারবাজদের দাঁড় করিয়েছে যে, তারা কুরআনের বিষয়বস্তুকেই একই সাদৃশ্য বিষয় এবং এরই উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের সাদৃশ্য আবিষ্কার করে অস্পষ্টতা ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। এহেন ঘৃণ্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে পুরষ্কার ও সম্মান দেওয়া এবং সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। আর গোপন ড্রেনের মাধ্যমে সেই অর্থের পঁচা-গান্ধা পানি তাদের প্রত্যেকের প্রতারণা গৃহে পৌঁছে যেত। এহেন পথভ্রষ্ট ইমামদের দ্বারা বিভিন্ন ফিরকা সৃষ্টি হতো। তারা কিতাব ও সুন্নাহর নামে আহলে

হকদের মোকাবেলা করত। কুরআনি লাঠির আদলে হাজারো কাল্পনিক লাঠি বানিয়ে বানিয়ে ময়দানে জনসম্মুখে ছেড়ে দিত।

হাজারো প্রতারণামূলক পাণ্ডুলিপি, কুরআনী তাফসীর এবং ফিকাহের সদৃশ্য প্রকাশ করা হতো। এমনকি নবীয়ে কুরআনের মত নবী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো, যারা আহলে হককে মিথ্যাবাদী ও বাতিল আখ্যা দিয়ে নিজেদের সরকার সম্পর্কে দাবি করত যে, আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এই হুকুমতের সাহায্য করার জন্যে। আমরা যদি এই হুকুমতের ফাযায়েল বর্ণনা করি, তাহলে পঞ্চাশ আলমিরা সম্পদে ভরে যাবে।

কেউ কেউ বলত, কুরআনের মধ্যে মুমিন কানিত (তুষ্ট) ও মুত্তাকী ইত্যাদি শব্দের মিসদাক সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন বর্তমান গভর্নমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। ওই সমস্ত জাদুকর ও তাদের ময়দানে ছেড়ে দেওয়া লাঠি ও সাপগুলো যা আহলে হকদের ধারণায় কখনও চলে ও দৌড়-ঝাপ করে মনে হতো, এতে সরলমনা মুসলিম জনতার চিন্তাধারায় বিক্ষিপ্ততা এবং মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো। তাদের ঐক্য মাটির সঙ্গে মিশে শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। আর শাসকদের মনে বিশ্বাস জমে যেত যে, হুকুমতের পা আরো কিছুটা শক্ত হয়েছে।

কিন্তু যখন এই কুরআনি অজগর নিজের পূর্ণ শানের সাথে মুসাগুণের অধিকারী কোনো আলেমের হাতে আত্মপ্রকাশ হয়, তখন পরিশেষে সকল সাপকে গলাধকরণ করে এবং فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ এর প্রকাশ ঘটে। আর কখনও কখনও উক্ত জাদুতুল্য বক্তারা সরকার থেকে সরে তাওবা করে হকের সামনে মাথা নত করেন আর ঘোষণা দেন, এতদিন আমনা ভ্রান্তি এবং সন্দেহের ভিতর নিমজ্জিত ছিলাম। এখন হারুন ও মুসা আ.-এর রবের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম। ফলে এহেন ভ্রান্তি ও সন্দেহের পর্দা দূর হতে থাকে।

যাহোক, উদ্দেশ্য হল এই যে, স্বাধীনতাকামীগণ যে সমস্ত দাবি বা নসীহত ফেরাউনি দরবারে পেশ করবে, সেগুলো হুজ্জত তথা কুরআন ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে পেশ করবে, দীনি রং ও নমুনায় পেশ করবে, সালফে সালেহীনদের চিন্তা ধারায় পেশ করবে। এই হ্যান্ডনোট ও আবেদনপত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া উচিৎ যে, এর প্রতিটি বাক্যের দলিল কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা হবে, যাতে সেটি মহান সরকার (আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে হওয়া প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট হয় এবং ধর্মীয় দাবি মনে হয়, যা কোনো

ব্যক্তি সহস্তে রচনা করেনি। আর কেউ যদি বিপরীত জওয়াব দিতে চায়, তাহলে জওয়াবদাতা জাদুকরদের ভ্রান্ত পর্দা সেই আয়াত ও হাদীস দ্বারা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং এ কাজে আমাদের কোনো প্রকার অহংকার প্রকাশ না হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের তাকরীর ও রচনাকে হুবহু এমন রাজনৈতিক এবং জাগতিক পদ্ধতিতে পেশ করেছি, যে পদ্ধতিতে বর্তমান রাষ্ট্রের উকিলরা নিজেদের রচনা ও যুক্তি প্রমাণ পেশ করে, যার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হয় এমন যে, তাতে কুরআন ও হাদীসের কোনো আলোচনা থাকে না। না প্রকাশ্য নস্ হিসেবে, না উদ্ভাবন ও কিয়াস হিসেবে।এবং বোঝার মতো উপায় নেই যে, এই রচনাটি কোনো ছাত্রের বা কিতাব ও সুন্নাহ নিমগ্ন ব্যক্তির। কারণ, তার সূচনা ও পরিণাম শুধুই জাতীয়তা, জীবনোপকরণ, নিরেট দেশীয় ফায়দা এবং স্রেফ প্রচলিত ও প্রথাগত সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে হয়ে থাকে। বরং প্রয়োজন হলে আমাদের সূচনা ও শেষ এবং জাহের ও বাতেন এর প্রতিটি আন্দোলন ও চেষ্টা স্রেফ কিতাব ও সুন্নাত এবং উভয়ের উদ্ভাবিত সঠিক বস্তু দ্বারা হবে এবং একই রং আমাদের খাস ও আম সকলের প্রতি সম্পৃক্ত হবে। কারণ, তাদের প্রত্যেক বয়ান ও তাবলীগ, প্রত্যেক পয়গাম, ইসলাহ ও তাহজিব এবং প্রত্যেক দাবি ও আবেদন এবং প্রতিবাদের সঙ্গে ইহাও হয় যে–

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ۭ وَالسَّلٰمُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○

আমরা তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ এসেছি। আর শান্তি সেই ব্যক্তির জন্য, যে হিদায়েতের ইত্তেবা করে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৭]*

অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্যে আসিনি এবং নিজহাতে তৈয়ার করা দলিল প্রমাণ নিয়ে আসিনি। বরং উভয়টি আল্লাহর পক্ষ হতে। সেজন্য সহীহ ও সুস্থ সে থাকবে, যে আল্লাহর রিসালাতের আনুগত্য করবে। অন্যথায় আমদের হাতেই, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের ধ্বংস প্রকাশ পাবে। কেননা–

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰي مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

আমাদের নিকট খোদার পক্ষ হতে এ আদেশ এসেছে যে, (আল্লাহর ক্রোধের) শাস্তি এ ব্যক্তির উপর পড়বে, যে মিথ্যাবাদী সাবস্ত করে এবং বিমুখ ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। *[সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৮]*

যাহোক হযরত মুসা আ. সকল পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, যা আল্লাহপ্রদত্ত ও তাঁর নির্দেশে ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে ফেরাউনের নিকট প্রকাশ করলেন যে, বনি ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠাও এবং তোমার জুলুমের কবল থেকে তাদের মুক্ত করে তাদের স্বাধীনতা দাও।

প্রকাশ থাকে যে, বনি ইসরাইলকে পাঠানো এবং তাদেরকে মুসা আ.-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ার দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, তাদেরকে মিসর থেকে শামে পাঠিয়ে দাও অথবা আমি মিসর ত্যাগ করার জন্যে বনি ইসরাইলদের তোমার নিকট থেকে নিতে এসেছি। বরং উদ্দেশ্য ছিল যে, বনি ইসরাইলকে নিজের অনুসারী এবং গোলাম বানিয়ে রাখা ব্যতীত, আমার সাথী হিসেবে ছেড়ে দাও যাতে তারা আমার সাথে থেকে নিজেদের মনমতো স্বাধীন জীবন-যাপন করতে পারে।

আমীর নির্বাচন ও কেন্দ্রিকতা গঠন

(১৯) উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলের উপর হতে ফেরাউনের নেতৃত্ব সরিয়ে রাসূলে খোদার নেতৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন। কারণ, ফেরাউনি নেতৃত্বে তাদের মধ্যে গাইরুল্লাহ পুঁজা ধ্বংসাত্মক জীবাণু ছড়িয়ে পড়ত আর মুসা আ.-এর নেতৃত্ব দ্বারা তাদের মধ্যে শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের পবিত্র জযবা গড়ে উঠত। তাহলে কি এখান থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় না যে, স্বাধীনতা অর্জনের কর্মধারায় মুসলিম জাতি নিজেদের একজন নেতা এবং আমীর নির্বাচন করে নিবে, যিনি একদিকে যোগ্যতানুসারে শরীয়তের অনুসরণের পাশাপাশি তাদের দীনি তরবিয়ত করবেন, তাদের ইসলামি নমুনায় সংগঠিত করবেন, তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও বিচারকার্যকে শরয়ী গণ্ডির ভিতর রাখবেন, অপরদিকে দীনের দুশমনদের নিকট বৈধ দাবিসমূহ পেশ করবেন। আর শুধু আপন কর্মীদের নয় বরং ওই অবৈধ আমীরদেরও সত্য পথ দেখাবেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, পালনকর্তা এবং তাঁর সত্য রাসূল সম্পর্কে তাদেরকে পরিচিত করাবেন। মুসলমান জাতি যদি নৈরাজ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকে, তাহলে না তাদের দীনি মতানৈক্য দূর হবে, না দুনিয়াবী বিভাজন দূর হবে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, মুসলিম জাতি এই পরাজিত বিশ্বে খলিফাতুল মুসলিমীন এবং আমীরুল মুমিনীন বানাবেন যে, তার জন্য শক্তি ও প্রভাব-

প্রতিপত্তির শর্ত। বরং শুধু এই উদ্দেশ্য যে, তারা একজন হুকুম প্রত্যাবর্তনকারী ঠিক করে নেবে, যিনি তাদের মাঝে দীনি মতপার্থক্য এবং বিভাজন হতে দিবেন না এবং যথাসম্ভব তাদেরকে চারিত্রিক শক্তির দ্বারা শরয়ী কর্মে জমিয়ে রাখবেন, মগ্ন রাখবেন, যাতে তারা যখনই বিজয়ী হবে, তখন তাদের ইনকিলাবে বিপ্লবের হতাশাপূর্ণ ও হতবুদ্ধিতাপূর্ণ সময়ে নতুন করে কোনো নিযাম ও কেন্দ্রিকতা গঠন না করতে হয়। বরং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত থাকবে। আর তারা প্রাধান্য লাভকারী ও শক্তিশালী হিসেবে তাতেই আত্মা ফুঁকে দিবে। সুতরাং আল্লহ্‌র আদেশে বনি ইসরাইল যখন মিশন ত্যাগ করেন, তখন হযরত মুসা আ.-এর নেতৃত্বে তাদের এমন মজবুত শৃঙ্খলা ছিল যে, মুসুবীর একটিমাত্র ইশারায় ছয়/সাত লক্ষ বনি ইসরাইল রাতারাতি মিশন ত্যাগ করে এবং ভোর হওয়ার সাথে-সাথে নীল নদের পাড়ে পৌঁছে।

তারপর ফেরাউন তার জাতিসহ নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার পর যখন বনি ইসরাইলদের শক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হয়, তখন তাদের নতুন কোনো নিযাম বানাতে হয়নি। ইমাম ও নেতা ছিলেন হযরত মুসা আ., যার মাধ্যমে জাতির মাঝে কেন্দ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর অনুসারী ও কর্মী ছিল বনি ইসরাইল, তাদের মাঝে শোনা ও মানার নিযাম কায়েম ছিল। ডাইশ বিদ্যমান ছিল, তাই আত্মা ও রূহ আসার সাথে-সাথেই তা জীবিত হয়ে যায়। তারপর পরবর্তী সময়ে যা কিছু হয়েছে, তা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। তেমনিভাবে বর্তমান যুগের গোলামির মধ্যে অতীব প্রয়োজন যে, মুসলমানরা তাদের সামর্থ্য নিজেদের জন্য এর সাথে যথেষ্ট মিল আছে।

ইলমে ওহীর সাথে-সাথে তারা ইলকায়ে রব্বানী এবং ইলহামে বাতেনীরও মুরুব্বী এবং পাশাপাশি মানুষের রগ ও শিরাবিশেষজ্ঞ উম্মতও। মসিবত ও ঘটনা এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা ও তবিয়ত মেজাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে।

অর্থাৎ সাধারণ ইলম থাকা এবং কিতাবী ইলম পঠন-পাঠনের সক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং তার মাঝে নবুওয়তের উত্তরাধিকারী হওয়ার শান থাকা চাই যে, তার ইলম, অহমিকা ও দ্বিধা থেকে ঊর্ধ্বে।

অপরদিকে তাদের মধ্যে ইসমাত (পাপমুক্ততা)-এর শান, সংরক্ষিত ও বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে। তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং সতর্কতা এবং সাবধানতার কারণে তাদের চালচলনে না জাতিগত গোমরাহী আছে, না অন্যদের গোমরাহ করে। তারা পথভ্রষ্ট হওয়া এবং গোমরাহ করা উভয়

নাপাকি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

তারপর যখন এই বাতেন উন্মোচন করা এবং মাহফুজ থাকা, উভয় গুণের অধিকারী আলেমগণ কোন দলীয় শান সৃষ্টি হয়, তাহলেও মোটামুটিভাবে তাদের মধ্যে ইসমাতের শান পয়দা হয়। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

لا تجتمع امتی علی الضلالة

আমার উম্মত গোমরাহী কর্মে একত্রিত হবে না।

(অর্থাৎ সকল উম্মত মিলে কোনো গোমরাহ কাজে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় বরং একটি জামাত সর্বদা হকের উপর কায়েম থাকবে আর তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে)।

এতে পরিষ্কার হয় যে, হকপন্থীরা তাদের মধ্যে উলামায়ে হক যাদের বদৌলতে মানুষ আহলে হক হয়, তাদের মধ্যে যদি একটি জামাতের শান সৃষ্টি হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেদের নিজস্ব জামাত গঠন করে নেয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই মিলে উম্মতকে গোমরাহীর পথে চালাতে পারবে না।

সুতরাং এতে পরিষ্কার হয় যে, মৌলিক ও বাস্তব অর্থে সমগ্র উম্মাতে ইজাবার অনুসারী উম্মত। আর উম্মতের মধ্যে তাদের জীবিত রাখার আসল আত্মা হলেন উলামায়ে রব্বানীদের জামাত। তাদেরই উম্মতের ইমাম অথবা আমীর বলা উচিত। কিন্তু মার্কায প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি সেই জামাত নিজেদের মধ্য হতে কোনো মুমতাজ ব্যক্তিত্ব আমীর নির্বাচন করে নেয় এবং নিজেরা সেই মাহফুজ এমনকি এক ধরনের মাসুম ইজতিমাযী ইলম ও বুঝ থাকার কারণে তার পরামর্শদাতা ও সহযোগী হয়ে যান, তাহলে সঠিক অর্থে এই আমীরকে জামাতের মাধ্যমে নায়েব এবং রাসূলের উত্তরাধিকারী বলা যাবে, যিনি জামাতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ সাহায্য ও দীন বোঝার কারণে জামাতের পরিপূর্ণতার সমষ্টি হতে পারেন এবং কামালাতের পূর্ণতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উভয় গুণ কামেলে বাতেন এবং ইসমাতের সঠিক উত্তরাধিকারী হবেন। তারই অধিকার রয়েছে। উম্মতকে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং শরয়ী তরবিয়াত করার এবং উম্মতের আমীর বলার। অতএব, উম্মতের জন্য সহজ চিকিৎসা এই যে, দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষক এবং চিন্তাশীল এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর চেহারাধারী উলামায়ে রব্বানীদের নেতৃত্বে থাকবে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের শরয়ী জীবন যাপন করবে।

নেককারদের নেতৃত্ব হতে বিদ্রোহ করার পরিণাম

এই জামাত যদিও নবুওয়তের ন্যায় মাসুম নয়, হতে পারে তাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিত্ব। অবশ্য তাদের মাহফুজ শানের ফলাফল কুদরতিভাবে এমন হবে যে, তারা যে কোনো কাজ ও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাদের আত্মার স্বাদ উপভোগ এবং ব্যক্তিগত উপকারের জন্য করবেন না। বরং খালিস আল্লাহর জন্য এবং সমগ্র মুসলিমদের উপকারের জন্য করবেন। তারপরও যদি তাদের ফয়সালাসমূহের কোনো কোণে চিন্তাগত ভুল ধরা পড়ে, তাহলে মুসলমানদের জন্য কোনো অবস্থাতেই এমনটি সুন্দর ও উচিত হবে না যে, তার এহেন ভুলের কারণে তার সমস্ত সঠিক ফয়সালা থেকে বঞ্চিত হওয়া গ্রহণ করবে এবং মূল জামাতকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে সম্পূর্ণরূপে তার নেতৃত্বকে পরিহার করবে। এমনকি প্লান-প্রোগ্রাম করতে থাকা আর যদিও কিছু অযোগ্যদের নিকট এহেন অসম্মান ও অশ্রদ্ধা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, তাহলে তার উপর গর্ব করতে থাকা। নাউযুবিল্লাহ!

যদি কেউ এমনভাবে আলেমদের জামাত অথবা তাদের নির্বাচিত প্রধান ও আমীরের নেতৃত্ব থেকে বের হয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্য তার পরিণাম হবে এমন যে, যে মূর্খদের জামাত বা ফাসেক ও ফুজ্জারদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং তার দীনি চালচলনকে নষ্ট করবে। অতএব তা কি কম হতবুদ্ধিতার কাজ যে, যে ব্যক্তি সামান্য একটি চিন্তাগত বা ধারণাকৃত ভুল ক্ষমা করতে পারেনি এখন সে স্বেচ্ছায় সব ধরনের ভুল এবং ব্যাপক অন্যায় কর্ম সাধনকারী হুকুমত ও নেতৃত্বকে প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহে কবুল হচ্ছে? এখন সে তাদের আশ্রয়ে সারাজীবন শরীয়তহীনভাবে যাপন করছে?

আমার ধারণামতে উলামায়ে সালেহীনদের প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করার একটি প্রকাশ্য শাস্তি এই যে, প্রত্যেক তাকওয়া, তাহারাত, পরহেজগারী অন্বেষণকারী প্রকাশ্যভাবে ফাসেক ও ফুজ্জারের নেতৃত্বে চলে যাবে। তারপর তাদের মধ্যে ভুল ও সঠিক বোঝার অনুভূতিও অবশিষ্ট থাকবে না। মূলনীতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে এমন আনুষঙ্গিক ভুল উত্তম, যাকে পরিত্যাগ করলে সর্বপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হতে হয়।

সুতরাং আবশ্যক হলো, উম্মাতে মুসলিমা সালেহীনদের নেতৃত্বের আশ্রয়ে এবং জামাতের অধীনে (যার প্রচলিত নাম জমিয়তে উলামা রাখা কোনো দুষণীয় কাজ হবে না)। থেকে শরয়ী জীবন যাপন করবে। শরীয়তের নিষিদ্ধ

বস্তু হতে হিজরত করে তার আদেশিত বস্তুর সীমানায় চলে আসবে। নিজেদের মূর্খতা দূর করবে, দীনি বুঝ সৃষ্টি করবে এবং নিজেদের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও সত্যিকারের নেতৃত্ব যে হাক্কানী আলেমদের জামাত হবে, যাদের মধ্যে দীনি রঙের প্রাধান্য শক্তিশালী ও সুপ্রশস্ত হবে। তাদের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক পরিহার করে বুনিয়াদী ও মৌলিক মাকসাদে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। নিজেদের কাজে উদারতা কায়েম করবে, তাহলে পুনরায় প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে বেশি দেরি হবে না।

মিশ্র সমাজে মুসলিম সংগঠনের দুটি মূলনীতি

এই ইলম ও তাকওয়া সমন্বয়কারী জামাতের মৌলিকভাবে দুটি কাজ সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। তন্মধ্যে প্রথম কাজ হলো কোনো জামাতের সঙ্গে জোট করা ব্যতীত যখন মুসলমানদের অধিকারের আওয়াজ উঠবে চাই যে কোনো প্লাটফর্ম হতে উঠুক তাদেরকে নিঃশর্তভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং সাহায্যের জন্য নিজেদের কর্মের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে হবে। আর দ্বিতীয় হলো, যখন দেশ স্বাধীনের আওয়াজ উঠবে, চাই তা কোনো অমুসলিমদের প্লাটফর্ম থেকে উঠুক, তার নিঃশর্তভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং নিজেদের আমল ও উপলব্ধির পূর্ণশক্তি ব্যয় করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আগে বাড়াতে হবে। কারণ, দেশের সকল প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রোগের আসল শিকড় হলো গোলামি আর তার বাস্তব উন্নতি ও সফলতা হলো স্বাধীনতা।

এই কর্মপন্থা অবলম্বনে স্বাধীনতা যুদ্ধের কর্মসূচির মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক ও একতাবদ্ধতা ঠিক তাকতে পারে, যা স্বাধীনতা লাভের প্রথম ভিত্তি ও স্তম্ভ। আর অমুসলিম দলগুলোর সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা ও সংঘাত-সংঘর্ষ হবে না, যা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত।

প্রকাশ থাকে যে, স্তম্ভের খাতিরে শর্ত হতে দৃষ্টি ফিরানো যাবে না এবং শুধু শর্তের মাঝে মগ্ন থেকে স্তম্ভ ও রোকনকে পরিত্যাগ করা যাবে না। প্রচলিত ভাষায় এই কথার বাস্তবতাকে এভাবে বোধগম্য করতে হবে যে, জমিয়তে উলামার সকল স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলিম দলগুলোকে নিজের সাথে জড়িয়ে রাখা আবশ্যক এবং স্বাধীনতার দাবি ও স্লোগানকে অমুসলিম আযাদীপ্রিয় চাই দলগত হোক বা ব্যক্তিগত হোকা তাদের স্লোগানের সাথে একতা আবশ্যক।

অমুসলিমদের সঙ্গে সম্মিলিত আন্দোলন

অমুসলিম দলের সঙ্গে সম্মিলিত কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও হারাম নয়। তবে শরীয়তের গণ্ডি ও সীমানার ভিতরে থাকতে হবে। আজ দেশী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এমন কোন শাখা নেই, যেখানে হিন্দু ও মুসলিমদের সম্মিলিত কাজ নেই। অতএব, দেশ স্বাধীন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদে হিন্দু-মুসলিমদের সম্মিলিত কাজ কেন নিষিদ্ধ ও হারাম হবে? যখন একদিকে সারা দেশের সকল শাখাগত ও আনুষঙ্গিক কাজে হিন্দু ও মুসলিমদের সম্মিলিত কর্মের প্রতি সকলের সমর্থন রয়েছে। আর অপরদিকে হুকুমতও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ দাবি ও আবেদন পেলে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

তাহলে কি এমতাবস্থায় শরয়ী অথবা রাজনৈতিকভাবেও এমন কাজকে নিষিদ্ধ বা হারাম স্বীকৃতি প্রদান করতে পারবে যে, ভারতবর্ষের সকল জাতি পরস্পর আস্থা-ভরসা ও উদারতার সাথে একই স্লোগানের মাধ্যমে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি প্রকাশ্যরূপে নারাজী ও ঘৃণার ঘোষণা করে দেশ স্বাধীনের আবেদন ও দাবি করব এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ আইনে সম্মিলিত কাজ করব। যদি অমুসলিমদের সাথে সম্মিলিত কাজ নিষেধ হয়, তাহলে গভর্নমেন্টের অধীনে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিষেধ হওয়া উচিত। কারণ, উসূল (মূলনীতি) সর্বস্থানেই উসূল। তবে হ্যাঁ, বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতা সর্বস্থানে আবশ্যক যে, সীমালঙ্ঘনকারী কর্ম সর্বদা ক্ষতিকর বস্তুর সূচনাকারী।

সুতরাং এ-সম্পর্কেও পরস্পর চুক্তির ভিত্তিতে আমলের সীমারেখার উসূলী দফাগুলো অবশ্যই অনুমোদন করে নিতে হবে, যাতে উভয় জাতির পরস্পর ঝগড়া ও অভিযোগের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়, যা ভবিষ্যতে পরস্পর হাঙ্গামার কারণ হবে এবং বিশেষ করে জমিয়তে উলামা সন্দেহ, আশংকা ও অভিযোগের লক্ষ্য হবে। তারপর উক্ত চুক্তিও প্রতিরক্ষা এবং সামরিক আইনে হওয়া উচিত। উন্নয়ন চুক্তির জন্য স্বাধীন যুগ সবচেয়ে উপযুক্ত, গোলামি যুগ নয়।

আন্তর্জাতিক মানের মাকসাদ পূরণে কর্মপন্থা

যাহোক, জমিয়তে উলামার বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্য এবং উন্নত অবস্থানের কারণে দেশের প্রতিটি জাতিগত দলের সঙ্গে উত্তরোত্তর ক্রমান্বয়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা

আবশ্যক। মুসলিম দলগুলোর সঙ্গে একতা ও জোটবদ্ধভাবে আর আযাদীপ্রিয় অমুসলিম দলগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত কাজ ও আন্দোলন করার মাধ্যমে। কিন্তু সাথে-সাথে নিজস্ব প্রোগ্রাম ও প্লাটফর্মের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করা জমিয়তের যুক্তিসঙ্গত ও শরয়ী দায়িত্ব। এক মিনিটের জন্য এ-কাজের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যে, জমিয়তে উলামা আপন বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করেছে। আর না এ-কাজের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোনো মুসলিম বা অমুসলিম অথবা অর্ধমুসলিম জামাতে মিশে অথবা তাদের অনুসারী হওয়ার দাগ নিজের পবিত্র আঁচলে লাগাবে। তেমনিভাবে কোনো অবস্থায়ই মেনে নেওয়া যাবে না ও প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যে, তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ দলীয় স্বাতন্ত্র্যে নিমজ্জিত হয়ে অন্যান্য সকল জামাতবিমুখ ও আত্মনির্ভর হয়ে যাবে এবং আপন জাতি অথবা অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক কেটাব করে সহজে সবর করে বসে থাকবে। কারণ, প্রথম সুরতে দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় আর দ্বিতীয় সুরতে মর্যাদাগত অবস্থান নিঃশেষ হয়ে যায় যে, দল বিশ্বব্যাপী রাহমুনা ও লিডার হওয়ার স্থলে স্রেফ ছোট্ট একটি অভ্যন্তরীণ দলে পরিণত হবে। অতএব, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বনির্ভতার অস্তিত্ব ঠিক রেখে অন্যদের দিকে ঐক্যের এবং সম্মিলিত কর্মের হাত প্রসারিত করতে থাকা সর্বাবস্থায় জরুরি। তারপর বিশেষ করে মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বন্ধুত্ব ও তায়াল্লুকের খাতিরে দৌড়ঝাপ করার পাশাপাশি চারিত্রিক খোশামোদি-তোষামোদিও করবে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর সীমালঙ্ঘন দল বা ব্যক্তির উপর করার পরও স্নেহ ও ক্ষমাশীলতার ব্যবহার করতে হবে। তবুও সেগুলো থেকে কখনও পিছপা হওয়া যাবে না। কারণ, এ-কাজ তার চারিত্রিক আযমত এবং সর্বব্যাপী রাহনুমার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যে, তারা পরস্পর একে অপরকে মহব্বত করার সঠিক নকশা আলেমদের মাঝে না পেলে এ-যোগ্যতা আর কোথায় অন্বেষণ করবে? নবীগণ যদি নিজেদের বিশ্বব্যাপী চারিত্রিক স্নেহশীলতা ও সদয় গুণের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী ও অল্পে তুষ্ট বানাতে পারেন, তাহলে নবীদের উত্তরাধিকারীগণ কি সেই স্নেহশীলতা ও দয়ার ছায়ার মাধ্যমে স্বজাতি মুসলমানদের আপন বানাতে পারবে না?

পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি একই উদ্দেশ্যে এবং কর্মবণ্টনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত

আমি একথা অস্বীকার করি না যে, এ-ক্ষেত্রে কখনও কখনও যখন মানুষের মনে স্বার্থপরতা বা ভ্রান্ত চিন্তার কালো মেঘ পুঞ্জিভূত হয় এবং তারা নিজেদের মুরুব্বী ও সংশোধনকারী মুসলিমদের সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করে না, তখন আলেমদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং সুসম্পর্ক রাখা থেকে নিরাশ হওয়ার সুযোগ চলে আসে। কিন্তু তারপরও নসীহত ও উপদেশের দায়িত্ব এবং দয়াপূর্ণ সম্পর্ক ও অনুগ্রহ স্নেহ প্রদর্শন বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু যদি সহানুভূতি ও নসিহতের সকল স্তর অতিক্রম করে দীনদারীসুলভ অন্তর একথার সায় দেয় যে, এদিক-সেদিক করা প্রয়োজন এবং এককভাবে থাকা ও চলা ছাড়া উপায় নেই, তাহলে নীরবতা পালনে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তারপরও সম্পর্কচ্ছেদ বা বিদ্রূপমিশ্রিত দোষ তালাশ, ইলম ও নায়েবে নবীর শানের খিলাফ হিসেবে গণ্য থাকবে।

সত্যের পতাকাবাহীও, আবার দোষারোপ-অপবাদও এমন পরস্পর বিরুদ্ধপূর্ণ দুটি বস্তু কিভাবে একত্র হতে পারে? যাহোক, যেমনিভাবে জমিয়তে উলামার অবস্থান ও তার পদমর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান উম্মতের জন্য জরুরি, তেমনিভাবে অন্যান্য দলের সঙ্গে পদমর্যাদা ও সম্মান অনুপাতে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সম্মিলিত কর্ম জরুরি। অপরদিকে নিজেদের শরয়ী চিন্তাধারার তাবলীগ এবং উম্মতকে দয়া ও সহজতার সাথে সেই চিন্তার উপর নিয়ে আসাও জরুরি। একথা দ্বারা আমার কখনও এমন উদ্দেশ্য নয় যে, অন্যান্য মুসলিম দলগুলোকে ভেঙ্গে দিবে। আর তা তো সম্ভবও নয়। যখন স্বাধীনতার ন্যায় বুনিয়াদী মাকসাদ এবং আরো অনেক ভিত্তিমূলক এবং স্বভাবগত উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন, যেগুলোর এককভাবে জমিয়ত আঞ্জাম দিতে পারবে না, তেমনি আরো অনেক ওযীফার সমাধান দেওয়া জমিয়তের মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

সেজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্যের এবং কর্ম বণ্টনের মূলনীতির উপর অন্যান্য দলও উপস্থিত না হবে এবং তাদের ও জমিয়তের পরস্পর সাহায্য ও সম্পর্ক কায়েম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আসল মাকসাদ শুধু মুশকিলই নয়; বরং অসম্ভব।

জমিয়তে উলামার স্বতন্ত্র্য মর্যাদা

কিন্তু একথা অবশ্যই বলব এবং শরয়ী পথপ্রদর্শনের আলোকে বলব যে, অন্যান্য সকল মুসলিম দল জমিয়তের সামনে মুফতি হবে না বরং ফতোওয়া প্রত্যাশী ছাত্র হবে। আলেমদের ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয় বরং এ হিসেবে যে, উম্মতের প্রতিটি রোগের ঔষধ পরিশেষে কিতাব ও সুন্নাত এবং এগুলোর প্রকৃত বাহক এই আলেমদের জামাত। যখন তারা নিজেদের ইলমি মর্যাদা, সঠিক চিন্তা ও চারিত্রিক উন্নত গুণাবলিকে হেফাজত রেখে নিরেট কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে উম্মতের সামনে পেশ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় উম্মতের ব্যক্তি হোক বা দল হোক সকলের শ্রবণ করা এবং আনুগত্য ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٦

কোন মুমিন নারী ও পুরুষের জন্য সুযোগ নেই যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ দিবেন, তখন তাতে তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মানবে না, তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত। *[সূরা আহযাব : আয়াত ৩৬]*

অতএব সকল মুসলিম দলের উপর আবশ্যক হবে যে, তারা প্রত্যেক এমন বিষয়ে জমিয়তের রাহনুমায়ী অবশ্যই গ্রহণ করবে, যাতে সামান্য পরিমাণও ইসলামি উসূল বা শাখাসমূহের সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি তাদের জন্য সর্বাবস্থায় এমনটি জরুরি এবং উপকারী যে, তারা শুধু জমিয়তের প্রতি মনোনিবেশ করবে, যাতে মুসলিম দলসমূহের সাথে সম্পর্ক হওয়ার পাশাপাশি তাদের সকল বিষয়েও জমিয়তের অবগতি লাভ হয় এবং স্বয়ং জমিয়তের কোনো ছোট ও বড় প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত, যাতে অন্যান্য দলের সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

তারপর যদিও জমিয়তে উলামার কোনো সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব কোন মুসলিম দেশের সাথে সামান্য মতপার্থক্য হয়, তাহলে তারা যতক্ষণ না জমিয়তের প্রতি মনোনিবেশ করে বিষয়টি পরিষ্কার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লেখালেখি ও সম্বোধন দ্বারা সামান্য পরিমাণ অন্যদিকে অর্থাৎ নিরাশাকে নিজেদের

উপর প্রাধান্য দিবে না এবং পরিশেষে কোনো প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ বা দূরত্ব অথবা মুরুব্বিহীনতার ব্যবহার করবে না। অপরদিকে জমিয়ত ও নিজেদের খোলা অন্তর এবং প্রশস্ত ললাট দ্বারা নিজেদের বিপরীত সমালোচনা শ্রবণ করা এবং যুক্তিসঙ্গত ও দলিলসম্মত সমালোচনাকে মেনে নিয়ে সেগুলো সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য তৈয়ার থাকবে–

كلمة الحكمة ضالة المؤمن من حيث وجدها فهو احق بها

হেকমতের কথা মুমিনের হারানো পুঁজি যেখানেই পাবে তা তাদেরই হক।

বোঝা ও বুঝিয়ে দেওয়ার পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

সারকথা এই যে, যেমনিভাবে মুসা ও হারুন আ. ইমাম ও নেতা হয়ে বনি ইসরাইলদের উন্নয়ন ও তরবিয়ত করেছেন এবং তাদের ধর্মীয় উকিল হয়ে ফেরাউনের সঙ্গে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা এবং দাবি আবেদন, প্রতিবাদ ও যুক্তি পেশ করেছেন আর সমস্ত বনি ইসরাইল যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল শ্রবণ ও আনুগত্য করে হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর সম্মিলিত ও ছোট্ট জমিয়তের উপর নির্ভর করেছে, যার বদৌলতে পরিশেষে স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনিভাবে বর্তমান গোলামির যুগেও মুসলিম জনতা এবং নায়েবে নবী জামাতের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে তারা যদি নিজেদের মধ্য হতে কাউকে আমীর নির্বাচন করে নেন এবং তারপর যদি তার নেতৃত্বে তাদের উন্নয়ন ও তরবিয়তের উপর নির্ভর করে এবং সন্দেহ বা স্বার্থপরতার অনৈক্যে দুঃসাহস দেখিয়ে আসল মাকসাদকে হাতছাড়া না করে, যাতে দল বা দলের আমীর তাদের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে পারেন এবং স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেন।

আমি মনে করি, জমিয়তে উলামা উক্ত দায়িত্ব আপন শক্তি অনুযায়ী পুরো করেছে এবং করতে থাকবে। কিন্তু এটি মানুষের কারখানা (দল)। এজন্য পরোক্ষ সম্মতিতে বা ইজতিহাদী ভুল হওয়া সম্ভব। অতএব যে ব্যক্তিত্বের উপর এমন ভুল সুস্পষ্ট হবে, সেই অভিযোগ ও দোষারোপ এবং পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমের প্রোপাগাণ্ডার পথ পরিহার করে অন্তর দিয়ে জমিয়তের প্রতি রুজু করবে এবং জযবার পরিবর্তে দলিল-প্রমাণ ও উসূলের মাধ্যমে বুঝবে ও বোঝাবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় দলের নিয়ত মুনাযারার স্থলে বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে তা আগে বাড়বে না।

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

উভয় দল সংশোধনপ্রার্থী হলে আল্লাহই উভয়কে তাওফীক দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও সব খবর রাখেন।
[সূরা নিসা : আয়াত ৩৫]

নির্যাস কথা হলো, আজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে গভীর ও বুনিয়াদি রোগ হলো গোলামি, যার শিকড়গুলোকে শক্ত ও মজবুতকরণে একটি পরদেশী হুকুমত রাত-দিন চেষ্টা ও ফিকির করে যাচ্ছে, যারা শুধু ইসলামি নিদর্শনাবলি নয়, এমনকি মানবতার নিদর্শনগুলোকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এহেন গোলামির কারণে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বর্ণনাগত ইলম, ধর্ম, অর্থনীতি, তাহজিব ও তামাদ্দুন, জাতিগত মর্যাদা, ইজ্জত সম্মান এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সম্পর্ক সব বরবাদ হচ্ছে। কুরআনুল কারীম উক্ত গোলামিকে নিম্ন স্তরের শাস্তি স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো, উক্ত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে নাজাত অর্জন করে আযাদীর পথকে সুগম করা। যেমনিভাবে আযাদীর দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক নম্বরসমূহে পেশ করেছি।

স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম

স্বাধীনতা লাভের প্রোগ্রামসমূহের সারকথাগুলো এই যে–

(১) প্রথমে গোলামির উৎসস্থল বুঝতে হবে যে, তা বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং তাদের স্বৈরাচারী পলিসি।

(২) স্বাধীনতা লাভে যুগের নবুওয়ত হতে সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া উচিত, যাতে প্রোগ্রাম আবিষ্কৃত না হয় বরং ইলহামী তথা আল্লাহপ্রদত্ত হয় এবং ওহীয়ে ইলাহীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।

(৩) প্রথমে নিজেদের ইত্তেহাদ এবং সম্মিলিত কর্ম জরুরি। তারপর প্রয়োজন মোতাবেক অন্যদের সাথে সম্মিলিত কাজ; কিন্তু শরীয়তের গণ্ডি ও শর্তের উপর বহাল থেকে এবং একে 'হিন্দু ও মুসলিম চুক্তিনামা' হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে।

(৪) বর্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে চালানো যেতে পারে, যার অস্ত্র হবে চারিত্রিক, যিকরুল্লাহ, দোয়া, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, পরস্পর সহযোগিতা ও একতা এবং প্রতিবাদ, দাবি ও আবেদনসুলভ চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

(৫) পরস্পর সম্মিলিত কর্মে শরীকগণ বুদ্ধিমান ও খোদাভীরু হওয়া আবশ্যক। আর গাফেল ও চতুর চালাক হওয়া ক্ষতিকর।

(৬) এই চারিত্রিক ও নৈতিক যুদ্ধে হিজবুল্লাহ এবং আল্লাহর দূত হিসেবে কাজ করা উচিত, আনন্দ উপভোগের জন্য নয়।

(৭) প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তারকারী জাতির সম্বোধনে নমনীয়তা প্রদর্শন করা উচিৎ, কঠোরতা ও ক্রোধ জাহির করা নয়।

(৮) সম্বোধনকারী লিডারদের বিনয়ী ও সংকোচহীন হওয়া জরুরী, যাদের দৃষ্টি নিজেদের দুর্বলতা ও দোষের প্রতি হবে আর অহংকার বা বাহ্যিক গাম্ভীর্য ক্ষতিকারক।

(৯) নেতৃবর্গের দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী জাতির দরবারে পৌঁছে নিজেদের ইসলামিক পজিশন ও নিজেদের আন্দোলনের দীনি পজিশন প্রকাশরূপে সুস্পষ্ট করবে।

(১০) স্বাধীনতার দাবি ধর্মের জন্যে করা উচিৎ, প্রাচুর্য ও জাগতিক নেয়ামতের জন্যে নয়।

(১১) স্বাধীনতাকামী দায়িত্বশীলগণ বুদ্ধিমান ও আকলওয়ালা হওয়া, দীনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং দীনদার হওয়া জরুরী। অন্যথায় ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন হবে না, যা আসল উদ্দেশ্য। বরং শুধু জাতিগত স্বাধীনতা লাভ হবে, যা আসল মাকসাদ নয়।

(১২) নিজেদের সংশোধন ও উন্নয়ন, তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক তরবিয়ত এবং আনুষঙ্গিক কর্মের তাহজিব ও মুসলিম দলগুলোর মজবুতকরণ অত্যন্ত জরুরী। কারণ, তরবিয়ত ও দীক্ষাহীন সৈন্যদল পরিশেষে ধ্বংস ও বরবাদীর কারণ্ হয়।

(১৩) প্রভাব বিস্তারকারী জাতির নিকট দীনি তাবলীগ এবং আযাদী অর্জনে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন জরুরী। এতে গায়েবী সাহায্য আসে এবং আল্লাহর যিম্মাদারী লাভ হয়। আর দাবি ও আবেদনের শিকড় মজবুত হয়।

(১৪) জাগতিক মসিবতের অভিযোগ ভাষায় প্রকাশ করা উচিৎ নয় এবং দাবি ও স্মারকলিপির শিরোনামে দীনি প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ হওয়া উচিৎ। কারণ, ইসলাম ধর্মে স্বাধীনতার প্রয়োজন শুধু দীনের জন্যে। দুনিয়া শুধুই ধ্বংসশীল।

(১৫) প্রতিটি দাবি এবং প্রতিবাদের দলিল কুরআনি মুজেযা অর্থাৎ কুরআন ও

সুন্নাতের দলিল-প্রমাণ দ্বারা পেশ করা চাই।

(১৬) শরয়ী এমারত এবং দীনি নেতৃত্ব আবশ্যক, যাতে জাতির মধ্যে কেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হয় এবং সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তনস্থল একজন ব্যক্তি নির্ধারণ হয়ে পুরো অনৈক্য ও মতপার্থক্যের স্থলে শরয়ী আমলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে এবং অন্তরের অশান্তির স্থলে শান্তি ও স্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

(১৭) যিনি নেতা হবেন, তিনি আলেম, চিন্তাশীল ও গবেষক হবেন। দলিল ও মাসয়ালাসমূহের জ্ঞানী হবেন, বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী সম্পর্কে সনদসহ ভালোরূপে অবগতি লাভকারী হবেন, সাথে-সাথে নেককার ও মুত্তাকী হওয়া উচিৎ। শুধু বক্তা ও ধারণপোষণকারী নয়।

(১৮) চিন্তাশীল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জরুরী, যার প্রচলিত নাম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। কিন্তু প্রয়োজন হলে এর উপদেষ্টা পরিষদ সনদপ্রাপ্ত আলেমগণ হবেন। প্রথাগত বা সংকোচওয়ালা আলেম হবেন না, যাদের সামনে শরীয়তহীন বস্তু বিশ্বস্ত হবে এবং বাতিলের সঙ্গে হকের মিশ্রণের বাজার সরগরম হবে।

(১৯) প্রত্যেক স্বাধীনতাকামীর সহযোগিতা ও সাথী হওয়া উচিৎ। কিন্তু নিজেদের প্রোগ্রামকে স্বতন্ত্র রেখে চুক্তির ভিত্তিতে অমুসলিম জাতির সাথে সম্মিলিত কর্ম ও আন্দোলন এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী। এই অংশিদারিত্ব দ্বারা একেও ইসলামের নিকটবর্তী করা যাবে। আমাদের স্বতন্ত্র নামের সুরতে সবাই আমাদের সাথী হবে। আমরা সবাই আল্লাহর সাথে আর আমাদের সাথে কেউ নেই।

(২১) স্বাধীনতা আন্দোলন ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি জামাতের সাথে নামায পড়া অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, আল্লাহতায়ালা হযরত মুসা ও হারুন আ.কে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে পাঠিয়ে বলেছিলেন–

ولا تنيا فى ذكرى

আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

আর যিকরুল্লাহর পরিপূর্ণ একক হলো নামায।

আল্লাহর ইরশাদ –

اقم الصلوة للذكرى

আমার যিকির এর জন্য নামায কায়েম কর।

আর ইকামাতে সালাতের প্রধান অংশ হল জামাত।

فان تسوية الصفوف من اقامة الصلوة

জামাতের কাতার সোজা রাখা ইকামাতে সালাতের অংশ।

আর একথা সুস্পষ্ট যে, কাতার সোজাকরণ জামাত ব্যতীত সম্ভব নয়। এজন্যে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা-প্রচেষ্টার সময় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং পরিপূর্ণ একক নামায জামাতের সাথে পড়া জরুরী, যাতে গায়েবী নুসরত সাহায্য শামিলে হাল হয়।

(২২) তাবলীগি চেষ্টা সুশৃঙ্খল পন্থায় হওয়া উচিৎ। তাবলীগে দীন রাজনৈতিক প্লাটফর্মে হওয়া দরকার এবং হুকুমত ও প্রজাদের কর্ণে সমানভাবে দীনের আওয়াজ পৌছা উচিৎ, যাতে দিয়ানতদারীর সাথে ইসলামি কানুন রাজনীতি ও মসনদধারীদের কর্ণে পৌছে যায়, যাতে তাদের মাকসাদের সাথে দুশমনদের মধ্যেও হামদর্দী সৃষ্টি হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ তরান্বিত হয়।

যাহোক, এই বাইশটি সূক্ষ্ম বিষয়, যেগুলো তিলওয়াতকৃত আয়াতসমূহ থেকে উদ্ভাবন হয়, যেগুলোর মধ্যে গোলামির দোষ, নিন্দা, অপবাদ ও গোলামী দূরীকরণের দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রতিবাদ ও আবেদন পদ্ধতি এবং সেগুলোর ধরন ও প্রকারভেদ, স্বাধীনতার বরকত, স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা, চেষ্টার মধ্যে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত, স্বাধীনতা অর্জনের প্রোগ্রাম, স্বাধীনতার শত্রুদের পরিণাম এবং গোলাম ও দুর্বল জাতির সফলতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি আমার দুর্বল পুঁজি মোতাবেক উক্ত বিষয়গুলো উপরের আয়াতসমূহ থেকে উদ্ভাবন করে পেশ করেছি, যেগুলোর মধ্যে মূলনীতিতগভাবে বর্তমান সমস্যার আলোচনা স্থানে-স্থানে চলে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক ভাষার স্থলে দীনি ও কুরআনী ভাষায়। আর এ ভাষা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয়। চিন্তাশীল ও মেধাবী উলামায়ে কেরাম এর চেয়ে অনেক বেশি হাকিকত উক্ত আয়াত থেকে বের করতে পারবেন যে, কালামে ইলাহীর গভীরতার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না।

শরয়ী রাজনীতির সম্মান

আমি চেষ্টা করেছি স্বাধীনতা প্রোগ্রামের অংশগুলোকে স্রেফ কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে পেশ করতে। আমার ধারণামতে যেগুলো শরয়ী রাহনুমায়ী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোই পেশ করছি। জরুরী হলো কোনো প্রোগ্রাম বর্তমান রাজনৈতিক কংকাল থেকে গ্রহণ না করা। এহেন প্রতারণামূলক রাজনীতি পরিহার করার উপযুক্ত, যা পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে ফেলেছে। এগুলো কার্যকর করার যোগ্য নয়, তবে বোঝার যোগ্য অবশ্যই। এগুলোকে আয়ত্ত করে আমাদের প্রোগ্রামের সম্পর্ক শুধু শরয়ী রাজনীতির সাথে হওয়া জরুরী, যার ফলে প্রতারণাপূর্ণ বর্তমান রাজনীতির অন্ধকার এবং অন্তর থেকে তার প্রভাব দূর হতে পারে। কারণ, আজ এহেন রাজনীতির বিরোধীরাও একে নিজেদের শওকতের কারণ মনে করে এবং এগুলোর মধ্যেও নিজেদের শান-শওকত অনুভব করে। সেজন্যে মজা ও আগ্রহের সঙ্গে তার আলোচনা এবং রং-ঢং গ্রহণ করে থাকে। তাই শুধু কিতাব ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিধানের প্রোগ্রাম দ্বারাই এহেন বাহ্যিক আযমত দূরীভূত হতে পারে এবং প্রকৃত আযমত খোদায়ী প্রোগ্রামসমূহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

উন্নয়ন কর্মের প্রোগ্রাম যথেষ্ট বিশদ বর্ণনার সাথে সিন্ধু প্রদেশের জমিয়তের সভাপতিত্বমূলক ভাষণে পেশ করেছি। যদি সেই বয়ানের সকল দফা এ বাইশ দফার সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে দাবিগত এবং উন্নয়নশীল প্রোগ্রামের সকল গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদি দফাগুলো প্রকাশ হবে, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ হতে চয়ন করা হয়েছে।

বুযুর্গানে মুহতারাম! আমি ক্ষমাপ্রার্থী আপনাদের মূল্যবান দীর্ঘ সময় নষ্ট করার জন্য এবং পুনরায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনাদের পক্ষ থেকে আমাকে সভাপতির মূলবান মসনদ প্রদান করার কারণে।

বয়ান : ৬

মানবতার পূর্ণতা

প্রবীণ-প্রবীণাদের প্রশংসা বেশি করা হয় আর কাজের দায়িত্ব ও বোঝা কমিয়ে দেয়া হয়। এই কারণে এ উম্মতের আমলের বোঝা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে শিকল ও হাতকড়া ছিল (অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে অনেক কঠোরতা ছিল)। তাদের জন্য কঠিন সাধনা এবং অত্যন্ত কষ্টকর পরিশ্রম ছিল। সেগুলো বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সাধ্য আমল দেওয়া হয়েছে এবং প্রশংসা বেশি করা হয়েছে। একটি আমল করলে দশটি নেকীর সাওয়াব মিলবে, তারপর সাতশত পর্যন্ত বৃদ্ধি হবে আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বাড়িয়ে দিবেন।

মোটকথা, প্রতিদান বাড়িয়ে দেওয়া হল, প্রশংসা বাড়িয়ে দেওয়া হলো; কিন্তু আমলের ভার কমিয়ে দেওয়া হলো। কারণ, এ উম্মত প্রবীণ ও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমলের ভার অনেক কমিয়ে প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا○

পূর্ণতার উৎসব

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এ-উৎসব আমাদের স্নেহের মুহাম্মদ আযহার সাহেবের কুরআনুল কারীম খতম করার জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মজলিসে তিনি কুরআনুল কারীম খতম করেছেন এবং তাতে দোয়া করেছেন। একটা সময় এমন ছিল যে, আমাদের স্নেহের আযহার কুরআন শরীফ শুরু করেছিল আর তার হিফজ করার ইচ্ছা ছিল। অবশ্যই ঐ দিনটি আনন্দের ছিল, যেদিন কুরআনুল কারীম হিফজ করার সূচনা করেছিল। আর আজকের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে হাফেয

বানিয়েছেন এবং ভালো হাফেয হয়েছে। তার কিরাত শ্রবণে অনুমান হয় যে, তাজবীদওয়ালা কারীও হয়েছে। অতএব, একটা হলো শুরু আর অপরটি হলো শেষ। উভয় বস্তুই খুশি ও আনন্দের বিষয়।

আরম্ভ ও সমাপ্তির আনন্দ

সূচনাতে আনন্দ ও খুশি হয় আশার ভিত্তিতে যে, মাতা-পিতা সন্তান মক্তবে পাঠিয়েছেন; এতে তারা খুশি হন। কিন্তু এই আনন্দ ভবিষ্যৎ আশার উপর ভিত্তি করে যে, আমাদের সন্তান পড়ালেখা করবে, কিছু দিন পর হাফেয হবে এবং তাতে পূর্ণতা লাভ করবে। মোটকথা, সূচনাতে আশার ভিত্তিতে খুশি হয় আর শেষে তাকমিল ও সমাপ্তির ভিত্তিতে খুশি হয়। যে আশা করেছিল, তা আল্লাহ তায়ালা পুরা করেছেন। সেজন্য সমাপ্তির দিন খুশি ও আনন্দের হয়ে থাকে। সুতরাং প্রত্যেক সূচনা খুশির বস্তু এবং সমাপ্তিও খুশি ও আনন্দের বস্ত । পার্থক্য এটুকু যে, সূচনাতে খুশি হয় ভবিষ্যৎ আশার ভিত্তিতে আর শেষে খুশি হয় সমাপ্তির কারণে।

একথা পরিষ্কার যে, তাকমিল আশা থেকে বেশি খুশির বস্তু। আশা তো হয় সন্দেহজনক বস্তুর; তা পুরা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তাকমীলের অর্থ হলো, তার সকল আশা পুরা হয়েছে। অতএব, সূচনা শুধুই আশা আর আশা আর সমাপ্তি বাস্তবতা আর বাস্তবতা। তাই বাস্তবতার উপর যে আনন্দ হবে, তা অবশ্যই তার চেয়ে বেশি হবে, যা শুধু আশার কারণে হতে থাকে।

তাকমিলপ্রিয় উম্মত

এমনিভাবে মুসলমানদের কিছু তাকমিলপ্রিয়তা বাস্তবে ঘটেছে। এজন্য তাদের দীন পূর্ণ দীন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

দীনের সূচনা হয়েছে হযরত আদম আ. থেকে আর তাকমিলও শেষ হয়েছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ জাতের উপর।

মানবতার শিশুকাল ও তাদের প্রাথমিক জ্ঞান

সূচনালগ্নে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের বস্তু ছিল, যা সাধারণ শিশুদের জন্য হয়ে থাকে। শিশুদেরদের সবচেয়ে বড় ইলম এমন হয় যে, তাদেরকে কিছু বস্তুর নাম শিখানো হয়। এটি রুটি, এটি বদনা, এটি ভূমি, ওটি আকাশ ইত্যাদি। অতএব তাদের নাম শিক্ষা হয়ে যাওয়া, তাদের সবচেয়ে বড় ইলম অর্জন হয়। আর ইলমের প্রাথমিক স্তরকে ইলমুল আসমা তথা বস্তুর নামের ইলম বলে। যদি কোন বস্তুর নাম অজানা থাকে, তাহলে তা অপরিচিত থেকে যায়। তাকে কেউ অন্বেষণ করে না।

মোটকথা, ইলমের প্রাথমিক স্তর হলো বস্তুর নাম জানা। তারপর স্বভাবগতভাবে মানুষের মন চায়, নামগুলোর অর্থ ও পদবী কী? বস্তুর আসল সুরত দেখতে চায়, জানতে চায়। যখন বস্তুর আকৃতি জেনে নেয়, তখন জানতে চায়, এ বস্তুগুলোর বৈশিষ্ট্য কী-কী? তখন মানুষ সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের ইলম অর্জন করে। আর যখন তাও অর্জন করে নেয়, তখন পরবর্তীতে জানতে চায়, এগুলোর হাকিকত কী? অতএব প্রথমে নাম, তারপর অর্থ তারপর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব, তারপর সেগুলোর হাকিকত। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ইলম উন্নতি লাভ করে। সুতরাং হযরত আদম আ.-এর যুগে মানুষের ইলমের শিশুকাল ছিল। মানবতার শিশুকালের যুগ ছিল। আর শিশুদের সবচেয়ে বড় ইলম বস্তুর নামসমূহ মুখস্থ করানো। সেজন্য হযরত আদম আ.-এর প্রতি যে সমস্ত ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল, তার কিয়দংশ ছিল বস্তুর নাম। আল্লাহ পাকের ইরশাদ–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদমকে আল্লাহ সকল বস্তুর নাম শেখালেন।

হযরত আদম আ.কে নাম মুখস্থ করানো হয়েছিল এবং নামের কিছু অর্থ বলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, ইলমের সূচনা হয়েছে নাম দ্বারা। হযরত আদম আ.-এর উপর আল্লাহ তায়ালার ত্রিশটি সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমনিভাবে একই উম্মতের উপর ত্রিশ পারা কুরআন নাযিল করা হয়েছে। হযরত আদম আ.-এর উপর ত্রিশটি সহীফা নাযিল হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশের মধ্যে আবাসন বিষয়ের শিক্ষা ছিল– ক্ষেত এভাবে চাষাবাদ করতে হবে, বাগান এভাবে রোপণ করতে হবে, কাপড় এভাবে বুনতে হবে, লাকড়ি ও কাঠের কাজ এমন হবে; যেমনটি হাদীস শরীফে ইশাদ হয়েছে– 'হযরত আদম আ.কে আল্লাহ পাক এক হাজার কারিগরি বিদ্যা শিখিয়েছেন। সেগুলো

তার সন্তানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক তবকার লোকেরা নিজেদের সুবিধামতো একেকটি পেশা ও কারিগরি বিদ্যা গ্রহণ করে।'

কেউ কাঠের পেশা, কেউ কর্মকারের পেশা, কেউ নির্মাণ কাজের পেশা, কেউ ক্ষেত-খামারের পেশা, এভাবে বনি আদমের মধ্যে বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সকল পেশা ও বিদ্যা ওহীর মাধ্যমে এসেছে।

প্রাথমিক ইবাদাত

যাহোক, হযরত আদম আ.-এর যে ত্রিশটি সহীফা অবতীর্ণ হয়, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বিষয় আবাসন সংক্রান্ত ছিল। হালাল ও হারামের ফিকহী বিধান অনেক কম ছিল। কারণ, শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান নাম শেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, হালাল ও হারাম বেশি বলা হওয়া না। তারা তো নিষ্পাপ এবং ফিতরাত তথা জন্মগত গুণের অধিকারী হয়। হযরত আদম আ.-এর সকল সন্তান ফিতরাতের উপর ছিল, সবাই সালেহ ও নেককার ছিল। যে নাম মুখস্থ করানো হতো, সেগুলোর পাঠ করাই তাদের জন্য বড় ইবাদত ছিল। যেহেতু হযরত আদম আ. আপন ছেলে হযরত শীশ আ.কে কিছু নামের জ্ঞান দান করলেন যে, এগুলো পড়। তাই সেযুগের সবচেয়ে বড় ইবাদত ছিল আল্লাহর নামসমূহ রটনা ও প্রচার করা এবং বারংবার পাঠ করা।

মোটকথা, প্রাথমিক ইলম ছিল নামের ইলম লাভ করা, নাম জেনে নেওয়া, যার উপর নিম্নের আয়াত সাক্ষী–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

বিশ্বমানবতার দ্বিতীয় যুগ ও তাদের জ্ঞান

তারপর হযরত নূহ আ.-এর যুগ এল। তখন তবিয়তগতভাবে এমন জযবা উদয় হলো যে, এ-নামগুলোর অর্থ কী? এগুলো কেমন বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়? অতএব, হযরত আদম আ. তো নামের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় করিয়েছেন। আর হযরত নূহ আ. নামীয় বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর মারেফত করিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○ وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○ وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ○ ثُمَّ

يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ○ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

তোমরা কি লক্ষ কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চাঁদকে রেখেছেন আলোকরূপে এবং সুরুজকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে দগত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং পুনরায় পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহপাক তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিছানা, যাতে তোমরা চলাচল কর প্রশস্ত পথে। *[সূরা নূহ : আয়াত ১৫-২০]*

জমিনকে আল্লাহ তায়ালা বিছিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেমনভাবে শস্য ও লতাপাতা সৃষ্টি হয়। জমিন ও আকাশ এবং এদের মধ্যস্থলের বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়েছে। অতএব, হযরত আদম আ.-এর যুগে নাম শেখানো হয়েছিল, নূহ আ.-এর যুগে নামীয় বস্তুকে প্রকাশ্যে রেখে বললেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ কর। শিল্পকর্ম দেখে শিল্প ও কারিগরকে কল্পনা কর। যদি তৈরিকৃত জিনিস সুন্দর হয়, তাহলে নির্মাতার প্রশংসা করা হয় যে, সে একজন দক্ষ ও পরিপূর্ণ কারিগর যে, এত বড় ও সুন্দর শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেছে। অতএব, আসমান ও জমিন এমন বস্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নির্মাণ করতে পারবে না। সেজন্য সেদিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে কারিগর ও শিল্পী চিনে নাও যে, তিনি কেমন হেকমতওয়ালা ও নিপুণ কারিগর। তিনি কেমন হাকীম ও খবরদাতা। তিনি কেমন শক্তিধর এবং একক ক্ষমতার অধিকারী, যিনি আসমান নামক তাঁবু টেনে দিয়েছেন এবং জমিন নামক বিছানা বিছিয়েছেন।

আপনি ছোট একটি শামিয়ানা দাঁড় করাতে চাইলে বাঁশের বিশ-ত্রিশটি খুঁটি লাগান, যাতে সেটি ঠিক থাকে। কিন্তু আসমানের এ-বিশাল তাঁবু যার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা, তার নিচে না আছে কোনো বাঁশ, না আছে কোনো টেকনা। শুধু হাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং তিনি কত বড় ও মহান শক্তিধর যিনি এ-বিশাল তাঁবু ও শামিয়ানা টানিয়েছেন।

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

তাতে না আছে কোন স্তম্ভ, না আছে কোন লাঠির টেকনা।
[রাদ ১৩:২]

যাহোক, হযরত নূহ আ. নামের পর নামের বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করিয়েছেন। তিনি বস্তু দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালাকে পরিচয় করিয়েছেন। আল্লাহর মারেফত লাভ করিয়েছেন। এখন মানব নামও জানে এবং নামের অর্থও জানে।

মানববিশ্বের তৃতীয় যুগ ও তাদের ইলম

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আ.-এর যামানা এল। তখন ইলমের সেই স্তরের পর এখন তবিয়তগতভাবে এমন খায়েশ হয় যে, সেই বস্তুগুলোর বৈশিষ্ট্য কী? সেগুলোর প্রভাব ও নিদর্শন কী? এগুলো কেন বানানো হয়েছে? এ-গুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

তখন হযরত ইবরাহীম আ. আত্মার দিকে মনোনিবেশ করালেন। আসমান ও জমিনের আত্মা ও মূল সম্পর্কে অবগত করালেন এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় করালেন। কারণ, নাম ও নামীয় বস্তু জানার পর সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া সামনে আসে। তাই বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের দিকে মনোনিবেশ করে মানুষদের আল্লাহর মারেফত করালেন।

মুসা আ.-এর যুগ ও তার ইলম

স্বভাবগতভাবে এমন জযবা হয় যে, নাম এই, বস্তু এই, বৈশিষ্ট্য এই, এগুলোর ব্যবহারের পদ্ধতি কী হবে? কিভাবে কোন পন্থায় ব্যবহার করবে? এগুলোর বিধানও কী? তখন হযরত মুসা আ.-এর যামানা এল এবং তাওরাত নাযির হলো। আর তাওরাতের শান ছিল– প্রত্যেক বস্তুর বিধান বর্ণনা করা হলো যে, একে এভাবে ব্যবহার কর। এটি জায়েয, এটি হারাম, এটি বৈধ, এটি অবৈধ। মোটকথা, বিস্তারিত বিধান এল।

আহকামের মূল তথ্যের যুগ

এখন নাম জানা হলো, নামীয় বস্তু জানা হলো, বৈশিষ্ট্য জানা হলো এবং আহকাম তথা ব্যবহারবিধিও জানা হলো। এখন স্বভাবগতভাবে মন এদিকে ধাবিত হয় যে, আহকামের ইল্লাত তথা কারণ কী, যার উপর আহকামের

ভিত্তি? কারণ, বিধানের সম্পর্ক সর্বাবস্থায় কোনো হাকিকত ও ইল্লাতের সাথে হয়। এজন্য যখন ইল্লাত সুস্পষ্ট হয়, তখন শুধু একটি বস্তুর হুকুম জানা হয় না বরং যেখানে-যেখানে উক্ত ইল্লাত পাওয়া যাবে, সেখানে আহকামও জানা যাবে। অতএব এক ইল্লাতের দ্বারা হাজারো অধ্যায়ের আহকাম জানা হয়ে যাবে।

নবী আ.-এর যুগ মানুষের ইজতিহাদের যুগ

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক যামানা এল। তিনি এই বিস্তারিত ইরশাদ করলেন যে, প্রত্যেক বিধানের পেছনে হেকমত রয়েছে, প্রত্যেক হেকমতের নিচে ইল্লাত আছে এবং প্রত্যেক ইল্লাতের একটি হাকিকত রয়েছে আর প্রতিটি হাকিকতের নিচে আল্লাহর একটি সিফাত তথা গুণ রয়েছে, যার সাথে ওই ইল্লাত ও হাকিকতের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব ইলম ও জ্ঞানগতভাবে বনী আদম এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সুরত ও আকৃতি দেখানোর প্রয়োজন হয় না, তারা তো পূর্ব হতেই চিনে। তেমনি নাম বলার প্রয়োজন হয় না, কারণ তা পূর্বেই জানা। আহকামও বেশি জানানোর প্রয়োজন হয় না। তাও কিছু কিছু জানা আছে। তবে আহকামের কারণ জানার প্রয়োজন ছিল, যাতে এই উম্মত মুজতাহিদ হতে পারে। এই উম্মতের মাঝে এমন শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যে, তারা একটি ইল্লতের মাধ্যমে হাজারো বস্তুর বিধান উদ্ভাবন করবে।

আর তা এজন্য যে, এটি খতমে নবুওয়তের যুগ। আর কোনো নবী আগমন করবেন না, নতুন কোন শরীয়ত আসবে না। অতএব, এই উম্মতের আলেমদের এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত নতুন-নতুন ঘটনা ও বিষয়ের সমাধান এই কুরআনুল কারীম থেকে দিবেন। কুরআনের মূলনীতি ও কুল্লিয়াত (সমষ্টিগত বিধান) এবং ইল্লাত ও হাকিকতের মাধ্যমে ফয়সালা করবেন। দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর উম্মত সকল বিষয়ের সমাধান দিয়ে আসছে। প্রত্যেক শতাব্দিতে নতুন চিন্তা ধারা সৃষ্টি হয়। নিত্যনতুন ঘটনা ও বিষয়াদি প্রকাশ পায়। কিন্তু সেগুলোর সমাধান পেশ করতে উম্মত কখনও অক্ষম ও অপারগ হয়নি। তারা এই কুরআন, এই হাদীস এবং ফিকাহ হতে আহকাম উদ্ভাবন করছেন। তারা ইল্লাত থেকে আহকাম বের করছেন। অতএব এই উম্মত মুজহাহিদ উম্মত।

উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে নবুওয়তের প্রভাব

যেমনটি কিছু বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে–

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل

আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাইলের নবীগণের মতো।

যদিও এ-রেওয়ায়েতের সনদ সম্পর্কে কিছু কথা রয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম এ-হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কারণ, সনদ দুর্বল হলেও এর বিষয়বস্তু অন্যান্য হাদীসে রয়েছে, যদিও শিরোনাম ভিন্ন-ভিন্ন। এজন্য বিষয়বস্তু হিসেবে মুতাওয়াতির সনদের পর্যায়ে। যদিও সনদ হিসেবে দুর্বল। কোনো হাদীস যদি সনদ হিসেবে দুর্বলও হয় কিন্তু এর অনুরূপ মর্ম অন্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তাহলে সেটি হাসান (উত্তম) সনদের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। যাহোক সনদ কিছুটা দুর্বল এ কথা সঠিক; কিন্তু অর্থ দুর্বল নয়।

অতএব উম্মতের আলেমগণ নবী তো নন; কিন্তু এমন কাজ করেন, যা সাধারণত নবীগণ করেন। যেখানেই কোনো আলেম বসে গেছেন, সেখানে হাজার-হাজার মানুষকে ঈমান ও মারেফাতের রঙে রঙিন করেছেন।

একজন ইমাম আবু হানীফা রহ. কুফায় জন্মলাভ করেন। তাঁর ইলমি প্রভাব কুফা হতে খুরাসান ও ইরানে পৌঁছে এবং ইরান হতে আফগানিস্তানের দিকে আসে। তারপর সেখান থেকে ভারতবর্ষে প্রভাব ফেলে।

এ-কারণে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ উম্মত হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এমনকি শাম ও সিরিয়ার অধিকাংশ মানুষ হানাফী। তাঁর ফিকাহ যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই সেই ফিকাহ অধিকাংশ মানুষকে নিজের রুচিবোধ দ্বারা রঙিন করেছে। ফলে লক্ষ-কোটি মানুষ হানাফী হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. একজন সত্যপন্থী এবং মুজতাহিদ ইমাম। তিনি মিসরে জন্মলাভ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় হিজাযে অবস্থান করেন। ফলে হিজাযের অধিকাংশ শাফেয়ী, মিসরের অধিকাংশ শাফেয়ী মাযহারের অনুসারী। সর্বশেষে তিনি মিসর অবস্থানকালে পরলোকগমন করেন।

ইমাম মালেহ রহ. ইমামে দারুল হিজরত তথা মদীনার ইমাম। তাই আরবের পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে অধিকাংশ মালেকী মাযহাবের অনুসারী।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. নাজদ ও ইয়েমেনে বসবাস করতেন।

তাই ওখানকার অধিকাংশ মানুষ হাম্বলী। মোটকথা, একজন আলেমে রব্বানী যেখানেই পৌঁছেছেন, অবস্থান করেছেন, লাখ লাখ মানুষের ভিতর ঈমানের নূর সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঈমানের মধ্যে ঝড় লাগিয়েছেন। অতএব, বরকতময় সত্তা এসে যেত, আর সবাই উম্মত বনে যেত, লাখো-কোটি মানুষের ঈমান নসীব হতো।

এ-যুগে যেহেতু নবওয়াত থাকবে না, তাই আলেমদেরকে সর্বশেষ নবীর স্থলাভিসিক্ত বানানো হয়েছে। তাঁরা এমন কাজ করবেন, যা নবীগণ করতেন। তারা নবীদের তরিকা ও নিয়মে তাবলীগ করবেন। তাদের তরবিয়ত হবে, তালিম হবে, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি হবে। এমনিভাবে ওই উলামায়ে রব্বানীগণ কাজ করেছেন, ইমামগণ কাজ করেছেন এবং তারা সঠিক অর্থে আপন পয়গম্বর আ.-এর কয়েম মাকাম হয়ে দেখিয়েছেন।

আমল ও বানানো শরীয়ত

এ-বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, প্রথম শতাব্দিতে ইলমের সাথে-সাথে শরীয়তের সমগ্র আনুষঙ্গিক বিষয় প্রকাশ হয়নি। হাজারো ঘটনা ও নতুন বিষয় পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইল্লাত ও কুল্লিয়াতের সুরতে আহকাম বিদ্যমান ছিল আর সেগুলো প্রকাশ্য বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব এই উম্মত মুজতাহিদ উম্মত। যাকে উলামায়ে কেরাম অন্য শব্দে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'একটি হলো আসল শরীয়ত, যা কুরআন ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অন্তরে নাযিল হয়েছে। আরেকটি হলো ওয়াযয়ী শরীয়ত যে, এই আসলি শরীয়ত থেকে আহকাম বের করে ফিকাহ সংকলন করেছেন, বহু কিতাব সংকলিত হয়েছে, হাজার হাজার কিতাব লেখা হয়েছে। সেগুলো কিতাব ও সুন্নাত হতে উদ্ভাবন করা আহকাম। নাউযুবিল্লাহ! এগুলো কোন মুজতাহিদের ব্যক্তিগত আবিষ্কৃত বস্তু নয়। তারা উসূল ও মূলনীতি থেকে আহহাম উদ্ভাবন করেছেন। অতএব তাও মূলত কুরআন ও সুন্নাতের বিধিবিধান। পার্থক্য এতটুকু যে, মুজতাহিদদের মেধা ওই পর্যন্ত পৌঁছে। আমাদের মেধা পৌঁছে না। আমরা শুধু তাদের অনুসরণ করতে পারি। তাদের তাকলিদ করা ব্যতীত আমরা আর কী করতে পারি?

সুতরাং মুজতাহিদগণ কিতাব ও সুন্নাত থেকে দীন ধারণ করে দীনকে সতেজ ও সজ্জিত করেছেন। ফলে অধ্যায়সমূহ ও পাঠসমূহে সজ্জিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ফন্ ও বিষয়ের উপর হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে। ফিকাহ

সংকলন হওয়ার পর এ-বিষয়ে হাজার হাজার কিতাব প্রকাশ হয়েছে। উসূলে ফিকাহ তথা ফিকার মূলনীতি সংকলন হওয়ার পর সেটি একটি পৃথক ফন হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। তেমনিভাবে ইলম থেকে ইলম, শাখা থেকে শাখা সৃষ্টি হতে হতে পৃথিবীতে ইলম ছড়িয়ে পড়ে, বিস্তার লাভ করে। অতএব যে শান নবীদের যে, তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে ইলম অর্জন করে মাখলুককে দেন, তেমনিভাবে ওই শান মুজতাহিদদেরও যে, তারা নবী আ. থেকে ইলম অর্জন করে উম্মতের মাঝে বণ্টন করেন।

বিশ্বমানবতার যৌবনকাল

এ-সম্পর্কে আমি বলেছি, ইলমের প্রাথমিক স্তর ছিল ইলমুল আসমা তথা নামসমূহের জ্ঞান। সেটি ছিল বিশ্বমানবতার শিশুকাল। তারপর যখন তারুণ্যের যুগ এল, যা হযরত নূহ আ.-এর যামানা ছিল, তখন নামীয় বস্তুর ইলমের যুগ এল। তারপর মধ্যস্থলে যৌবনকাল এল। তখন হযরত হুদ আ. এবং হযরত সালেহ আ. প্রেরিত হলেন। সে সময় বয়সও বেশি, শরীরের গঠনও বিশাল ও দীর্ঘ।

আদ জাতির উপর যখন আযাব এল এবং তারা বাতাসের আছাড় খেয়ে খেয়ে জমিনে পড়ছিল, সেই দৃশ্য বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে– 'তাদের দেহ খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা লম্বা ছিল, তাদের বয়স হতো হাজার, দেড় হাজার বছর।'

আমরা তো একেকটি বাড়ি-ঘর নির্মাণ করি। এতে শ ও দুশ বছরের মধ্যে আমাদের কয়েক পুরুষ তাতে বসবাস করে। আর তাদের যুগে তিনশো-চারশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ঘর ভেঙে যেত। অতঃপর আবার বাড়ি নির্মাণ করত। তারপর চারশো বছরে অতিক্রম হওয়ার পর পুনরায় বাড়ি নির্মাণ করত। এভাবে একেকজন মানুষ চার-চারবার বাড়ি নির্মাণ করত। কারণ, বয়স হতো দেড় হাজার বছর। তাই নতুন নতুন বাড়ি নির্মাণ হতো। যাহোক তাদের বয়স বেশি ছিল। অতএব এভাবে বলা দরকার যে, হযরত আদম আ.-এর যুগ মানব জাতির শিশুকালের যুগ। আদ ও সামুদ জাতির যুগ যৌবনকালের যুগ।

যৌবনকাল তো এমন হয় যে, পাঞ্জা লড়ে, দৌড়ঝাঁপ করে, কুস্তি খেলে। প্রত্যেকে বলে আমার চেয়ে কার শক্তি বেশি। অপরজন বলে, তোমার চেয়ে আমার শক্তি বেশি। আদ ও সামুদ জাতির অবস্থা এমনই ছিল–

من اشد منا قوة

আমাদের চেয়ে কে শক্তিশালী?

তাদের কর্ম দেখলে জিন্নাত মনে হবে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وتنحتون من الجبال بيوتا

তারা পাহাড় কেটে-কেটে বিল্ডিং নির্মাণ করত।

দুনিয়ার বিল্ডিং নিচ থেকে উপরে ওঠে আর তারা উপর থেকে নির্মাণ করে করে নিচে নিয়ে আসত। তারা পাহাড়গুলোকে কেটে কেটে এবং খনন করে করে বিল্ডিং নির্মাণ করত। যাহোক, তা ছিল যৌবনকাল। তারা এমন এমন কাজ করেছে, যেগুলোর কল্পনাও আমরা করতে পারি না।

মানবজগতের শিশুকালের শিক্ষাব্যবস্থা

একথা সুস্পষ্ট যে, শিশুরা যখন কোনো কিছু পড়তে ও শিখতে অনাগ্রহ ও বিরক্তি প্রকাশ করে, তখন তাকে আদর-সোহাগ করা হয়, উৎসাহ দেওয়া হয় যে, মিষ্টি খাওয়াব, টাকা-পয়সা দেব ইত্যাদি। তখন বাচ্চা পড়া শুরু করে। খেলাধুলার সামগ্রী সামনে বেশি রাখলে সে শিশু মনোযোগী হয়।

সুতরাং হযরত আদম আ.-এর যে সমস্ত সহীফা ছিল, সেগুলোর মধ্যে কারিগরি ও বিভিন্ন পেশার শিক্ষা ছিল যে, জাগতিক বস্তু এভাবে তৈরি কর। সেজন্য দুনিয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

انما الحيوة الدنيا لعب ولهو

নিশ্চয়ই দুনিয়া খেলাধুলার সামগ্রী।

তাই খেলনা বেশি দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর আগ্রহী হয় এবং এ পদ্ধতিতে ইলম অর্জনের পথ দেখানো হয়েছে। কেমন যেন এটি তরবিয়তের হেকমত যে, এমন মেজাজ ও বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। একথা বলা হয়নি যে, তুমি প্রথমে জোয়ান হও তারপর আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছ, আল্লাহর মারেফাত অর্জন কর। বরং শিশুকালেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার, তাঁর পরিচয় লাভ করার পথ ও পন্থা দেখানো হয়েছে। অতএব কামিল ও পরিপূর্ণ মুরুব্বি তিনি, যিনি মানুষ যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায় তাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম বানিয়ে দেন।

হযরত মাওলানা মুহসীন কাকুরী রহ. একজন বড় মাপের আলেম ও কবি ছিলেন। নাত বিষয়ে তার কবিতা বাস্তবে অনেক উঁচু মানের এবং জ্ঞানগর্ভ

হতো। তিনি নিজের ছোটবেলার ঘটনা লিখেছেন যে, লক্ষ্ণৌতে প্রতিবছর একটি নির্ধারিত সময়ে ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব হতো। বড় বড় নবাব ও বড় বড় আমীর-উমারাগণ ঘুড়ি উড়াতেন। ঘুড়ি উড়ানোর ম্যাচ হতো। একজন অপরজনের ঘুড়ির সুতা কাটতে পারলে বলা হতো সে বিজয়ী হয়েছে। সেই উৎসবে হারজিত ছিল। ম্যাচ হিসেবে খেলা হতো। বাতাসে ঘুড়ি উড়ানো হতো। হযরত মাওলানা মুহসীন রহ. বলেন, আমি ছোট ছিলাম। আমার ঘুড়ি উড়ানোর আগ্রহ ছিল। কিন্তু ঘুড়ি উৎসব আলেমদের ঘরের জন্য মুনাসিব ছিল না। তাই সম্মানিত পিতা বাধাও দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাও বাতলে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, তুমি জিততে চাও, তুমি অন্যদের মাথা কাটতে চাও? তিনি বললেন, জি, আমি এগুলো চাই। পিতাজী বললেন, বিজয়ী হওয়ার তদবির তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। তুমি শেষ রাত্রে উঠে প্রথমে চার রাকাত নামায পড়বে, তারপর সূরা ইখলাস পাঠ করে সুতায় মাঝা লাগাতে থাক এবং আল্লাহর নাম জপতে থাক। তারপর তুমি যদি পাল্লা লাগাও তাহলে জিতে যাবে।'

মরহুম মাওলানা বলেন, এখন আমি শেষ রাতে জাগ্রত হই, ওযু করি, নামায পড়ি, সূরা ইখলাস পড়ে সুতা মাঝি। তারপর সকাল বেলায় ম্যাচে অংশগ্রহণ করে অধিকাংশ ম্যাচে জয়লাভ করি। তিনি বলেন, পরিশেষে ফলাফল এমন হলো যে, জোয়ান হওয়ার পর ঘুড়ি উড়ানো তো বন্ধ হয়ে গেল; কিন্তু তাহাজ্জুদ অবশিষ্ট রয়ে গেল, মারেফাত বাকি রয়ে গেল।

মোটকথা, এটি একটি তদবির ও কৌশল ছিল। একথা বলা হয়নি যে, যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি আল্লাহকে চিনবে। বরং শিশুকালের আত্মা এবং অবস্থা থেকে তোমরা আল্লাহকে চিনো, জানো। অতএব তাদেরকে সে পথে চালানো হয়েছিল।

এমনিভাবে হযরত আদম আ.-এর যামানায় নামের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে। হযরত নূহ আ. যামানায় নামীয় বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় করানো হয়েছে। আদ ও সামুদ জাতি জোয়ান জাতি ছিল, তাদেরকে তাদের শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে।

মানবজগতের যৌবনকালের শিক্ষানীতি

এটি নিয়ম-নীতির কথা যে, শিশু যদি অনাগ্রহ ও অনীহা প্রকাশ করে, তাহলে দুয়েকটি থাপ্পর মারা হয়, কিছু উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু জোয়ান যদি

শৈথিল্য ও অলসতা প্রদর্শন করে, তাহলে, উস্তাদ ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না, কঠিন শাস্তি দেন এবং বলেন, যখন যৌবনকালে কাজ করছ না, তো বৃদ্ধকালে করবে?

অতএব যৌবনকালে আদর-স্নেহ বেশি করা হয় না। ধমকি-হুমকি বেশি হয় যে, এখন কাজ করবে না, পড়বে, তো তা কোন্ বয়সে করবে? সুতরাং আদ ও সামুদ জাতি যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন একথা বলা হয়নি যে, এদের খেলাধুলার জন্য দেওয়া হয়েছে। বরং অন্ধকার প্রবল করে দিলেন এবং বাতাস-তুফান দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। সামুদ জাতিকে চিৎকার দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে যে, যুবক বয়সে যখন আমল করবে না, তোমাদের জন্য কি বৃদ্ধ বয়স আসবে? এজন্য জোয়ানদের উপর ধমকি-হুমকি বেশি হয়, শিশুদের উপর বেশি হয় না। তাদের আগ্রহ বেশি দেওয়া হয়। সেজন্য আদ ও সামুদ জাতি আযাবে পাকড়াও হয়েছিল।

বিশ্ব মানবতার বৃদ্ধকাল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিকরণ

ধীরে ধীরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানা এল। অতএব এটি বিশ্ব মানুষের বৃদ্ধ ও শেষকাল। কেমন যেন বনি আদম দুর্বল হয়ে পড়েছে, না তাদের দেহে প্রশস্ততা ও উচ্চতা আছে, নেই পূর্বেকার মানুষের মতো বয়স, নেই পূর্ব যামানার মানুষের ন্যায় শক্তি। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষের দেমাগ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়। আকল-বুদ্ধি বড় হয়, বৃদ্ধি পায় যদিও কাজের শক্তি হ্রাস পায়। জোয়ানদের কাজ হলো, বৃদ্ধ ও বড়দের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা, কারণ, তারা যুগের অনেক উষ্ণতা ও শীতলতা অতিক্রম করেছেন। সেগুলোর অভিজ্ঞতা তাদের নখদর্পণে। অতএব জোয়ানদের দায়িত্ব, তারা কাজ করবে, যখন প্রতিবন্ধকতা আসবে, তখন বৃদ্ধদের থেকে, মুরুব্বিদের থেকে পরামর্শ নেবে। তারা কাজের পথ ও পন্থা বলে দেবেন।

বৃদ্ধকালে ইলমের প্রশস্ততা

তিনি বলেন, কোথাও বরযাত্রী গেল, তাতে শদুয়েক মানুষ ছিল। যে বাড়িতে গিয়েছিল, তারা পানাহারে নামকরা ছিল। তারা এমন শর্তারোপ করল যে, বরযাত্রী দলে যারা আসবে, তাদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ থাকতে পারবে না, সবাই যুবক হতে হবে। বরের বাড়িতে পরামর্শ হলো, বৃদ্ধ সাথে না থাকলে যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহলে পরামর্শ কে দেবে? তখন তারা একজন বৃদ্ধকে

ঢোলের ভিতর বন্ধ করে নিয়ে গেল, যাতে তাদের শর্তের বিপরীত না হয় এবং বৃদ্ধও যেতে পারে। বরযাত্রী পৌঁছার পর ঘরওয়ালা বলল, কনে তো দেব কিন্তু শর্ত হলো এই যে, প্রত্যেক মানুষের সামনে একটি আস্ত ছাগল ভুনা করে রাখা হবে, তার সবটুকু খেতে হবে, না খেতে পারলে আমরা মেয়ে বিবাহ দেব না।

এখন বেচারারা মহা মুশকিলে পড়ে গেল যে, এত বড় পেট কার আছে যে, একটি আস্ত ছাগল নিজের ভিতর প্রবেশ করাবে। তখন তারা বলল, ভাই বুঝেশুনে উত্তর দেব। তারা ঢোলওয়ালার নিকট গেল। বৃদ্ধকে ঢোল হতে বের করল এবং বলল, তারা শর্তারোপ করেছে যে প্রত্যেকে একটি করে ছাগল আহার করবে। আমাদের মধ্যে তো এমন শক্তি নেই যে, একটি করে ভুনা ছাগল খেয়ে ফেলব। যদি শর্ত রদ করি, তাহলে বিবাহ হবে না আর মেনে নেয়া তো সম্ভব নয়।

বড় মিয়া বললেন, না, তোমরা শর্ত মেনে নাও। তাদের বলে দাও, একটি করে ভুনা ছাগল পেশ করতে থাক। এখন যখন একটি ভুনা ছাগল পেশ করা হয়, সাথে-সাথে সকল বরযাত্রীর মাঝে টুকরো টুকরো বণ্টন হয়ে যায় এবং নিমিষেই খতম হয়ে যায়। এমনিভাবে বড় মিয়ার পরামর্শে তাদের শর্তও পুরা হলো এবং বরযাত্রী কনে নিয়ে ফিরল।

বৃদ্ধ উম্মতের উপর হতে আমলের বোঝা কমানো হয়েছে

এ-উম্মত বৃদ্ধ উম্মত। এজন্য কর্মক্ষমতা তো হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু দেমাগ ও আন্তরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজ্ঞতা সুপ্রশস্ত হয়েছে। পৃথিবীর উম্মতের অবস্থাদি কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে তাদের নখদর্পণে। অতএব এই উম্মত আলেম, মুজতাহিদ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্নও।

বৃদ্ধদের দায়িত্বে সামান্য ও সহজ কাজ থাকে। তাদের ভারী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু তাদের প্রশংসা বেশি করা হয় যে, বড় মিয়া, বড় কাজ করেছেন। সুতরাং যখন বিবাহ-শাদী হয়, তখন খাবারের পাতিলের নিকট বড় মিয়াকে বসানো হয়। তিনি দেখাশোনা করেন, নেগরানি করেন, জোয়ানরা খাবার পরিবেশন করে। এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। আর বড় মিয়া বসে থাকেন এবং সন্ধ্যার সময় বলেন, 'সাহেব! বড় মিয়ার হেকমত অসাধারণ, তুলনাহীন তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেগরানী করেছেন। অথচ বড় মিয়া শুধু বসে রয়েছেন, কোন নড়াচড়া করেননি।'

কিন্তু অনেক প্রশংসা করা হয় যে, বড় মিয়ার হিম্মত এমন এমন। অতএব বড়দের বেশি প্রশংসা করা হয়। ভারী কাজের দায়িত্ব থাকে না। পূর্বেকার উম্মতের কোমরে শিকল এবং হাতে হাতকড়া ছিল। ছিল বাধ্যবাধকতা। ছিল অত্যন্ত কঠিন কঠিন সাধনা ও রিয়াযত এবং জন্তুর মেহনতের আমল। সেগুলো খতম ও বিলুপ্ত করে সহজসাধ্য আমল দেওয়া হয়েছে এবং প্রশংসা ও প্রতিদান বেশি করা হয়েছে যে, একটি আমল করলে দশটি নেকীর সাওয়াব পাবে এবং দশের পর সাতশত গুণ বৃদ্ধি হবে আর আল্লাহ যাকে যত যাবেন বাড়িয়ে দেবেন। মোটকথা, প্রতিদান আরো বৃদ্ধি করা হয়, প্রশংসা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমলের বোঝা কমিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, উম্মত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে, সেজন্য আমলের বোঝা অনেক কম এবং প্রতিদান বেশি।

দীনের পূর্ণতা

যাহোক, উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানবকুল ধাপে-ধাপে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে। হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়েছে । আর শেষ ও সমাপ্ত হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে। ইতিপূর্বে আশা ছিল, উম্মত বৃদ্ধি পাবে। সেই আশাসমূহ কার্যকর রূপ পেয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে। এই উম্মত ও পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ পাকের ইরশাদ–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

দীন পূর্ণ করা হয়েছে, আকিদাগতভাবে চারিত্রিকভাবে আমল হিসেবে আহওয়াল ও সুনান হিসেবেও। অর্থাৎ সার্বিকভাবে এই উম্মতকে তাকমিল করা হয়েছে। ফলে দীন পরিপূর্ণ হয়েছে।

সমাপ্তি অধিক আনন্দ ও খুশির বস্তু

ইতোপূর্বে বলে এসেছি, এই উম্মত তাকমিলপ্রিয়। এজন্য তাদের মধ্যে তাকমিলপ্রিয়তার জযবা রয়েছে। সেজন্য তাদের সূচনা অপেক্ষা সমাপ্তি বেশি আনন্দের। কারণ, সমাপ্তির সময় সব কাজ তাকমিল তথা পরিপূর্ণ হয়। যদিও সূচনা ও সমাপ্তি উভয়টি খুশি ও আনন্দের বস্তু।

যখন শিশুর জন্ম হয়, তখন মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী যেদিন মৃত্যু হবে সেদিন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করবে যে, ভাই! আজ তাকমিল হয়েছে। আজ অত্যন্ত খুশির দিন। কিন্তু আপনি বলবেন যে, এমন মুহূর্তে কেউ তো খুশি হয় না, সবাই বসে আহাজারি করতে থাকে। কিন্তু যেহেতু তাকমিল ও পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তাই আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

আমিও বলি, মৃত্যুর কারণে কেউ খুশি হয় না। ইন্তিকাল হওয়ার উপর কেউ আনন্দিত হয় না। বরং মৃত্যু যদি ভাল হতো, তাহলে সবাই বলত, হে আল্লাহ! এমন মৃত্যু সবাইকে নসীব কর। আর যদি মৃত্যু কোনো কান্নার বস্তু হতো, তাহলে মানুষ এমন দোয়া কেন করে যে, হে আল্লাহ! এমন মৃত্যু আমাকে নসীব কর।

আল্লাহর পথে কেউ শহীদ হলো। সবাই বলে অত্যন্ত মর্যাদার বস্তু। আল্লাহ আমাকেও এমন মৃত্যু নসীব করুন। এতে বোঝা গেল, মৃত্যু চিন্তার বস্তু নয়। মউত খুশি ও আনন্দের বস্তু। চিন্তা ও দুঃখ হয় শুধু নিজেদের প্রিয় পাত্র ও আত্মীয় বিয়োগ হওয়ার। আমাদের থেকে, আমাদের প্রিয়ভাজন পৃথক হয়ে যাচ্ছে, আমরা তার ফয়েজ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। তার ইন্তি কালের ব্যথা অনুভব হয় না, ইন্তিকালের মাধ্যমে তো সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তা কী কোনো চিন্তা ও ব্যতীত হওয়ার বস্তু। একজন মানুষ তার প্রভুর সাথে মিলিত হচ্ছে, তা কোনো কান্নার বিষয় হতে পারে না। তা মূলত আসল খুশি ও আনন্দের বিষয় যে, জীবন যে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল, আজ সেই কাজ পূর্ণতা লাভ করছে। সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ কথাকে হাদীস শরীফে এভাবে পেশ করা হয়েছে যে–

الموت تحفة المؤمن

মৃত্যু মুমিনের উপহার।

আর তা কেন? এজন্য যে– 'মৃত্যু একটি ব্রিজ, যাকে অতিক্রম করে মানুষ তার আসল বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়।'

অতএব কোন পরিপূর্ণ প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, তা কি কোনো চিন্তার কারণ হতে পারে? এ তো আসল ও প্রকৃত আনন্দের বিষয়। এখন তারা এজন্য কাঁদে যে, আমাদের থেকে প্রিয়জন বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। তাই বিরহের ব্যথা অনুভব হয়, মিলনের ব্যথায় কাঁদে না। কিন্তু একই সময় যেহেতু দুটি বস্তু একত্রিত হয়, তাই লোকেরা মনে করে, মৃত্যুর উপর ক্রন্দন করছে। মৃত্যুর উপর কেউ কাঁদে না, মউত তো তোহফা, উপঢৌকন।

সমাপ্তি ও পূর্ণতার তামান্না

এ কারণে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বেলায়েতের আলামত। সমস্ত অলীগণ মৃত্যুকে তামান্না করেন। আর ফাসেকরা মউতকে ভয় করে। কারণ, তাদের ভবিষ্যতের আশা নেই। আর আউলিয়া কেরাম ও রব্বানী লোকেরা মৃত্যু তামান্না করেন আর বলে, কখন মোবারক সময় আসবে, যখন এই বিরান ভূমি ত্যাগ করব এবং সেই উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছে যাব, আল্লাহ যার ওয়াদা দিয়েছেন।

অতএব মৃত্যুর তামান্না বেলায়েতের আলামাত। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন– 'আয় আল্লাহ! প্রত্যেক এমন ব্যক্তির অন্তরে মউতের মহব্বাত ঢেলে দাও, যে মনে করে আমি তোমার রাসূল ও নবী।'

যে হাদীসের মধ্যে মৃত্যুর তামান্নাকে নিষেধ করা হয়েছে তা এজন্য যে, দুনিয়ার কোন নসিবাতে পড়ে মৃত্যু প্রার্থনা করা। আর আল্লাহর সাক্ষাতের আশায় মৃত্যু তামান্না করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণতাদিবস নির্বাচন

এই উম্মতের মেজাজ-তবিয়তের মধ্যে যেহেতু তাকমিলপছন্দী রয়েছে, তাই সায়্যেদুল আইয়াম (প্রধান দিন) নির্বাচনে সকল উম্মতের পরীক্ষার সময় এই উম্মত নিজেদের ইবাদাতের জন্য সৃষ্টজীবের সৃষ্টির পূর্ণতার দিন জুমার দিনকে পছন্দ করেছে। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করেছে আর নাসারারা রবিবারকে পছন্দ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইলমে পছন্দনীয় দিন হলো জুমার দিন, যা তাকমীলের দিন, পূর্ণতার দিন। তাকে উম্মতে মুসলিম পছন্দ করেছে।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আদম আ.কে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পূর্বে নিযাম বানানো হয়েছে, ঘর-বাড়ি সাজানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে, খাবার, পানি, শস্য ইত্যাদি জমিনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে মেহমানকে আনা হয়েছে। আর উপরই সৃষ্টি তাকমিল ও পূর্ণতা লাভ করেছে। মোটকথা, এই উম্মত তাকমিল দিবস পছন্দ করেছে। কারণ, তাদের মধ্যে তাকমিলপ্রিয়তার জযবা ছিল। তাই এমন দিন গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে পূর্ণতা ছিল।

একদিকে সমাপ্তি অপরদিকে সূচনা

যাহোক, কথা অনেক দূরে চলে গেছে। সুতরাং সূচনাও খুশির বস্তু, সমাপ্তিও আনন্দের বস্তু। অতএব আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শোকর আমাদের স্নেহের মুহাম্মদ আযহার কুরআনুল কারীমের হিফজ খতম করেছে, তাই এটি তাকমিল দিবস। যেদিন তা শুরু করেছিল, সেদিন আসাতিযায়ে কেরাম, মাতা-পিতা সবাই আশাবাদী ছিল যে, ইনশাআল্লাহ সে হায়েজ হবে। সবার তামান্না ছিল হাফেয হবে। আজ সেই আশা পুরা হয়েছে। তাই আজ অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের দিন। পূর্ণ করার আনন্দ। শুরু ও সূচনা করার আনন্দ নয়। বরং পূর্ণতা লাভের আনন্দ। অতএব তার জন্য দোয়া যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম হাফেয বানান, মুজাব্বিদওয়ালা কারী বানান, আমলওয়ালা আলেম বানান, চরিত্রবান, মুত্তাকী ও পরহেযগার বানান এবং মাতা-পিতা ও উস্তাদদের সকল আশা পূরণ হোক। আল্লাহ পাক এই সমস্ত জিনিসগুলোকেও তাকমিল করেন, যেমনভাবে আজ কুরআন শরীফের হেফজকে তাকমিল ও পূরণ করেছেন।

আজ কুরআনের শব্দাবলি তার সিনাতে জমা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ কুরআনের অর্থাবলি জমা হবে, অর্থের পর হাকায়েক জমা হবে, তারপর ইল্লাত জমা হবে, তারপর রহস্যভেদ, হেকমত ও মুসলেহাত উন্মোচিত হবে। এভাবে ইলম বাড়তে থাকবে। মোটকথা, এক হিসেবে এটি সূচনা অর্থ বোঝার জন্য। আর অপরদিকে এটি তাকমিল যে, শব্দাবলি মুখস্থ হয়েছে।

উলুম ও ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ

অতএব শব্দাবলি সিনাতে জমা হয়েছে। কুরআনুল কারীম দুটি বস্তুর সম্মিলিত রূপ। শুধু শব্দের নাম কুরআন নয়, না শুধু অর্থের নাম কুরআন। বরং অর্থসহ শব্দাবলির সমষ্টির নাম কুরআন। শব্দাবলি মুখস্থ করা হয় আর অর্থ বোঝা ও অনুভব করা হয়। একটির মধ্যে মুখস্থ শক্তি কাজ করে আর অপরদিকে আকল ও বোধশক্তি কাজ করে। মুখস্থ শক্তির কাজ হলো সরাসরি শব্দাবলিকে নিজের ভিতর সংরক্ষণ করা। আর আকল ও বোধশক্তির কাজ হলো শব্দের ভিতর থেকে অর্থ বের করা এবং অর্থের ভিতর থেকে অর্থ বের করার কারণে কুরআনুল কারীম একটি মহাসমুদ্র যে, তার অর্থ থেকে অর্থ বের হয়।

সূচনাতে একটি শব্দ, যা খোসার মতো। তার মগজ হলো অর্থ। তারপর অর্থও খোসার মতো। তার ভিতর আরো অর্থ রয়েছে। তারপর সেই অর্থও খোসার মতো। তার ভিতরে অর্থ আছে। মোটকথা, উলুমের মধ্যে যেমনভাবে শ্রেণীভেদ রয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত্বের মাঝেও শ্রেণীভেদ ও পদমর্যাদা রেখেছেন। একে তো এমন যে, যিনি শুধু শব্দের অর্থ বুঝে নেন, তিনিও উচ্চ পর্যায়ের মানুষ। আরেকজন অর্থ হতে আগে বেড়ে হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছে যান, তিনি পূর্ব ব্যক্তি হতে উঁচু মানের আলেম। আরেকজন হাকিকত অর্জনের পর ইল্লাত ও আসরার তথা কারণ ও রহস্যভেদও বুঝেন। তিনি আরো উচ্চ পর্যায়ের আলেম। অতএব, যেমনভাবে কুরআনের আয়াতের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে, তেমনি ব্যক্তিত্বের মধ্যেও মর্যাদাভেদ রয়েছে। একজন শুধু শব্দাবলির আলেম। আরেকজন অর্থাবলির আলেম। অপরজন ইল্লাত ও আসরারের আলেম। অতঃপর কুরআনের হাজারো উলুম রয়েছে, যেগুলোর জ্ঞান মানুষ অর্জন করে আলেম হন।

সারকথা, এটি একটি আনন্দের দিন যে, আমাদের একজন স্নেহভাজন কুরআনুল কারীমের হেফজ তাকমিল করেছে। তারপর অর্থের হিফজ শুরু হবে। এখন আমরা দোয়া করব, আল্লাহ পাক তাকে অর্থেরও আলেম বানান, তারপরও এ-দোয়া করব যে, আল্লাহ তায়ালা তার ভিতর পবিত্র আত্মা সৃষ্টি করেন, যাতে হাকিকত ও উলুমে মারেফাত তার উপর উন্মুক্ত হয়, প্রকাশ পায়।

মোবারকবাদ জ্ঞাপন

যাহোক এহেন আনন্দঘন মুহূর্তে আমি উক্ত শব্দাবলির মাধ্যমে, তার খেদমতে এবং তার পিতা-মাতা ও উস্তাদদের খেদমতে মুবারকবাদ পেশ করছি।

কিন্তু ভাই! আমাদের অঞ্চলে নিয়ম হলো, যখন মোবারকবাদ দেওয়া হয়, তখন অবশ্যই মিষ্টিমুখ করানো হয়। শুধু চা-টা পান করানো যথেষ্ট নয়। তাই মুখমিঠা হওয়া চাই। এমনকি দোয়ার পূর্বে হওয়া উচিত। মিষ্টি মুখে যে দোয়া বের হয় তাতে সম্পর্ক বেশি হয়। এজন্য প্রয়োজন হলো মিঠা মুখ করানো, যাতে দোয়ার মধ্যে ভালোরূপে অংশগ্রহণ করে। আর তা সূক্ষ্ম ইশারায় মিষ্টি প্রার্থনা নয় বরং বাস্তবতা। এমন নয় যে, এখন আমার বলার কারণে এমন করবেন। বরং এটিই প্রকৃত নিয়ম। এখন আল্লাহ পাক যাকে তাওফীক দিবেন তিনি পারবেন। যাহোক আমাদের কাজ হলো, যখন

উপস্থিত হয়েছি তো ধন্যবাদ পেশ করব এবং খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করব। আল্লাহ তায়ালার তার মতো আরো হাফেয এই মাদরাসা থেকে সৃষ্টি করুন।

হুসনে নিয়তের ফলাফল

আমাদের ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী যে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে এ-প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যে নিয়ন্ত্রণ, নীতিমালা ও শৃঙ্খলিত পন্থায় পরিচালনা করছেন এবং উত্তম ও উন্নত নিয়মাবলি ও মূলনীতি তৈয়ার করেছেন, এগুলো হাকিকতে তার সুন্দর নিয়তের ফসল, যা প্রকাশ পাচ্ছে, বিশাল আলীশান বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে, নীতিমালা তৈরি হয়েছে, অনেক ছাত্র ও উস্তাদ রয়েছে, ভালোরূপে লেখাপড়ার কাজও চলছে।

এককজন মুখলিস জন্মেছে তো হাজারো মুখলিস তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন জগতে একজন নবী আসেন; তখন লাখ লাখ মানুষ ঈমানের রঙ্গে রঙ্গিন হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের মাঝে ব্যক্তিত্ব পয়দা করেন, তাদের মাধ্যমে পরবর্তী হাজারো ব্যক্তিত্ব বনে যায়। যাহোক এগুলো মাওলানার নেক নিয়তের ফল।

সত্যবাহী পূর্বসূরী পাঠানোর ওয়াদা

আল্লাহ যেভাবে কুরআনুল কারীম হেফাজতের ওয়াদা করেছেন, । তেমনিভাবে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার দায়িত্বও নিয়েছেন। হাদীস শরীফে এর ওয়াদা বিদ্যমান–

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

> উত্তরসূরীদের পর পূর্বসূরী পয়দা হতে থাকবে, তারা সালফদের ইলম অর্জন করতে থাকবে।

মোটকথা, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। খালফ হওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলে থাকে, সাহেব! যামানা খারাপ হয়ে গেছে, এখন সত্য-সঠিক পূর্বসূরী জন্ম নেবে না। আমি বলি, এমন ধারণা সাধারণত ভ্রান্ত। নিঃসন্দেহে খালফ সালফের মতো হবে না। কিন্তু যে সকল পূর্বসূরী আসবেন, তারা পূর্বসূরী হবেন আর তখনকার সময়ের জন্য তারাই উত্তম। অতএব বৈশিষ্ট্য ও ধরন কখনও নিঃশেষ হবে না। আলেমদের পরে আলেম হবে, হাফেযদের পরে হাফেয হবে। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, সাহাবাদের যুগ, তারপর তাবেঈদের যুগ, তারপর তাবে-তাবেঈদের যুগ। অতএব যে মাকাম সাহাবীদের ছিল, তা তাবেঈদের হবে না, যা তাবেঈদের ছিল, তা তাবে-তাবেঈদের হবে না। এখানে ব্যক্তিত্বের মধ্যে শ্রেণীভেদ এবং পদমর্যাদার পার্থব্য করব। কিন্তু ধরন ও শ্রেণী কেয়ামত পর্যন্ত একই থাকবে, যে সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো। কেউ বলতে পারে না, তার প্রথম ফোঁটা বেশি উপকারী, না শেষ ফোঁটা।'

অতএব উম্মত হলো বৃষ্টি। তার প্রথম ও শেষ ফোঁটা জমিনে বর্ষিত হচ্ছে এবং জমিন পরিতৃপ্ত ও তরতাজা হচ্ছে। মোটকথা, উম্মতের মাঝে খায়ের ও কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে।

যাহোক, আল্লাহ তায়ালা কিতাব ও সুন্নাহ এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মাপকাঠি দাঁড় করিয়েছেন। এগুলোর মাধ্যমে সত্যের রাস্তা পাওয়া যাবে, দেখা যাবে।

ব্যক্তিত্ব নির্বাচন ও পছন্দ করার প্রয়োজনীয়তা

আমি তো এতটুকু বলি যে, যদি হকপন্থীদের মাঝে ইখতিলাফ ও মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইখতিলাফ হক ছেড়ে দেওয়ার কারণ নয়। দীনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছেড়ে দেওয়ার ওজর নয়।

আল্লাহ না করুন, আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর ডাক্তারদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে কখনও কি এমন ফয়সালা করবেন যে, আমরা মরে যাব এবং কবরে চলে যাব। কারণ, ডাক্তাদের মধ্যে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আপনি নির্বাচন করবেন এই হিসেবে যে, এই ডাক্তার অমুক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন অথবা এমন মানদণ্ডে যে, তার নিকট অনেকে আরোগ্য লাভ করেছে। অথবা এই হিসেবে যে, তার পূর্বপুরুষ থেকে ডাক্তার ছিল, তার চিকিৎসা বেশি উপযোগী। কোনো না কোনো মাপকাঠিতে আপনি ডাক্তার নির্বাচন করবেন। এহেন ফয়সালা কখনও করবেন না যে, ডাক্তারদের মাঝে মতবিরোধ, সুতরাং আমাদের মরে যাওয়া উচিৎ, কবরকে আবাদ করা উচিত।

মোটকথা, শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসা সম্পর্কে ডাক্তারদের মতভেদকে আপনি ভয় পান না, ঘাবড়ে যান না, বরং যে কোনো উপায়ে চিকিৎসা নির্বাচন

করেন। তাহলে আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ হলে আপনি কেন নির্বাচন করবেন না, পছন্দ করবেন না? এখানে এমন ফয়সালা কেন করবেন যে, যেহেতু উলামায়ে কেরাম মতনৈক্য করছেন, তাই দীন পরিহার করা উচিত। না এখানেও নির্বাচন করতে হবে, পছন্দ করতে হবে।

নির্বাচনের মানদণ্ড

এখানে নির্বাচনের মাপকাঠি ভিন্ন। আসল জিনিস হলো আপনি সত্যবাদী ও সঠিক তালাশ করবেন। যে আলেমের দীনদারীর উপর আপনার ভরসা ও মনের প্রশান্তি আসবে, তার উপর আপনার দীন সোপর্দ করবেন এবং তার নিকট জিজ্ঞেস করে করে দীনের উপর আমল করবেন। আপনাকে ফয়সালাকারী কে বানাল যে, আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ; তাই আপনি তৃতীয় পক্ষ হবেন যে, যখন তাদের ইখতিলাফ নিঃশেষ হবে, তখন আমার দীন সামলাব, তখন দীনের সেবা করব। এমতাবস্থায় ইখতিলাফ বন্ধ হবে না এবং আপনার দীনও চালু হবে না। এই মতবিরোধকারী এবং লড়াইকারীদের মধ্য হতে আপনার যে ব্যক্তি বা যে জামাত এবং তবকার উপর আপনার মনের আস্থা আসে, সেদিকে আপনি মনোনিবেশ করুন, আপনার দীন অর্পণ করুন। আর কে কী বলে সেদিকে আপনি নজর দিবেন না।

সর্বসাধারণের দলিল

আমি খুব সংক্ষেপে বলি যে, আলেমদের জন্য তো কুরআন ও হাদীস হুজ্জত। এগুলো থেকে তারা মাসায়েল তালাশ করবে। আর সর্বসাধারণের জন্য হুজ্জত হলো আলেমগণ। সাধারণদের কাজ নয় যে, তারা সরাসরি কুরআন ও হাদীস বুঝবে। তাদের শিক্ষা নেই। তারা এগুলো কিভাবে বুঝবে? তাদের কাজ হলো তারা আলেমে রব্বানীগণ যে ফতোওয়া দিবেন, সেগুলোর উপর আমল করবে। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কেউ ভ্রান্ত ফতোওয়া দিয়েছে, তাহলে আপনার দায়িত্ব নয় যে, আপনি বলবেন সেই আলেম কেন ভ্রান্ত ফতোওয়া দিলেন এবং এতে আপনার মুক্তিও নেই যে, ওই আলেমকে বলবেন, আপনি ভুল ফতোওয়া দিলেন।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ভুল ফতোওয়া দিল, তাকে পাকড়াও করা হবে, আমলকারীদের নয়। তারা তো দীনদারীর সাথে আমল করেছে। অতএব আপনি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবেন যে, এই ইখতিলাফকারীদের মধ্যে কোন

গ্রুপ, কোন ব্যক্তি, বাস্তবে দীনদার। তাদের ভিতর ও বাহির এক। আপনি দীনের ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিবেন। আলেমদের ইখতিলাফ আলেমদের উপর ছেড়ে দিন, আপনি তো কোনো বিচারক নন যে, তাদের নিয়ে বসে ফয়সালা ও মীমাংসা করে দিবেন। তারা নিজেদের ফয়সালা নিজেরা করবে। তাদের মাঝে ফয়সালাকারী এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি তাদের উভয়ের চেয়ে বড় আলেম। তিনি ফয়সালা দিবেন, এই আলেম সঠিক বলছেন, না আর অমুক আলেম ভুল বলছেন। আপনি তো আলিফ বা কিছুই জানেন না। আপনি গেলেন আলেমদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য। তাহলে আপনি কি ফয়সালা দিবেন? আপনার কাজ হলো মনের প্রশান্তি লাভ করার পর নির্বাচন করা, পছন্দ করা। যার নিকট শুনে শুনে নিজের দীন চালাবেন, আমল করবেন। ফতোওয়া ও মাসায়েল জিজ্ঞেস করে করে নিজের দীন সামলাবেন। যখন দীন ও ইলম অর্জন হবে তখন আপনার দায়িত্ব হলো, যে পথে আপনি চলবেন দীনদারীর সাথে চলবেন। এজন্য সবচেয়ে বড় খারাবী হলো, এই আলেমদের মতভেদ দেখে লোকেরা বলতে থাকে, ভাই সাহেব! দীন ছেড়ে দিতে হবে, আমরা কোথায় যাব এক আলেম, একে কথা বলে।

আপনাদের নিকট প্রশ্ন হলো, আপনাদের রোগ হলে তখন যদি ডাক্তারদের মাঝে মতভেদ হয়, তাহলে আপনারা কোথায় যান, কবরে চলে যান? তখন কাউকে বিচারক বানান এবং নির্বাচন করে নেন। তাহলে দীনের ব্যাপারে কেন নির্বাচন করেন না? দীনের ব্যাপারে নিজেই মুফতি হওয়ার চেষ্টা করেন, যা সরাসরি ভ্রান্ত কাজ।

আলেমদের একতা জরুরি

এ-ব্যাপারে আলেমদের নিকট এই আর্জি যে, আপনারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হন। সামান্য মিল থাকলেও ঐক্যবদ্ধ হন। নিজেদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিজেদের ঘরে সীমাবদ্ধ রাখুন। নিজেরা আমল করুন এবং আপনাদের উপর যারা প্রভাবিত, তাদের দ্বারা আমল করান। কিন্তু যতটুকু মিল রয়েছে তাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগে বাড়েন। ইসলামের দুশমন অনেক, আল্লাহর শত্রু অনেক, যারা রাত-দিন দীনের উপর হামলা করে যাচ্ছে। দীনের মূলোৎপাটনের চিন্তা করছে। আপনারা তাদের মোকাবেলা কেন করছেন না। আপনাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা পরস্পর যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে।

সারকথা, পরস্পর সামান্য মিল থাকলেও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে করুন,

সবাই এক প্লাটফর্মে কাজ করুন। উদাহরণত, আল্লাহ এক, রাসূল এক, কিতাব এক, এখন যদি কারো বুঝের ইখতিলাফ হয়, তাহলে হতে থাকুক। আপনারা আপনাদের দীনি জীবন যাপন করার ফিকির করুন।

সত্য অন্বেষণ করা

যাহোক আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করানো বা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আপনার নিজের দীনী জিন্দেগীর ব্যাপারে বেফিকির হবেন না। হক ও সত্য তালাশে আপনি নির্ভরযোগ্য আলেম পেয়ে যাবেন। আজও পৃথিবী এমন নয় যে, আপনি উলামায়ে রব্বানী বা নির্ভরযোগ্য আলেম পাবেন না। যদিও তারা অল্প কিন্তু পাবেন, অবশ্যই আছে। তাদের আঁচল ধরে জিজ্ঞেস করে করে তাদের অনুসরণ করতে থাকুন। আপনাদের জীবন সুন্দরমতো পরিচালিত হবে।

মোটকথা, আলেমদের ইখতিলাফকে আপন দীনের জন্য নারাজীর মাধ্যমে বানাবেন না। বরং নির্বাচন ও পছন্দের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করবেন।

এ-কটি কথা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আল্লাহ সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আর আমাদের সবাইকে তার মর্জি মোতাবেক চলার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

বয়ান : ৭

হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.

শেষ বয়সে তিনি বিশেষভাবে এমন তামান্না প্রকাশ করেছেন–

'আমার মন চায়, আমি ইউরোপ পৌঁছে বলি, হেকমত (প্রজ্ঞা) তার নাম নয়, যাকে তোমরা ভুলক্রমে হেকমত মনে করে বসে আছ। বরং হেকমত হলো এমন বস্তু, যার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের আবিষ্কার তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ.

[ইসলামী ইতিহাসের এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব)]

অল ইন্ডিয়া রেডিও দিল্লী, নিজেদের সেন্টারে উলামা ও মুসলেহীনদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য একটি ধারাবাহিক প্রোগ্রাম শুরু করেছিল। সেই ধারাবাহিকতার প্রথম বক্তৃতা, যা হযরত নানুতুবী রহ.-এর সম্পর্কে সম্প্রচার করা হয়েছিল, সেটি পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরছি।

বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়

আমার এ-তাকরীরের আলোচ্য বিষয় হলো, ভারতবর্ষে ইসলামি ইতিহাসের একজন অমর ব্যক্তিত্ব হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ., যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি ১২৪৮ হিজরি মোতাবেক ১৮৩২ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১২৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৯ ঈসায়ীতে ইহধাম ত্যাগ করেন। এই ৪৯ বছরের স্বল্প সময়ে তিনি ইসলাম এবং জাতীয় সেবায় যে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, তা কয়েকশ বছরের কাজ ছিল, যাকে শুধু ভারতবর্ষ নয় বরং পুরো জগৎ কোনো দিন ভুলতে পারবে না। তিনি সবার নিকট অমর হয়ে থাকবেন।

ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভ ও মুসলিমদের পরাজয়

১৮৫৭ সালে কাসেম নানুতুবী রহ. আপন মুর্শিদ ও পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহ.-এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে ভিনদেশীদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু পরাজিত হন। ফলে সারাদেশে ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র ভারতবাসী এবং বিশেষ করে মুসলিমদের অন্তর ভেঙ্গে পড়ে। আর সবার মাঝে হিনম্মন্যতার পাশাপাশি

রেখে সারা দেশে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে মুরাদাবাদ, গিলাউটি, আমরোহা, মুজাফফরনগর ইত্যাদি স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন মুরিদদের মৌখিকভাবে বার্তা পাঠিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার তাকিদ দেন। ফলে হযরতের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামি ইউনিভার্সিটি

তারপর হযরত নানুতুবী রহ.-এর স্বাধীনতা চেতনার আমানতদার ফুযালাগণ সারা দেশে এমনকি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও সেই কাসেমী চিন্তা-চেতনার নমুনায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আমার স্বচোখে দেখা যে, আজ ইংরেজদের দেশে কাসেমী চেতনা দীপ্তি লাভ করছে। আন্ত র্জাতিক মানের অবৈতনিক শিক্ষার সর্বপ্রথম জনতার মার্কায ভারতের দারুল উলম দেওবন্দ, যার জন্য হযরত নানুতুবী সাহেব রহ.কে পরহেযগার উলামা এবং বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব রহ. মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব রহ., মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব রহ., হযরত হাজী মুহাম্মদ আবিদ সাহেব রহ. প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ ইখলাসপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। সেই দারুল ইলুম দেওবন্দ আজ এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামি মার্কায এবং স্থায়ী বিশ্ববিদ্যালয়। এটি একটি বিশেষ চিন্তাধারার রিচার্স সেন্টার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রসিদ্ধি লাভ ও গৌরব অর্জন করছে।

আরবী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দকে এমন মূলনীতির উপর কায়েম করেছেন, যার ফলে জন্মের প্রথম দিন থেকেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একটি জনতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হযরত রহ. আপন মোবারক হস্তে আটটি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেন, যা দারুল উলুমের ইতিহাসের রেকর্ডে আজও সংরক্ষিত আছে এবং আজ পর্যন্ত সর্ব যুগে হযরত নানুতুবী রহ.-এর সেই ইলহাসী ও ভিত্তিমূলক মূলনীতিগুলোর পুরোপুরি সংরক্ষণ ও রেয়ায়েত করা হচ্ছে। সেই মূলনীতিগুলো আসলে দারুল উলুম দেওবন্দের সত্তাগত বুনিয়াদ, যার উপর তার জাহেরী ও বাতেনী উন্নয়ন নির্ভর করে। আর শুধু দারুল উলুম নয় বরং

ওই দীনি মাদরাসাসমূহেরও বুনিয়াদ, যেগুলো দেওবন্দের চিন্তা-চেতনায় হযরত কাসেম সাহেব, তাঁর মুরিদ ও চেতনাধারীগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তিনি উসূলে হাশতেগানার উপর শিরোনাম কায়েম করেছেন যে, 'এমন উসূল, যার উপর মাদরাসাসমূহের অর্থনৈতিক সাইড নির্ভর করে।'

এই সর্বব্যাপী মূলনীতিগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তি কায়েম হয়, যার মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষের মুসলিম জনতা নতুন জীবন লাভ করে। উক্ত মূলনীতি মোতাবেক হযরত নানুতুবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দকে শুধু জনসাধারণের চাঁদার উপর কায়েম করেন, যাতে তার মধ্যে প্রথম থেকেই সর্বব্যাপী ও ব্যাপক জাতীয়তাবোধ ফুটে ওঠে এবং সেটি ভারতবর্ষের গরিব জনতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রমাণিত হয়। সাথে-সাথে সেই উসূলসমূহে এমন হিদায়েত রয়েছে যে, মাদরাসার জন্য কোনো স্থায়ী অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা এবং কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা না করা। এমন করার দ্বারা গায়েবী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়ার মহান সামান হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং উস্তাদ ও কর্মচারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। যে বিষয়কে তার মুখলিস সহকারী হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান উসমানী রহ. তার দীর্ঘ কবিতার কিছু পঙক্তিতে এভাবে ব্যস্ত করেছেন–

'এর প্রতিষ্ঠাতার ওসীয়ত যে, যখন তার জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তখন এই ঝুলন্ত বাতি এবং তাওয়াক্কুলের চেরাগ আলোহীন ও জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, গায়েবী সাহায্য বন্ধ হবে।'

সেই উসুলগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে এ-বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণ স্বাধীন থাকবে, যা ঐক্যবদ্ধতার আত্মা।

তারপর এর পাশাপাশি মূলনীতিগতভাবে দারুল উলুমের সকল মুয়ামালা মুশাওয়ারাভিত্তিক পরিচালিত হবে এবং বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল (মুহতামিম)দের জন্য এমন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, তিনি নির্দিষ্ট শূরা পরিষদ ব্যতীত এমন ব্যক্তিদের সাথেও পরামর্শ করবেন, যারা প্রতিষ্ঠানের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। এই উসূলগুলো হযরত নানুতুবী রহ.-এর সর্বব্যাপী এবং ঐক্যবদ্ধ চেতনায় চিন্তার অনস্বীকার্য সাক্ষী। আর এগুলোর মাধ্যমে দেওবন্দের ধরন ও গুরুত্ব পরিসস্ফুটিত হয়।

তুর্কী খেলাফতের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব

ইংরেজদের জাতীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও একগুঁয়েমিকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য যার রুখ বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি ছিল হযরত নানুতুবী রহ. নিজের ব্যাপক রাজনৈতিক রাহনুমায়ীর মাধ্যমে যুগের ইসলামি খেলাফত অর্থাৎ খেলাফতে তুর্কীর সমর্থনের প্রতি বিশেষভাবে মুসলিমদে ঝোঁকালেন। তুর্কী সুলতানের প্রশংসা করে কসিদা রচনা করলেন এবং খলিফাতুল মুসলিমীন এবং খাদেমে হারামাইন হওয়া হিসেবে মুসলমানদের তার প্রতি ধাবিত করলেন। সেই যুগে রাশিয়া-রোমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন তিনি দৌড়ঝাঁপ করে তুর্কীদের জন্য হাজার হাজার রুপি সাহায্য পাঠান এবং তিনি নিজের ঘরের সবচেয়ে বড় সামান চাঁদা হিসেবে তুর্কী খেলাফতের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে খেলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জাতিগত ঐক্যবদ্ধ অটুট রাখতে পারেন এবং শৃঙ্খলা ঠিক করতে পারেন।

এই জযবা ও আবেগের সাথে দেশের অন্যান্য জাতিদেরও হামদর্দী ও সহমর্মিতা ছিল। আর সেই প্রভাবে যখন ভারতবর্ষের মুসলিমরা খেলাফত যিন্দা ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে, তখন দল-মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল পৃথক ধর্মের লোক ঐক্যবদ্ধ ও একতা হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তিনি একতাপছন্দির কারণে মুসলমানদেরকে বেশি বেশি হজ্ব পালনের প্রতি উৎসাহ দিতেন। কারণ, হজ্ব হলো ঐক্যবদ্ধ ও আন্তর্জাতিক ইবাদত, যাতে পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলমান এক স্থানে একত্রিত হয়ে পরস্পর মিলিত হতে পারে এবং তাদের আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধতার সম্পর্ক মজবুত হয়।

কাসেমী চিন্তাধারার তিনটি বুনিয়াদি উপাদান

উক্ত ব্যাখ্যা কাসেমী চিন্তাধারার তিনটি বুনিয়াদী মৌলিক উপাদান সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেগুলো হলো- ১. জাতির স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ২. ঐক্যবদ্ধতার চেতনাকে ব্যাপক করা এবং ৩. মার্কাযের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, অত্যন্ত সম্মানের সাথে জড়িত থাকা। পরিণামে এ চিন্তধারা তার তরবিয়তপ্রাপ্তদের ভিত সুদৃঢ় হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে তার প্রিয় শাগরেদ হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুর হাসান সাহেব রহ. কাসেমী চেতনার আমানতদার হলেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রিয় খলিফা হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব তাঁর ইলমি

আমানতদার হলেন এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. রেশমী রোমান নামক আন্দোলনের সূচনা করেন। এর কারণে মাল্টা দ্বীপে ইংরেজদের বন্দীশালায় দীর্ঘ পাঁচ বছর মানবেতন জীবন-যাপন করেন। তারপর তাঁর হাজার হাজার শাগরেদের মধ্যে এই চেতনা ও চিন্তাধারা মূল ধাতুর মতো প্রকাশ হয়।

যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হযরত আল্লামা সৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মুফতী কিফায়েতুল্লাহ দেহলভী রহ., হযরত উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ., হযরত মুহাম্মদ মিয়া সাহেব রহ., হযরত মানসুর আনসারী রহ. প্রমুখ, যারা পরিশেষে ভারতকে স্বাধীন করেছেন এবং পরিশেষে এই বুযুর্গের একক ইসলামি বিশ্বের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

হযরত নানুতুবী রহ.-এর ইউরোপ ভ্রমণের তামান্না

শেষ বয়সে তিনি বিশেষভাবে এমন তামান্না প্রকাশ করেছেন যে–

'আমার মন চায়, আমি ইউরোপ পৌঁছে বলি, হেকমত (প্রজ্ঞা) তার নাম নয়, যাকে তোমরা ভুলক্রমে হেকমত মনে করে বসে আছ। বরং হেকমত হলো এমন বস্তু, যার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের আবিষ্কার তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত হবে।' শাহজাহানপুরের বাহাসের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক মোড় যে, সেখানে তিনি হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে কলহ ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজি রাজনীতির রুখকে তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেন, যার স্বীকৃতি তখনকার যুগের হিন্দু নেতা ও সর্দারগণ এই বলে দিয়েছেন যে, 'এই মৌলবী ভারতবর্ষের ইজ্জত রেখেছেন।'

এই উজ্জ্বল বাস্তবতা, এ মহান হাকিকত প্রসিদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট যে, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব রহ.-এর ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক। তার শায়েখ ও মুর্শিদ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব রহ. বলেন, 'কয়েক শতাব্দির পর আল্লাহ তায়ালা মাওলানা কাসেম সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করলেন।'

বয়ান : ৮

ইলম ও হেকমতের ঝর্ণাধারা

[বিভিন্ন স্থানে মানুষের পক্ষ থেকে কৃত প্রশ্নাবলি এবং হযরত হাকীমুল ইসলামের জ্ঞানগর্ভ উত্তরমালা]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَمُصَلِّيًا عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বাস্তব চিত্র

এ মজলিসের আলোচ্যবিষয় ছিল মুযাকারা তথা পর্যালোচনা। কোন তাকরীর বা ওয়াজ ছিল না। যেমনটি বোম্বে শহরে সংগঠিত হতো যে, ঈশার পর কিছু মানুষ একত্রিত হতো। তাদের থেকে কেউ প্রশ্ন করলে বা সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি আপন ইলম ও মেধা অনুপাতে উত্তর প্রদান করতেন। এমনই আলোচ্য বিষয় এই মজলিসের। কিন্তু এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবে। কেউ কেউ কিছু প্রশ্ন লিখে আমাকে দেবে যে, এ ব্যাপারে কিছু বলুন। এমন প্রশ্নাবলি অধিকাংশ সময় ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যম হয়। এজন্যে সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

অলীদের মাযারে উপস্থিতি ও উলামায়ে দেওবন্দ

প্রশ্ন–১ : প্রথম প্রশ্ন করা হয় যে, উলামায়ে দেওবন্দ আউলিয়া ও বুযুর্গদের কবরে ও মাযারে যেতে নিষেধ করেন এবং কবরে ফাতিহা ও দোয়া করতে বাঁধা দেন। এমন দাবি একেবারেই মিথ্যা, বিলকুল ভ্রান্ত ও বানোয়াট। উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক ও চিন্তাধারা এমন যে, আহলুল্লাহদের কবর

যিয়ারত করা অত্যন্ত বরকতের মাধ্যম এবং ফয়েজ অর্জনের উছিলা। উলামায়ে দেওবন্দের মাঝে বাইয়াত ও ইরশাদ এর সিলসিলা রয়েছে। এজন্যে আমাদেরকে চিশতী বলা হয়। কিন্তু আমাদের বুযুর্গগণ চার খান্দানের রিয়াজত করাতেন এবং অনুমতিও প্রদান করতেন। অর্থাৎ চিশতিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া এবং নকশবন্দিয়া এই চার তরিকায় রিয়াজত ও সাধনা করাতেন। আমাদের দেওবন্দের প্রধান মুফতি হযরত মাওলানা আযিযুর রহমান সাহেব রহ. নকশবন্দী ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর মাযারে ওরশের সময় উপস্থিত হতেন। তিনি তো দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম। অতএব আমাদের ভিতরও নকশবন্দী সিলসিলা বিদ্যমান। দেওবন্দের সর্ব প্রথম মুহতামিম হযরত মাওলানা যফী উদ্দীন সাহেব রহ. নকশবন্দী খান্দানের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত শাহ আব্দুল গনী সাহেব রহ.-এর নিকট বাইয়াত ছিলেন। তাঁর সিলসিলা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁরা নকশবন্দী ছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে উলামায়ে দেওবন্দ যেমন মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহী রহ. হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. তাঁরা সবাই চিশতী ছিলেন। আমাদের সিলসিলা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী রহ. এবং হযরত সাবির কলীরি রহ. এ সমস্ত বুযুর্গদের মাধ্যম হয়ে হযরত আলী রা.-এর উপর সমাপ্ত হয়। তাঁরা সবাই তাঁদের সিলসিলার যত বুযুর্গ ও আউলিয়া রয়েছেন তাঁদের মাযারে হাজির হতেন এবং ফয়েজ হাসিল করতেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ. অধিকাংশ বছরে কলীর শরীফে উপস্থিত হতেন। তিনি এমন আদবের সাথে যেতেন যে, আমার ধারণামতে সম্ভবত কোন বুযুর্গ তাঁর শায়েখের মাযারে উপস্থিত হন না। রোড়কী হতে ছয় মাইল দূরে হযরত সাবির কালিরী রহ.-এর মাযার। তিনি নদীর পাড় দিয়ে যেতেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. নদীর তীরে পৌঁছে জুতা খুলে ফেলতেন। দীর্ঘ ছয় মাইল খালী পায়ে হাঁটতেন। ওখানে পৌঁছে ঈশার পর রওজার ভিতরে প্রবেশ করতেন। সেখানে রিয়াজত, মুজাহাদা ও ফয়েজ লাভ করতেন এবং ফজরের নামাযের জন্যে সেখান থেকে বের হতেন।

যাহোক, এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও বানানো কথা যে, উলামায়ে দেওবন্দ আউলিয়াদের মানেন না। যদি না মানতেন, তাহলে তাদের সিলসিলায় কেন কাজ করতেন? তাঁরা বাইয়াত ও ইরশাদাতের সিলসিলা কেন কায়েম করতেন? যদি মাযার যিয়ারতকে হারাম মনে করতেন, তাহেল নিজে কেন

খালী পায়ে আদবের সাথে মাযারে উপস্থিত হতেন?

হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ভারতবর্ষে সিলসিলার যত আকাবির ও বুযুর্গের মাযার রয়েছে তিনি সময় করে করে তাদের মাযারে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত শাহ মুহিবুল্লাহ সাহেব রহ.-এর মাযার ইলাহাবাদে। তিনি ওখানে উপস্থিত হয়েছেন। তেমনিভাবে কালিরী শরীফে গিয়েছেন আর আযমির শরীফে পৃথকভাবে পৌঁছেছেন। তেমনিভাবে আমি নিজেও এই সমস্ত মাযারে উপস্থিত হয়েছি এবং সময় পেলে, সুযোগ হলে উপস্থিত হই। সুতরাং কাউকে না জানিয়ে একবার আজমির শরীফে উপস্থিত হলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম, ইসালে সাওয়াব করে দু-ঘন্টা পর ফিরে যাব। দিনটি ছিল শুক্রবার। ওখানে পৌঁছে মাযারে উপস্থিত হলাম। দু-আড়াই ঘণ্টা ওখানে অবস্থান করলাম। তারপর বের হলাম, আনুমানিক আযানের আরো এক ঘণ্টা বাকী। তখন ইচ্ছা করলাম, এখানে জুমআর নামায পড়ে স্টেশনে চলে যাব। কারণ, রেল রাত আটটায় ছেড়ে যাবে। এমন ইচ্ছা ছিল, যেহেতু এখানে কারো সাথে বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু যখন জুমার নামায পড়তে গেলাম, তখন কিছু মানুষ আমাকে গভীর নজরে দেখতে লাগল। আমি বুঝলাম, হয়তো আমাকে কেউ চিনে ফেলেছে। জুমার পর একদল এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে হযরত দেওয়ান সাহেব সবার অগ্রে ছিলেন, যিনি এখানকার গদীনশিন ছিলেন। তিনি বললেন, আপনদের থেকে এমন অপরিচিত কেন? আগাম কোনো খবর নেই! চুপিসারে আসা, তারপর চুপিসারে চলে যাওয়া, পরিশেষে আমদের সঙ্গে এমন অপরিচিতের ব্যবহার কেন?

আমি বললাম, আমি একজন খাদেম ও নিঃস্ব হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর খাদেম তো ঘোষণা করে আসে ে, অভাবী তো জানিয়ে আসে না। উপস্থিত হওয়া তাদের কর্তব্য। অতএব, আমি জানিয়ে কেন আপনাদের কষ্ট দেব। একজন প্রার্থী হিসেবে যিয়ারতে এসেছি। এখানে হাজার-হাজার খাদেম আগমন করে। এমনি একজন খাদেম এসেছে, এতে জানানোর কী প্রয়োজন। যাহোক তারা পিড়াপীড়ি করে অবস্থান করাল।

আমার রাতের বেলা ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল। আমার টিকেটও ওকে হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য সবকিছুকে রহিত করাল। আমি বললাম, দিল্লীতে পৌঁছা অত্যন্ত জরুরী। ওখানে মাহফিলের প্রোগ্রাম রয়েছে। তখন তারা টেলিফোনে হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের সাথে কথা বললেন যে, আপনি চাই মাহফিল করেন আর না করেন কিন্তু হযরতকে আসতে দেওয়া যাবে না।

সুতরাং তারা আমাকে রেখে দিল। তারপর সেখানে খানকাতে তাকরীর করার ঘোষণা হল। তখন হযরত খাজা সাহেব রহ.-এর ফাযায়েলের উপর এক থেকে দেড় ঘণ্টা তাকরীর করলাম।

অতএব, উলামায়ে দেওবন্দ যদি বুযুর্গদের মাযারে যেতে বাঁধা দিতেন, তাহলে আমার কেন যাওয়ার তাওফীক হয়েছিল? আমাদের আকাবির ও বুযুর্গদের যাওয়ার তাওফীক কেন হয়েছিল?

কবর যিয়ারত নিষেধকারীদের সাথে যুদ্ধ

আমরা এমন মানুষদের সাথে লড়াই করি, যারা বাস্তবে মাযার যিয়ারতে নিষেধ করে থাকে। আর এ যুদ্ধ পক্ষপাতিত্বের যুদ্ধ নয়। বরং দলিল-প্রমাণ দ্বারা যুদ্ধ এবং হাদীসের দৃষ্টিকোণ দ্বারা যুদ্ধ।

হাদীস শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزورها فانها تذكر الاخرة

> তোমাদের তো কবর যিয়ারত থেকে বাঁধা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন অনুমতি দিচ্ছি। কবরের নিকট যাও। কারণ, ওখানে গেলে পরকাল স্মরণ হবে এবং মানুষের সামনে নিজের মৃত্যু ভেসে ওঠে। ফলে ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি মন ধাবিত হয়।

মোটকথা, তিনি বলেছেন প্রথমে নিষেধ করতাম, এখন অনুমতি দিচ্ছি। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে এবং অনুমতি প্রমাণিত হয়েছে। সারকথা হল, উক্ত হাদীসের দৃষ্টিতে কবর যিয়ারত হক এবং প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজন যে, কবরে যাও এবং পরকালের স্মরণ তাজা কর।

কবর যিয়ারতের জন্যে ভ্রমণ

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, শুধু কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর করা জায়েয কিনা?

একদল বলে থাকে, জায়েয নেই। আমাদের আকাবির ও বুযুর্গদের দাবি হল এমন যে, পৃথকভাবে শুধু কবর যিয়ারতের জন্যে সফর করা জায়েয। আলোচনা হল, এই হাদীসের মধ্যে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصٰى وَمَسْجِدِي هٰذَا

তিন মসজিদ ব্যতীত সফর জায়েয নেই। প্রথম মসজিদে হারাম তথা বাইতুল্লাহ শরীফ। দ্বিতীয় মসজিদে আকসা অর্থাৎ শামের বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তৃতীয় আমার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ হাদীস থেকে কতক এই মাসয়ালা উদ্ভাবন করেছেন যে, শুধু কবর যিয়ারতের সফর করা জায়েয নেই। উলামায়ে দেওবন্দ বলেন, এ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, কবরকে মাকসাদ বানিয়ে সফর করো না। কারণ, এখানে মসজিদের কথা বলা হয়েছে যে, কোনো মসজিদের নামায পড়ার জন্যে সফর করা জায়েয নেই। যদি হতো তাহলে এই তিন মসজিদের দিকে হত।

এই তিন মসজিদে কেন জায়েয রাখলেন?

কারণ, এ তিন মসজিদের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা পৃথিবীর আর কোনো মসজিদে নেই। বাইতুল্লাহ শরীফের বৈশিষ্ট্য এমন যে, সেখানে নামায পড়লে এক রাকাত এক লক্ষ্য রাকাতের সওয়াব হবে। মসজিদে নববীর বৈশিষ্ট্য এমন যে, সেখানে নামায পড়লে এক রাকাতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর মসজিদে আকসা বৈশিষ্ট্য হলো, এক রাকাত নামাযে দশ হাজার রাকাতের সাওয়াব মিলবে।

এছাড়া সকল মসজিদ আল্লাহর নিকট বরাবর। অতএব, বিশেষভাবে কোনো মসজিদকে উদ্দেশ করে সফর করার অর্থ এমন হবে যে, তাতে বিশেষ কোনো সাওয়াব রয়েছে। অথচ কোনো বিশেষ সাওয়াবের কথা আল্লাহর রাসূল বলেননি। তাই আমাদের অধিকার নেই যে, আমরা নিজ থেকে কোন কিছু করব অর্থাৎ বেশি সওয়াব মনে করব। যেখানেই যাব নামায সমান হবে, সওয়াবও সমান হবে।

অতএব, যারা কবরসমূহের সফরকে নিষেধ বলে থাকেন, তারা বলেন, উক্ত হাদীসের মধ্যে যে ইসতেছনা রয়েছে, তা হল ইসতেছনায়ে মুনকাতে অর্থাৎ কোন মসজিদের দিকে। কেমন যেন এখানে মসজিদসমূহের দিকে সফর করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তিন মসজিদের ব্যাপারে অনুমতি আছে।

অন্য মসজিদের জন্যে নেই। এ কারণে এখানে মসজিদ অর্থ ব্যাপক তথা সকল মসজিদ। চাই তাতে কবর থাকুক বা না থাকুক। তাই কোনো কবরের দিকেও সফর করা জায়েয নেই। শুধু তিন মসজিদের দিকে জায়েয আছে। আমরা বলি, ইস্তেছনার মধ্যে আসল হলো ইস্তেছনায়ে মুত্তাসিল। তথা (যাকে পূর্ব হুকুম থেকে পৃথক করা) এখানে সফর করে মসজিদের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসে কবরের কোনো আলোচনাই নেই। কবরের মাসয়ালা একেবারেই ভিন্ন। এ হাদীসে কবরের জন্যে সফর জায়েয হওয়া বা না হওয়া কোনোটার সাথে সম্পর্ক নেই। এ হাদীস শুধু মসজিদ সম্পর্কে, কবর সম্পর্কে নয়।

এখন রয়ে গেল কবরের মাসয়ালা। প্রথমে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, প্রথমে তো আমি তোমাদের বাঁধা দিতাম। এখন অনুমতি দিচ্ছি। এই এজাযতে এমন শর্তারোপ করা হয়নি যে, যদি শহরে থাকে, তাহলে কবর যিয়ারত কর। আর যদি বাইরে বা দূরে কোথাও থাকে, তাহলে যেও না। (অর্থাৎ কখনও কষ্ট করে শহরের বাইরে যেও না।) অতএব, সাধারণভাবে উলামায়ে দেওবন্দ কবর যিয়ারতকে জায়েয মনে করেন। যদি কবরকে উদ্দেশ্য বানিয়ে সফর করে, তাহলে করতে পারে, জায়েয আছে। কেমন যেন উলামায়ে দেওবন্দ অন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে লড়াই করছেন যে, অন্যরা বলছেন কবরের দিকে সফর জায়েয নেই আর উলামায়ে দেওবন্দ বলছেন, জায়েয আছে। এমনকি বরকতের কারণ এবং এতে ফয়েজ লাভ হয়। একটি ব্যাপক ফয়েজ লাভ হবে আর তা সব মুসলিমরা পেতে পারে। তাহলো, ওখানে পৌঁছে নিজেদের পরকালকে তাজা করবে। আরেকটি বিশেষ ফয়েজ, যা আহলে হাল বুযুর্গরা লাভ করতে পারেন। আর তা হলো এই যে, সাহেবে কবর থেকে বরকত নেওয়া। অতএব, যারা সাহেবে মুরাকাবা বা সাহেবে কাশফ, যারা আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করতে জানেন, গ্রহণ করার পদ্ধতি জানেন, তারা ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারেন।

মোটকথা, এমতাবস্থায় এহেন জঘন্য কথা বলা যে, উলামায়ে দেওবন্দ কবর যিয়ারতে বাঁধা দেন, তা একেবারে সুস্পষ্ট মিথ্যা, এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। শরীয়ত যখন নিষেধ করে না, তাহলে উলামায়ে দেওবন্দ কারা যে, নিষেধ করবে। তারা তো শরীয়তের অনুগামী ও গোলাম। শরীয়ত যা হুকুম করবে, তা করবে। যা নিষেধ করবে, তা থেকে বিরত থাকবে।

যাহোক তারা অনুমতিও দেন, সাথে-সাথে নিজেরাও আমল করেন।

আকাবিরগণ গিয়েছেন, যাচ্ছেন এবং যেতে থাকবেন। শুধু সর্বসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য এহেন বানোয়াট কথা প্রচার করা হয়। যখনই সুযোগ পায় মিথ্যা বলে। ফলে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

তাজিম জায়েয, ইবাদাত জায়েয নেই

হ্যাঁ, এক হলো কবরে গিয়ে কেউ বেয়াদবি করল। এ কাজকে আমরা বাঁধা দেই। তা সবাই বাঁধা দেবে। কবর যিয়ারত এজন্যে যে, তা তিনি আল্লাহর মুখলিস বান্দা ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট হতে বন্দেগী শিখব। আমরা সেই কাজ করব, যা কবরবাসী করতেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী চিশতী রহ.-এর মাযারে এজন্যে যাই যে, তিনি আল্লাহর নেক ও মুখলিস বান্দা ছিলেন। তিনি আল্লাহভোলা মানুষদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করাতেন আর বলতেন, স্রেফ আল্লাহর সামনে মাথা নত কর, সিজদা কর, আমরা এজন্যে যাই না যে, খাজা মঈনুদ্দীন সাহেব রহ.-এর কবর মোবারককে সিজদা করব। আমরা এহেন কাজকে শিরক মনে করি। আমরা যাই বরকত অর্জনের জন্যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের জন্যে সিজদা জায়েয মনে করেননি, তাহলে আউলিয়ায়ে কেরামের সিজদাকে কিভাবে জায়েয মনে করবেন যে, তাঁদেরকে সিজদা করা হবে।

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মজলিস মোবারকে আগমন করলেন। কয়েকজন সাহাবা উপস্থিত হলেন এবং সাথে-সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ কী করলে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসরা ও কায়সারের দরবারসমূহকে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা তাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন আর লোকেরা এসে তাদের সিজদা করে। যখর তাদের সিজদা করা যাবে, তাহলে আল্লহ্র রাসূল অধিক হকদার যে, আমরা তাঁকে সিজদা করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনো এমন করবে না। যদি গাইরুল্লাহকে সিজদা করা জায়েয হতো, তাহলে স্ত্রীদের আদেশ দিতাম, তোমাদের স্বামীদের সিজদা কর। কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নেই। ইবাদাত শুধু এক পবিত্র সত্তার জন্য। আর তাজিম ও সম্মান সকল আল্লাহওয়ালাদের জন্য তাদের মুর্তবা অনুপাতে।

অতএব, নবীদের মতো পবিত্র সত্তার জন্যে যখন সিজদা জায়েয নেই, তাহলে আউলিয়াদের জন্যে কিভাবে জায়েয হবে? অতএব মাযারে গিয়ে মাযারকে সিজদা করা এমন কর্মকে উলামায়ে দেওবন্দ শিরক্ মনে করেন। মাযারে গিয়ে বরকত হাসিল করা, আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের নাম নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা এসব কিছুকে জায়েয মনে করেন। আর এ কাজ ইবাদাত ও দাসত্বের বিপরীত নয় বরং আসল ইবাদত।

যদি এই আহলুল্লাহ ও বুযুর্গগণ জীবিত থাকতেন আর তাঁদের দরবারে আমরা উপস্থিত হতাম, তাহলে তখন সিজদা করতাম না। কারণ, যদি আমরা সিজদা করতাম, তাহলে তারা আমাদের ধাক্কা দিয়ে দরবার হতে বের করে দিতেন আর বলতেন, আমরা তোমাদের সিজদা করার জন্যে আসিনি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী ও তামাম সালেহীনের জন্যে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○

কোনো মানুষের জন্যে জায়েয নেই, যাকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন, ইলম ফযল ও কামাল তথা হেকমত দিয়েছেন এবং নবুওয়ত দিয়েছেন তারা মানুষদের একথা বলবে যে, তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও, আমার সামনে মাথা নত কর। বরং আল্লাহর বান্দা যাদের মধ্যে ইলম এবং হেকমত রয়েছে। তারা বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হও, তাঁর সামনে মাথানত কর, তাঁকে নিজের রব মনে কর এবং তাঁকেই হাজত পুরাকারী এবং মুশকিল আসানকারী মনে কর। শুধু তাকেই সিজদা কর। অর্থাৎ ইবাদাত আল্লহ্ ব্যতীত আর কারো জন্যে জায়েয নেই। আবেদ আর গোলাম শুধু আল্লহ্র সামনেই হওয়া যায়, অন্য কারো সামনে নয়। *[সূরা আলে ইমরান ৭৯]*

শিরকী নাম থেকে পরহেয করতে হবে

এ কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন-

احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।

কারণ, এ গুলোর মধ্যে আল্লাহর সামনে ইবাদাত ও বন্দেগী প্রকাশ পায়। কোনো বান্দার নামের সাথে যদি কেউ আবদ শব্দ যোগ করে যেমন বলে যে, 'আব্দুননবী' অথবা অন্য কোনো নাম বলে, কোনো মানুষের নামের সাথে আব্দ শব্দ লাগিয়ে ফেলে, তা জায়েয নেই। চাই তার অন্তরে এমন নিয়ত হোক যে, আমি তার ইবাদত করব না। তারপরও নাম রাখা জায়েয নেই! কারণ, এমন নাম থেকে শিরকের গন্ধ আসে।

তাজিম ও সম্মান করার আলোচনা এলে আম্বিয়াদের সম্মান করতে হবে, আউলিয়াদে সম্মান করতে হবে, সালেহীনদেরও সম্মান করতে হবে। প্রত্যেকের শান অনুপাতে সম্মান করতে হবে।

আউলিয়া কেরামদের তাজিম

মুমিনদের তাজিম ও সম্মান শরীয়ত অনুমোদন করেছে। ইরশাদ হয়েছে-

المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه

প্রত্যেক মুসলমানকে অপর মুসলমানের উপর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ তার জান হারাম, বস্ত্র হারাম এবং ইজ্জতও হারাম। না রক্তপাত করা যাবে, না সম্মান নষ্ট করা যাবে, না গালমন্দ করা যাবে। কেমন যেন প্রত্যেক মুসলমানকে সম্মানিত এবং ইজ্জতওয়ালা মনে করা হয়েছে। আর মুসলমানদের মাঝে উন্নত পর্যায়ের মানুষ হলেন আউলিয়া কেরাম। তাহলে অবশ্যই তাদের ইজ্জত ও সম্মানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আউলিয়াদের থেকে আরো বহু গুণ উন্নত নবীদের স্তর। তাহলে অবশ্যই তাঁদেরকে সর্বোচ্চ ইজ্জত করা হয়েছে। যদি সামান্যও অসম্মান করা হয়, তাহলে ঈমান চলে যাবে। ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

মোদ্দাকথা, এক হলো তাজিম ও সম্মান, আরেক হলো ইবাদত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, ইবাদাত শুধুই আল্লাহর জন্যে করা হয়। আর তাজিম ও

সম্মান বান্দর জন্যে। তারপর যে পর্যায়ের বান্দা তাকে সেই পর্যায়ের তাজিম করতে হবে। কিন্তু যে তাজিমের মধ্যে ইবাদাতের গন্ধ আসবে, সেই তাজিম নিষিদ্ধ।

গাইরুল্লাহর জন্যে আংশিক ইবাদাতও জায়েয নেই

ফুকাহায়ে হানাফী লিখেন যে, সালাম এতটুকু নত হয়ে করা যে, রুকুর মত হয়ে যায় এমনটি জায়েয নেই। কারণ, তাতে ইবাদাতের ঘ্রাণ আসতে থাকে এবং তাতে ইবাদাত ও বন্দেগীর সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। আর ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে জায়েয নেই। অতএব, সালামও এতটুকু ঝুঁকে করা যাবে না যে, রুকুর আকৃতি হয়ে যাবে। কারণ, রুকু ইবাদাতের অংশ। তাই কোনো বান্দার সামনে রুকু করাও জায়েয নেই।

কিয়াম ও সিজদার নিষেধাজ্ঞা

হাদীস শরীফে এসেছে, কিছু সাহাবা রা. চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবেন। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা যে পর্যায়ের সম্মানিত ও ইজ্জতওয়ালা তিনি এমন পর্যায়ের সম্মানের অধিকারী। কিন্তু তিনি বললেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, লোকেরা আমার সম্মানে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহলে সে জাহান্নামে গিয়ে নিজের ঠিকানা অন্বেষণ করুক।

এখানে নিষেধ করা হলো, যাতে লোকেরা আমার দরবারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে না থাকে।

তিনি বলেন, আমিও বান্দা, তোমরাও বান্দা। আল্লাহ তায়ালা আমার উপর ওহী নাযিল করে এই সম্মান প্রদান করেছেন। তাঁর সম্মান করা, সামনে দাঁড়িয়ে কিয়াম করা এটি ইবাদাতের পরিভাষার একটি অংশ। সেজন্যে ইসলামি শরীয়ত পৃথক কিয়াম নিষেধ করেছে।

মোটকথা, নবীগণ দুনিয়াতে থাকলে সিজদা করা যাবে না। যদি সিজদা করা হয়, তাহলে তাঁরা নিজেরাই নারাজ হবেন। রুকু করা যাবে না। তাঁরা

রুকুকারীদের নিজহাতে দরবার থেকে বের করে দিতেন। হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। এমনটি কারলে তাঁরা ধমক দিতেন।

আর আউলিয়া কেরাম তো সবচেয়ে বেশি নবীদের পদাংক অনুসরণ করে চলেন। সেজন্যে আউলিয়াগণও উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তাদের দরবারে এমন কার্যাবলি জায়েয হতো না। তাহলে ওফাতের পর কিভাবে জায়েয হতে পারে?

কবরে সিজদা করা নিষেধ

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لا تجعل قبری وثنا یعبد

দেখ আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ে ফেলবে না যে, তাকে সিজদা কর অথবা তাকে পুঁজা কর।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজেকে সিজদা করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং ওফাতের পরও নিষেধ করেছেন যে, আমার কবরকে সিজদার স্থান বানিও না যে, তাকে মূর্তি বানিয়ে নাও এবং একে সিজদা কর।

দরুদ শরীফ ব্যাপক করার হেকমত

হাদীস শরীফে এসেছে–

صلوا علی حیث شئتم

দরুদ পড়, যেখান থেকে পড়বে আমার নিকট পৌঁছে যাব।

যাহোক আমরা শরয়ী দলিল থেকে একথা বুঝতে পেরেছি যে, অলিদের তাজিম করা ঈমানের অংশ। তাঁদের মহব্বত করা ঈমানের অংশ। কিন্তু ইবাদাত হারাম। চাই তাঁরা দুনিয়াতে জীবিত থাকুন, অথবা তাঁরা আখেরাতে চলে যান। না তাঁদের ইবাদাত করা যাবে, না তাঁদের কবরের ইবাদাত করা যাবে। তাঁদের জাতের সম্মান জীবিত অবস্থায় ওয়াজিব এবং ওফাত লাভের পরও ওয়াজিব।

এজন্যে মাযারে বেয়াদবিসহ যাওয়াও বেয়াদবি। আদবের সাথে যাওয়া উচিৎ। এমন ধারণা নিয়ে যাওয়া যে, হযরত এই মাযারে আছেন।

কবর যিয়ারতের আদবসমূহ

ইমাম আবু হানীফা রহ. মুসনাদে আবি হানীফা গ্রন্থে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, কবর যিয়ারতের আদবসমূহের মধ্যে কয়েকটি হলো এই যে, কিবলার দিকে পিঠ দাও এবং মৃত ব্যক্তির দিকে চেহারা ফেরাও। কারণ, সে তোমাকে দেখেন এবং তোমার কথা শোনেন। অতএব, যেহেতু এমন বিশদ বর্ণনা রয়েছে তাই আউলিয়া ও সালেহীনদের মাযারে বেয়াদবি ও গোস্তাখী কোনোভাবেই জায়েয নেই। আউলিয়াগণ তো অনেক বড় বিষয়, সালেহীনদের কবরের সাথেও বেয়াদবি জায়েয নেই।

এজন্যে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেন যে, কবরে হেলান দিয়ে বসা নিষেধ। কবরের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। কবরের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়ায় কবরওয়ালার বেইজ্জতি হয়।

অতএব, শরীয়ত বলেছে, মুমিনীন, সালেহীন এবং অলিদের এত পরিমাণ সম্মান করেছে যে, তাদের জীবদ্দশায় তাদের সামনে আদবের সাথে আস এবং তাদের মৃত্যুর পরও তাদের কবরের সাথে ইজ্জত সম্মানের ব্যবহার কর। তাহলে কে আছে যে, তাদের কবরের বেয়াদবিকে জায়েয রাখবে? কোন মুসলিম রয়েছে যে, কোন স্তরের আউলিয়াকে জীবিত ও মৃত্যু অবস্থায় বেয়াদবি জায়েয রাখবে?

উলামায়ে দেওবন্দ পৃথক মাকসাদে সফর করে যাওয়া জায়েয মনে করেন।

অবশ্য নজদের লোক, যারা নিজেদের ওয়াহহাবী বলে, তারা নিষেধ করে এবং বেয়াদবি মনে করে। তারা বলে, মসজিদে নববীর নিয়ত করে যাও। পবিত্র ও সম্মানিত মাযারের নিয়ত করে যেও না।

রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়তে সফর

উলামায়ে দেওবন্দ তাদের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, রাওজায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়া জরুরী। যে ব্যক্তি হজ্বে যাবে সে রওযা শরীফকে উদ্দেশ বানিয়ে মদীনাতুল মুনওয়ারায় উপস্থিত হবে। মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ উপস্থিত হওয়া তো পৃথক ইবাদত ও

আনুগত্য কর্ম। অতএব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের নিয়তে সফর করবে। হাদীসসমূহে এমন শিরোনামসমূহ বিদ্যমান-

من زار قبری وجبت له شفاعتی

যে আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।

অপর বর্ণনায় এসেছে যে-

من حج ولم یزرنی فقد جفانی

যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার যিয়ারতে এল না, সে আমার উপর জুলুম করল।

উলামায়ে দেওবন্দ তো শুধু কবর যিয়ারতের অনুমতি দেন না বরং তারা কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে যাওয়াও জায়েয বলে স্বীকৃতি দেন। তাহলে যে জামাত এতটুকু অগ্রগামী, তাদের ব্যাপারে একথা বলা যে, তারা কবর যিয়ারতে বাঁধা প্রদান করে নির্জলা মিথ্যাচার, অপবাদ ও বানোয়াট ছাড়া আর কী হতে পারে?

উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অহেতুক উত্তেজনা

সুতরাং আমি বলেছি, দেওবন্দি জামাত বেয়াদবিকে নাজায়েয বলেন এবং কবরে গিয়ে কবরকে সিজদা করা সাহেবে কবরের সাথে গোস্তাখী করা হয়। কারণ, যে কবরওয়ালা কোনো দিন কবরকে সিজদা করেননি, তাঁর কবরে আপনি যদি সিজদা করেন, তাহলে তার মনে কেমন ব্যাথা লাগবে! যে নবী ও পবিত্র পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন এই তালিম দিয়েছেন যে, গাইরুল্লার সামনে কখনো সিজদা করো না, সেই নবীর কবরে গিয়ে আপনি সিজদা করলেন; তাহলে মুকাররাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে কেমন খারাপ মনে হবে? তিনি এমন বান্দাকে কেমন ঘৃণা করবেন, যে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। এজন্যে বিদয়াত ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে নিষেধ করা হয়। আর লোকেরা একে আসল (কবর যিয়ারত) বস্তু নিষেধ করা মনে করে। আর তারা শুধু মানুষকে উত্তেজিত করার জন্যে করে থাকে। কারণ, তারা মানুষদের সেই মুনকারাত ও বিদয়াতে লিপ্ত রাখতে পছন্দ করে। যখন বিদয়াত থেকে নিষেধ করা হয়, তখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে বলে, দেওবন্দিরা কবর যিয়ারতে বাঁধা দেয়। তাঁরা

অলি আল্লাহদের কবর যিয়ারতকে নাজায়েয বলে। তাঁরা যা জায়েয বলেন, তা পৃথক আর যা নাজায়েয বলেন তা ভিন্ন। গোস্তাখী করা নাজায়েয। যিয়ারত করা ইবাদাত। কবর যিয়ারত করা দীনি মাকসাদ।

ইসালে সাওয়াব নিষেধের অভিযোগ

প্রশ্ন : তারা এ কথাও বলে যে, দেওবন্দিরা কবরে ফাতিহা পাঠ এবং দরুদ পড়া নিষেধ করেন। যদি ফাতিহা পাঠ নিষেধ করেন, তাহলে কবরে যাওয়ার প্রয়োজন কী? কবরে তো ফাতিহা পাঠের জন্যে যাওয়া যে, সেখানে ইসালে সাওয়াব করবে। আর এই ফাতিহা পাঠের শিরোনাম এটি একটি নতুন শিরোনাম। ইসালে সাওয়াবের জন্যে ফাতিহা পাঠ শব্দটি পরবর্তীতে মানুষরা যোগ করেছে। আসল শব্দ হল ইসালে সাওয়াব। এমনকি ইসালে সাওয়ার এর ব্যাপারে যে সমস্ত সূরার আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সূরা ফাতিহার উল্লেখই নেই। সূরা ইখলাস, যিলযাল ও কাফিরুনের আলোচনা আছে। সূরা ফাতিহার উল্লেখ নেই। আমার জানা নেই, ফাতিহা শব্দ কোথায় হতে ব্যবহার করে। শরীয়তের সহজ সোজা শব্দ হল 'ইসালে সাওয়াব'। সাওয়াব পৌঁছাও। এখন যার যে সূরা মুখস্থ আছে তা-ই পড়বে। সূরা ইখলাসের কথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, এটি ছোট্ট সূরা। একবার পাঠ করার দ্বারা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সাওয়াব লাভ হয়। যদি তিনবার পড়া হয়, তাহলে পূর্ণ এক খতমের সাওয়াব লাভ হবে। যেন পুরা কুরআনের সাওয়াব পৌঁছালেন এবং সূরা কাফিরুনের কথা বলা হয়েছে- এটি কুরআনের চতুর্থাংশ, একবার পড়লে কুরআনের চতুর্থাংশের সাওয়াব মিলবে। যদি কেউ চারবার পড়ে নেয়, তাহলে পুরা কুরআনের সাওয়াব মিলবে এবং তা পাঠিয়ে দেব।

সূরা যিলযাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার সাওয়াব অর্ধ কুরআন বরাবর। তাই যদি কেউ দুবাব পড়ে নেন, তাহলে পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব পাবে। অতএব, এ সমস্ত সূরাকে এজন্যে বিশেষিত করা হয়েছে যে, অল্প সময়ে অনেক সওয়াব মিলে যাবে। আর যে তার চেয়ে বেশি পড়বে, যেমন সূরা ইয়াসীন এ সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি পাঠ করার দ্বারা দশবার পুরা কুরআন খতম করার সাওয়াব মিলে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এ সূরা পড়ে নেন, তাহলে সোনায় সোহাগা। তিনি দশ খতমের সাওয়াব পৌঁছালেন। দীর্ঘ সূরা পাঠের সহজ পদ্ধতি হলো, যদি সময় স্বল্প হয় তাহলে

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য ঘর থেকে রওনা হওয়ার সময় তেলাওয়াত শুরু করবে। কবর পর্যন্ত পৌঁছতে- পৌঁছতে খতম হয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে সাওয়াব পৌঁছাবে। সুতরাং এ কটি সূরা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, এতে সময় কম লাগে এবং সাওয়াব বেশি হয়। অন্যথায় যে কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করে সাওয়াবরেসানী করবে। প্রতি হরফে দশ নেকীর ওয়াদা দিয়েছেন। যদি কেউ আলিফ লাম পাঠ করে সাওয়াব পৌঁছায়, তাহলে ত্রিশ নেকীর সাওয়াব পেয়ে যাবে। তাই যত মন চায় সাওয়াব পৌঁছান।

অতএব, একথা বলা যে তারা ফাতিহা থেকে বাঁধা দেন একেবারেই মিথ্যা, বানোয়াট ও অন্যদের উপর অহেতুক অপবাদ। আল্লাহ ভাল জানেন যে, এগুলো তারা কোথা থেকে গ্রহণ করেছে। এগুলো তো দেওবন্দি হযরতদের আমল নয় এবং আকিদাও নয়। অতএব, কোনো ব্যক্তির উপর বা কোনো জামাতের উপর তাদের আমল ও আকিদার বিপরীত অপবাদ লাগানো, বানোয়াট, মিথ্যারোপ করা সর্বসাধারণদের বিভক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণ আমার জানা নেই। তারা মনে করে, যদি উলামায়ে দেওবন্দ যদি ওখানে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের এ-ফয়দা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা দেওবন্দিরা তোমাদের ফায়দা লাভে প্রতিবন্ধক হব না। তোমরা লাভবান হতে থাক। কিন্তু মিথ্যাচার করার কী প্রয়োজন? মোটকথা, এহেন দাবি তাহা মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণা।

আম্বিয়া আ.দের কবরের জিন্দেগী

দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়েছিল– যে নবীদের ব্যাপারে বিশেষ করে সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নাউযুবিল্লাহ বলে থাকে যে, তিনি ওফাতের পর মাটির সাথে মিশে গেছেন? এমন প্রশ্ন একেবারে মিথ্যা এবং সাজানো অপবাদ। এমনটি নজদবাসীদের আকিদা। এমন আকিদা পোষণ করে শায়েখ আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীরা, যাদের ওয়াহহাবী বলা হয়। উলামায়ে দেওবন্দ এহেন আকিদা থেকে মুক্ত।

উলামায়ে দেওবন্দ বলেন, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তামাম আম্বিয়াদের মোবারক দেহকে মাটির উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। মাটি তাঁদের মোবারক দেহকে খেতে পারবে না।'

তাহলে এ কথা বলা যে, তাদের দেহ মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে গেছে,

একেবারেই মিথ্যা। আর এতে উলামায়ে দেওবন্দের উপর নয় বরং হাদীস শরীফকে মিথ্যারোপ করা হয়। হাদীস শরীফে যা বলা হয়েছে, সেই আকিদাই উলামায়ে দেওবন্দের। আর উলামায়ে দেওবন্দ শুধু এতটুকু বলেননি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারক কবরে একেবারে সহীহ ও সুস্থভাবে সংরক্ষিত আছে এবং থাকবে; বরং তাঁরা এমন আকিদাও পোষণ করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজও এমনভাবে স্বশরীরে জীবিত আছেন, যেমনিভাবে দুনিয়াতে ছিলেন। তাতে সামান্য পরিমাণও রদবদল হয়নি। শুধু এই নয় যে, বদন মোবারক সংরক্ষিত আছে বরং দেহ মোবারকে ওই হায়াত সংরক্ষিত রয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনে সংরক্ষিত ছিল। এমনিভাবে তিনি যিন্দা ও জীবিত।

আলামাতে হায়াত

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

نبی اللہ یرزق

আল্লাহর নবী জীবিত এবং তাদের রিযিক দেওয়া হয়।

তাদের আহারের জন্য রিযিক দেওয়া হয়। এখন তাদের রিযিক দেওয়া হবে আলমে বর্যখের অবস্থা অনুযায়ী। এমন হওয়া প্রয়োজন নেই যে, পোলাও, জর্দাকে এবং গমের রুটি দেওয়া হবে। তাদের রূহ যেমন পবিত্র এবং দেহ পবিত্র ও সূক্ষ্ম, সেজন্য সূক্ষ্ম খাবারই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। তা-ই পৌঁছে। এমনিভাবে হাদীসে পাকে এসেছে–

الانبیاء احیاء فی قبورھم یصلون

নবীগণ তাদের কবরে জীবিত থাকেন, তারা নামায পড়েন।

অতএব, হায়াতের জন্য দুটি বস্তু আলামাত হয়। একটি হলো– খাওয়া ও পান করা। এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপরটি হলো– নড়াচড়া। এটিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি সর্বোত্তম নড়াচড়া ইবাদাতে নড়াচড়া প্রমাণিত।

মোটকথা, হায়াতে নবী আজও প্রমাণিত। তবে আলামত ও কর্ম বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যে তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য যেতেন, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি একেবারে এমন যে, যেমন একটি প্রজ্বলিত বাতি বা জ্বালানো ল্যাম্প আপনি সেটিকে একটি হাঁড়িতে বন্ধ করে দিলেন। এতে তার আলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আসবে না। কিন্তু এর কিরণ পথিবী হতে হারিয়ে গেছে। সে যে আলো ছড়াচ্ছিল, তা একটি হাঁড়িতে আবদ্ধ হয়ে গেল।

তেমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর মোবারকে চলে গেছেন, তার হায়াত, আলো ও ফয়েযের ঐ ধরন রয়ে গেছে, যা পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু তাকে কবরজগতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমরা এ কথা বলি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে আসবেন না। কিন্তু তার রুহানি ফয়েজ জারি আছে। আর তা এভাবে যে, আমাদের ঈমান তাঁর ফয়েযের কারণেই টিকে আছে। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াজ্জুহ না থাকে, তাহলে ঈমান বাকি থাকবে না। আসল ও প্রকৃত মুমিন হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতপূর্ণ সত্তা। তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষ মুমিন। তার ঈমানের ছায়া পড়ার কারণে আমাদেরকে মুমিন বলা হয়। অন্যথায় প্রকৃত মুমিন তিনই। তার ঈমানি ফয়েজ সর্বদাই জারি আছে।

মোটকথা, এ কথা বলা যে, আম্বিয়া আ. মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে গেছেন নাউযুবিল্লাহ। এটি নজদবাসীদের আকিদা, আমাদের নয়। আমাদের জোর করে অহেতুক ওয়াহহাবী ও নজদী বানানো হয়েছে। এটি শুধু ইংরেজদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা। আর তা এজন্য যে, আমরা যেহেতু বিদয়াতকে রদ করি, তাই তার উত্তরে আমাদের নাজদী ও ওয়াহহাবীদের সাথে জুড়ে দেয়। অথচ কোথায় নাজদী ও ওয়াহাবী আর কোথায় দেওবন্দি?

সারকথা, নাজদীদের আকিদা হলো, তিনি মাটির সাথে মিশে গেছেন। আমরা তা রদ করি যে, এটি ভ্রান্ত আকিদা। আম্বিয়া আ. এমনভাবে জীবিত, যেমনিভাবে দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন।

হায়াতের দলির-প্রমাণ

এ-ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ. লিখেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ দুনিয়াতে নেই। কিন্তু তার উত্তরাধিকারী সম্পদ বণ্টন হয়নি–

نحن معاشر الانبياء لا نورث

আমরা নবীদের দলের মিরাস বণ্টন হয় না।

আম্বিয়া আ. এমন জামাত যে, আমরা রেখে যাওয়া সম্পদে কাউকে ওয়ারেস বানাই না। কারণ, মৃত ব্যক্তির মিরাছ বণ্টন হয়। জীবিতদের মিরাস বণ্টন হতে পারে? যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে জীবিত, তিনি দুনিয়ায় থাকতে যেভাবে মালিক ছিলেন, আজও মালিক আছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের সাথে কারো বিবাহ জায়েয নেই। কারণ, তিনি জীবিত। কোনো জীবিত পুরুষের স্ত্রীকে কী কেউ বিবাহ করতে পারে? বিবাহ করা হয় বিধবাদের– স্বামী জীবিতদের নয়।

মোদ্দাকথা, যেহেতু তিনি জীবিত; তাই তার মালে অংশীদার হবে না। এগুলো হলো দলিল, যা তিনি হায়াতে আম্বিয়া আ.-এর বিষয়ে পেশ করেছেন। অতএব, যারা এমন দলিলের প্রবক্তা, তাদের দিকে সম্বোধন করে এ কথা বলা যে, এদের এহেন আকিদা যে নবীগণ কবরে মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে গেছে, তাহলে এমনটি অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার হবে। এমন আকিদা কাদের আর সম্পৃক্ত করা হচ্ছে কাদের সাথে।

অতএব, যারা এতটুকু যাচাই-বাছাই ছাড়া কথা বলে, তাদের একথা জানা নেই যে, এ-আকিদা কাদের আর কাদের প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে। তারা কি স্টেজে বসে এভাবেই মুসলিম জাতিকে তরবিয়াত করবে?

হ্যাঁ, এভাবে বলতে পার যে, অমুকের আকিদা এবং অমুকের আকিদা নয়। সবার উপর একই লাঠি মেরে দেওয়া তো সরাসরি মিথ্যা এবং সাজানো অপবাদ। অতএব এমন প্রশ্ন করা একেবারেই বেমানান। উলামায়ে দেওবন্দ এহেন আকিদা থেকে মুক্ত।

নযর-নিয়ায বা ইসালে সাওয়াব

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য সালেহীনগণ যারা ইহজগত ত্যাগ করেছেন, তাদের নামে নযর-নিয়ায এবং ইসালে সাওয়াব করতে নিষেধ করেন।

এখানেও একই কথা। ইসালে সাওয়াব তো আমরা নিজেরাও করি। অর্থাৎ এ কথা বলা যে, আমরা ইসালে সাওয়াব থেকে বাধা প্রদান করি, এগুলো সাজানো মিথ্যাচার। আমরা চিশতিয়া তরিকার লোক, আর চিশতিয়া

সিলসিলার লোক এ কথার প্রবক্তা যে, যখন সকাল ও সন্ধ্যায় বসে নিজেদের প্রতিদিনের মামুলাত পুরা করতে চাই, যিকির হোক বা কোনো পেশা হোক অথবা নাফী ও ইসবাতের আমল হোক সর্বাবস্থায় আমাদের আকাবির ও বুযুর্গদের আদেশ এমন যে, এগুলোর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সিলসিলার সকল বুযুর্গদের প্রতি সাওয়াবরেসানি কর। তারপর দোয়া কর যে, হে আল্লাহ! তাদের উসিলায় আমাদের অন্তরেও নূর পয়দা করে দাও। অতএব, যাদের সকাল-সন্ধ্যার দৈনন্দিন মামুল এমন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সাওয়াব পৌঁছান এবং সমস্ত আউলিয়াদেরও সওয়াব পৌঁছান। তাদের ব্যাপারে একথা বলা যে, তারা ইসালে সাওয়াব থেকে নিষেধ করেন এটি একটি নির্ভেজাল মিথ্যা এবং অহেতুক অপবাদ আরোপ ছাড়া ভিন্ন নয়।

সারকথা হলো, তাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য যেখানেই সুযোগ হয়, সেখানেই এহেন মিথ্যাচার বলে দেওয়া হয়। এমনটি একেবারেই ভিত্তিহীন ব্যাপার। মোটকথা, আমরা শুধু ইসালে সাওয়াব স্বীকারই করি না; বরং এ আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডেরও অন্তর্ভুক্ত। যেমন দৈনন্দিন তাসবীহ ও তাহলীলের আমল হয়, তেমনি ইসালে সাওয়াবেরও আমল হয়। স্বয়ং আমরাও একথার উপদেশ করি যে, নিজেদের মামুলাত শুরু করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তামাম সিলসিলাকে সাওয়াব পৌঁছাও।

এখন রয়ে গেল নযর-নিয়াযের আলোচনা। সুতরাং নযর ও নিয়ায অর্থ যদি এমন হয় যে, ভাই! মাল দিয়ে দাও সাওয়াব পৌঁছাও, তাহলে এতে কোনো বাধা নেই, অসুবিধা নেই। এমনটি জায়েয। আপনি চারজন ফকিরকে আহার করালেন এবং এমন নিয়ত করলেন যে, এর সাওয়াব অমুক অমুক বুযুর্গের জন্য। হানাফীগণ একথার প্রবক্তা যে, তা পৌঁছবে। তেমনি উলামায়ে দেওবন্দও এমন কথার প্রবক্তা।

আর শুধু মুখেই বলেন এমন নয়; বরং আমলও করেন। প্রায় বছরই এক-দুবার এমন হয় যে, ছাগল ইত্যাদি জবেহ করে খাবার পাকান এবং গরিব-মিসকীনদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বণ্টন করে দেন। আর যারা সম্পদশালী, তারা বড় বড় প্রাণী জবেহ করে অনেক মানুষকে দাওয়াত করেন। আর যারা দুর্বল তারা দু-চার পয়সা হলেও সদকা করেন। যাহোক, যদি নযর ও নিয়াযের অর্থ এমন হয় যে, মালি ইবাদতের সাওয়াব পৌঁছাও।

এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা এমন কাজকে শরয়ীভাবে জায়েয মনে করি এবং এমনটি আমাদের মামুল।

মুশরিকসুলভ নযর-নিয়ায

নযর ও নিয়াযের আরেক অর্থ হলো ভেঁট চড়ানো বা উপহার দেওয়া, মান্নত করা যে, কোনো বকরি নিয়ে কবরে বেঁধে রাখা অথবা কোনো বুযুর্গ ও ফকীরের নামে ছেড়ে দেওয়া। এহেন কাজকে আমরা শিরক মনে করি। কারণ, এ ধরনের নযর -নিয়ায শুধু আল্লাহর নামে হতে পারে। শুধু আল্লাহর নামে জানোয়ার ছাড়া যেতে পারে। যেমনটি আপনারা হজে গেলে হাদী নিয়ে যান অথবা হাদী ছেড়ে দেন। অর্থাৎ উট আল্লাহর নামে ছেড়ে দেওয়া জায়েয, গাইরুল্লাহর নামে ছেড়ে দেওয়া জাযেয নেই। মক্কার মুশরিকদের এমন নিয়ম ছিল যে, তারা বিভিন্ন প্রকার জানোয়ার তাদের বুযুর্গ ও মূর্তিদের নামে ছেড়ে দিত। একটিকে সায়েবা, একটিকে ওয়াসীলা এবং আরেকটিকে হাম বলা হতো। সেগুলোর বিভিন্ন রূপ হতো। উদাহরণস্বরূপ, যে উটনি দশবার বাচ্চা প্রসব করেছে, সেটি যখন বাচ্চা দিবে, তখন একে কোনো দেবতার নামে, মূর্তির নামে ছেড়ে দেবে। যে উটনি প্রথমবার গর্ভবতী হয়েছে, সেটিকে একটি মূর্তি নামে ছেড়ে দেবে। সেটিকে কোনো একটা নাম রেখে দেবে। তার গলায় মালা পরানো হতো এবং বিশ্বাস এমন রাখত যে, একে অমুক মূর্তির জন্য, ওটি অমুক মূর্তির জন্য।

কুরআনুল কারীম এমন আকিদাকে রদ করেছে, বাধা দিয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَحِيۡرَةٍ وَّ لَا سَآئِبَةٍ وَّ لَا وَصِيۡلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ وَّ لٰكِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ

আল্লাহ বহিরা, সায়েবা, ওসীলা এবং হামীকে শরীয়ত সিদ্ধ করেননি যে সেই মূর্তিগুলোকে নযর ও নিয়ায করবে। আর যারা কাফির তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, মূর্তির নামে হাদিয়া পেশ করে। আর বলে বেড়ায় যে আল্লাহ আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, এটি মিথ্যা অপবাদ, আমি এর আদেশ করিনি। তাদের অধিকাংশের বিবেক বুদ্ধি নেই। *[সূরা মায়েদা : ১০৩]*

মোটকথা, নযর ও নিয়ায অর্থ যদি মালি ইবাদাত হয় যে, খানা পাক করে গরিবদের আহার করাও এবং সাওয়াবরেসানী কর, তাহলে তা জায়েয। যদি কাপড় দেওয়া হয়, তাহলে সাওয়াবের নিয়ত করে দাও; তাও জায়েয। কুরআন তেলাওয়াত করে সাওয়াব পৌঁছাও; তাও জায়েয। সারকথা, দৈহিক ইবাদত হোক বা সম্পদের ইবাদত হোক, উভয়েরই সওয়াব পৌঁছে। যদি মালি ইবাদাত আপনারা নযর ও নিয়ায মনে করেন, তাহলে উলামায়ে দেওবন্দ এটি অস্বীকার করবেন না। আর নযরের অর্থ ভেঁট দেওয়া, কারো নামে, চাই তিনি যত বড় ওলী হোক বা নবী হোক, সেটি কুরআনুল কারীম নিষেধ করে। একে উলামায়ে দেওবন্দও নিষেধ করেন। অতএব সাধারণভাবে একথা বলে দেওয়া যে, তারা নযর ও নিয়ায থেকে বাঁধা দেন। এমনটি ভ্রান্ত কথা। একটি বিশেষ নযর রয়েছে, যাতে শিরক হয় সেটিকে নিষেধ করেন। সাধারণভাবে মালি ইবাদাতের সাওয়াব পৌঁছানোকে কেউ নিষেধ করবে না। এটি জায়েয। তাদের এমন আমল জারিও আছে।

যাবিহা নির্দিষ্টকরণ

এমনিভাবে কোনো বুযুর্গের নামে যবাই করা তা জায়েয নেই। স্রেফ আল্লাহর নামে যবাই করা হবে। যখনই আপনি যবাই করবেন, তখন এভাবে বলবেন–

بسم الله وعلى ملة رسول الله

অথবা যখন কুরবানী করবেন, তখন আল্লাহর নাম নিবেন। অতএব যবাই শুধু আল্লাহর নামে হবে। কিন্তু যাকে সাওয়াব পাঠানোর নিয়তে যাবাই করবেন, তার নামও নিতে পারবেন যে, হে আল্লাহ আমি এই জানোয়ার যাবাই করছি যাতে এর সাওয়াব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছে অথবা অমুক বুযুর্গের নিকট পৌঁছে।

সুতরাং একে তো সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য নাম নির্দিষ্ট করা যে, অমুক বুযুর্গকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য নাম নির্দিষ্ট করছি, এমনটি জায়েয। আর আরেকটি হলো কারো নামে যবেহ করা এটিই ইবাদত। অতএব, যবেহ শুধু আল্লাহর নামে হবে। আর সাওয়াবের জন্য কোনো একজনকে বা দুজন বা যত বেশি হতে পারে নির্দিষ্ট করে নিন, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তেমনি নযর ও মান্নতের অর্থ যদি এই হয় যে, কারো সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট করেন যে, অমুক বুযুর্গকে ইসালে সাওয়াবের জন্য খানা তৈরি করছি। এতে কোনো ক্ষতি নেই, একজন নির্দিষ্ট করেন, দুজন করেন বা যতো

পারেন। সমস্ত আউলিয়া কেরামের নাম নেন কোন অসুবিধা নেই। অমুকের নামে যবেহ করছি এবং তাতে সাওয়াবের কোনো উল্লেখ নেই। কোনো নামের উপর যবেহ করলে তা শুধু আল্লাহর নামেই হবে। তেমনিভাবে কারো নামে কোনো জানোয়ার ছেড়ে দেওয়া হলে তা আল্লাহর নামেই ছাড়তে হবে। কোনো বুযুর্গের নামে ছাড়া যাবে না।

যাহোক, আমি বলছি যে, যদি নযর ও নিয়াযের অর্থ হয় ইসালে সাওয়াব বা নির্দিষ্ট কারো নামে যবেহ করা যে অমুক বুযুর্গকে সাওয়াব পৌছানোর এই বকরিটি যবেহ করছি এতে কোন অসুবিধা নেই। এ অর্থ হিসেবে আমরাও এ কাজের প্রবক্তা আর যদি নযর ও নিয়াযের অর্থ এমন যে, সাওয়াবের কোনো উল্লেখ নেই এবং বলে, 'অমুক বুযুর্গের নামে একে ছেড়ে দিচ্ছি' এমনটি জায়েয নেই। এটি হুবহু এমন, যেমন মক্কার মুশরিকরা মূর্তির নামে ছেড়ে দিত। কুরআন একে নিষেধ করেছে।

হাদিয়া, যিয়াফত বা ইসালে সাওয়াবের সদকা

ইসালে সাওয়াবের জন্য কোনো কিছু পাকানো হলে তা গরিবদের হক, ধনীদের হক নয় যে, তারাও খাবে। কারণ, তা সদকা। আপনি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব একত্রিত করলেন এবং তাদের খাওয়ালেন এটি প্রথা পলন হলো, এটি সদকা হলো না। এটি নাম করার দাওয়াত অনুষ্ঠান হলো। সদকা বলা হয়, যা ফকির-মিসকীনদের খাওয়ানো হয় সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। যদি ধনীদের খাওয়ানো হয়, তাহলে এতে সাওয়াব হবে না।

হ্যাঁ, এমনভাবে সাওয়াব হতে পারে যে, আপনি হাদিয়ার নিয়ত করবেন যে, আমি আনন্দ উৎসবের জন্য দাওয়াত করছি। তাতে ইসালে সাওয়াবের কোনো উল্লেখ থাকবে না। মোটকথা, এতে তো আপনি ভাই ও বন্ধুদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাহলে তা তাদের যিয়াফত হবে এবং হাদিয়া হবে, যা আপনি তাদেরকে পেশ করছেন। এতে ইসালে সাওয়াবের নিয়ত হয় না। আর আরেকটি হলো, ইসালে সাওয়াবের জন্য সদকা করা। একে হাদিয়া বলে না। অতএব, সদকার জন্য গরিব হওয়া শর্ত। যদি আপনি ধনীদের এবং সম্পদশালীদের ডেকে আহার করানো, তাহলে তারা খানাও খাবে এবং সাওয়াবও খাবে। এ-সাওয়াব আর কারো জন্য পৌঁছবে না।

ইসালে সাওয়াবের জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্টকরণ

প্রশ্ন–৫ : এমনিভাবে কোনো প্রিয়জন, আত্মীয় ও মৃত ব্যক্তির জন্য যদি তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন বা চল্লিশতম দিনে খাবার পাকিয়ে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করে এবং তাতে ফাতিহা পাঠ করে এবং আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করে খাওয়ানো হয়, একেও উলামায়ে দেওবন্দ নিষেধ করেন।

উত্তর : এতটুকু তো জানতে পারলেন যে, উলামায়ে দেওবন্দ ইসালে সাওয়াব থেকে বাধা দেন না। কারণ, শরয়ত যাকে অনুমতি দিয়েছে, তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। এখন এতে নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তারোপ করা যে, তৃতীয় দিন, ৪র্থ দিনে করব। যদি তা ঘটনাক্রমে হয়ে যায়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই, ক্ষতি নেই। ঘটনাক্রমে আপনার মন থেকে বের হয়ে গেছে যে, মৃত ব্যক্তির ইসালে সাওয়াব করব আর সেটি তৃতীয় দিন ছিল, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে ১০ম বা ৪০তম দিন ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি এই মনে করেন যে, যখন চল্লিশতম দিন আসবে তখন করব, অন্যথায় করব না। তাহলে এমনটি ভুল যে, এতে আকিদার মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

এখানে আকিদার মধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে যে, চল্লিশতম দিন করব, ঊনচল্লিশতম দিনে করব। সুতরাং শরীয়ত যে জিনিসকে আম ও শর্তহীন করেছে, সেটিকে নির্দিষ্ট করা, শর্তারোপ করা উম্মতের অধিকার নেই। এ শুধু নবীদের অধিকার। যে জিনিসকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস ও নির্দিষ্ট করবেন, সেটিকে আম করার উম্মতের অধিকার নেই।

যেমন– রমযানের জন্য শরীয়ত ত্রিশ রোযা নির্দিষ্ট করেছে। উম্মতের অধিকার নেই যে, তারা শাবান মাসেও রোযা রাখবে যে, আমরা একে রমযান মনে করি। নিজেদের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করা, বিশেষিত করা জায়েয নেই। তেমনিভাবে শরীয়ত নামাযের জন্য পাঁচটি ওয়াক্ত নির্ধারিত করেছে। এ ব্যাপারে বান্দা বাধ্য যে, সেই সময়ের মধ্যে নামায আদায় করবে। কারো এই অধিকার নেই যে, বলবে, আমি আজ যোহরের নামায ঈশার পর আদায় করব অথবা আসরের পর পড়ে নেব এবং বলবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্যই এতে অসুবিধা আছে। যে আল্লাহ নিজেই নামাযের সময় নির্দিষ্ট করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

আল্লাহ পাক নামায ওয়াক্তের শর্তের সাথে ফরজ করেছেন। *[সূরা নিসা : আয়াত ১০৩]*

কেউ করতে চাইলে তা আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করা হবে। সুতরাং যেখানে শরীয়ত শর্ত যুক্ত করেছে, সেটি রদ করার কারো অধিকার নেই। আর যেখানে শরীয়ত শর্তযুক্ত করেনি, ওখানে কেউ শর্তযুক্ত করতে পারবে না। অতএব সাধারণ রাখা বা শর্তযুক্ত করা উভয়টিই শরীয়তপ্রণেতার কাজ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাজ। অন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

দাওয়াম ও ইলতিযামের পার্থক্য

তারপর এর মাঝে আরেকটি পার্থক্য এই যে, একে তো সময় নির্দিষ্ট করা নিজের সহজতার জন্য। উদাহরণস্বরূপ আমার নিকট অমুক মাসের অমুক দিনে আমদানি বেশি হয়, ওই দিন অবস্থা অনুযায়ী করতে পারি, অন্যথায় মুশকিল হবে। যদি এমনটি করে এবং অন্যদের ভর্ৎসনা না করে, তাহলে বোঝা যাবে যে সকল দিনকে বরাবর মনে করে। তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই, বাধা নেই। যেমন– আপনারা ব্যবসায়ী মানুষ, আপনাদের কোন মাসে ব্যবসায়ী সিজন রয়েছে, সেই মাসে আমদানি বেশি হয় এবং বিক্রি বেশি হয়। আপনি নিয়ত করলেন, সেই মাসে গরিবদের খানা খাওয়াবেন। অতএব এটি একটি আমল, এটিকে আপনি ঘটনাক্রমের অবস্থার ভিত্তিতে দায়েমী করালেন। আপনার আকিদা এমন নয় যে, ওই দিন ইসালে সাওয়াব করলে পৌঁছবে অন্যথায় পৌঁছবে না। এ কারণে কেউ যদি শাবান মাসে করে, তাও বলেন, সে ঠিক করেছে, কেউ যদি ঘটনাক্রমে শাওয়াল মাসে করে, তাও আইন বলে, সে ঠিক করেছে। আপনি নিজে যে মাসে দায়েমী করেছেন, তার বিপরীতকে জায়েয মনে করেন, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

যাহোক এমন মনে করা যে, এ-মাসে করলে হবে অন্য মাসে করলে হবে না এমন করা আকিদা আর আকিদা বানানো জায়েয নেই। যতক্ষণ না আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকিদা বানাবেন। মোটকথা, একটি হলো দাওয়াম আর আকেরটি হলো ইলতিযাম। উভয়ের মাঝে এই পাথ্যক্য। একে তো মানুষ কোনো মাসের সাথে শর্তযুক্ত করে এবং এমন আকিদা বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইসালে সাওয়াব এই মাসেই হতে পারে, এই মাস চলে গেলে হতে পারে না। তাহলে তা জায়েয নেই। কারণ, এটি

আকিদা। আরেকটি হলো ইলতিযাম বা বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। দায়েমী নয় যে, আমার উপকার্থে এ মাসে খাওয়াতে পারি আর সারা জীবন এমনটি চলে আসছে। কিন্তু আকিদা এমন যে, এ মাসেও জায়েয, অন্য মাসেও জায়েয। তাহলে এটি ব্যক্তিগত সুবিধার কারণে হবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা

এখানে এ-বিষয়টি লক্ষণীয় যে, যদি পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি থাকে, যারা ওই নির্দিষ্ট মাসকে অথবা সময়কে অপরিহার্য মনে করে আর আপনি মনে করেন না। কিন্তু যদি আমল করেন, তাহলে আপনার উপর এহেন অপবাদ আসবে যে, তিনিই ওই আকিদার লোক। এমতাবস্থায় সাদৃশ্যের কারণে পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু যদি সবাই এমন হয় যে, সব মাসেই জায়েয মনে করে; কিন্তু নিজেদের সুবিধার কারণে প্রত্যেকে আলাদা মাস নির্ধারণ করেছে, এতে কোনো বাধা নেই। কারণ, আকিদা বানানো ব্যতীত নিজেদের উপর বাধ্য করে নেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু কিছু উপকারের কারণে পরিহার করবে, ছেড়ে দিবে। যদি কোনো সম্প্রদায় নির্দিষ্ট দিনকে জরুরি মনে করে আর আপনারা জরুরি মনে করেন না; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাই করছেন। তাহলে বলা হবে, এদেরও সেই আকিদা রয়েছে, তাই মানুষ এ থেকে হুজ্জত ও দলিল গ্রহণ করবে। অতএব এমতাবস্থায় নিষেধ করতে হবে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা বিশেষ উপকার্থে হবে, হারাম বা নাজায়েয হিসেবে নয়।

যাহোক, এ আলোচনা থেকে আপনি অনুভব করতে পেরেছেন যে, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন বা মৃত ব্যক্তির ২য় দিন, ১০ম দিন বা ৪০তম দিন খানা পাকিয়ে ফাতিহা পাঠ করে বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো থেকে উলামায়ে দেওবন্দ যে নিষেধ করেন এ থেকে আপনি নিজেই পার্থক্য করে নেন কেন নিষেধ করেন। বিষয়টি অস্পষ্ট রাখবেন না। এখন পর্যন্ত আমি ৩য় দিন, ১০ম দিন এবং ৪০ তম দিন নিষেধ করার ব্যাপারে কথা বলেছি যে, এগুলোকে আকিদা বানিয়ে করা তো ঠিক নয়, কিন্তু কোনো প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করলে কোনো অসুবিধা নেই।

চেহলাম-বার্ষিকী হিন্দুয়ানা প্রথা

একথা সুস্পষ্ট যে, যদি আপনাদের উপর ফরজ ও আবশ্যক করা হয় তৃতীয় দিন এবং মুহাররম মাসের সহজতা, তাহলে এমনটি কি জরুরি যে, যাদের প্রিয়জন মরবে তারা মহাররম মাসে মরবে। ঘটনাক্রমে সে যদি শাবান মাসে ইন্তিকাল করে, তাহলে সেটি কোন দিন হবে, যেদিন আপনার সহজ হবে। ব্যবসার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে।

অতএব ৩য়, ১০ম এবং ৪০তম এমনকি চেহলাম ইত্যাদির কোনো শর্ত শরীয়তে নেই। না নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, না সাহাবীদের থেকে, না তাবেঈদের থেকে, না আইম্মায়ে মুজতাহিদের থেকে প্রমাণিত। এটি একটি ভিত্তিহীন বিষয়। বরং যদি প্রমাণিত থাকে, তাহলে তা হিন্দুদের থেকে প্রমাণিত। তাদের মধ্যে তিনদিনা আছে, চতুর্থদিনা এবং চল্লিশাও আছে। বার্ষিকীও আছে। আমি মনে করি, এগুলো প্রথামাত্র, তা হিন্দুদের থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপমহাদেশের মুসলমানদের রসম পালনের কারণ

ভারতবর্ষের মুসলিমদের রসম (প্রথা) পালনের ভিত্তি হলো হিন্দুবাদ। তেমনি আরো অনেক রসম এভাবে এসেছে। মোটকথা, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর ভিত্তি হলো এই যে, হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সুফিয়ায়ে কেরামদের বদৌলতে। তাদের উছিলায় হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকরা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে। স্বয়ং হযরত খাজা আজমিরী রহ.-এর হাতে নিরাব্বই লাখ হিন্দু মুসলমান হয়েছে এবং তার খলিফাদের হাতে যারা মুসলমান হয়েছে এ সংখ্যা তার বাহিরে। এভাবে আরো হাজার হাজার সুফী ছিলেন। তাদের দীনদারী, আমানতদারী, সততা, নিষ্ঠা ও বুযুর্গি দেখে-দেখে নিজ উদ্যোগে লক্ষ্য ও কোটি সংখ্যক মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তাদের তালিমের ব্যবস্থা পুরোপুরি ছিল না। শাসকবর্গও সেদিকে মনোযোগী হয়নি এবং সাধারণ মুসলমানরাও খেয়াল করেনি। ফলে ইসলাম তো গ্রহণ করেছে; কিন্তু শরীয়তের মাসায়েলের ইলম অর্জন হয়নি।

অতএব যে সমস্ত রসম তারা ইসলামের নামে করছে, উদাহরণস্বরূপ হিন্দুরা দেওয়ালী উৎসবের জন্য ছড়ি তথা পতাকা তৈরি করে থাকে। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও তাদের বুযুর্গদের জন্য ঝাণ্ডা বের করা শুরু

করে। হিন্দুরা দেবতাকে ভোগ উপহার দেয়, মুসলমানরা মাযারে গিয়ে মিষ্টি দেয়। ওরা দেবতার নামে কাজ করে, মুসলমানরা বুযুর্গের নামে করে।

অতএব ইসলামের এডিশন বানানো হয়েছে। অথচ হাকিকত তা যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। মোটকথা, এগুলোর ভিত্তি এটিও যে, তারা নিজ আগ্রহে ইসলামে প্রবেশ করেছে; কিন্তু তাদের তালিম-তরবিয়ত হয়নি। তাই মহিলা ও পুরুষরা মিলে যে সকল রসম তাদের ঘরে ছিল সেগুলোকে নিজেদের পক্ষ থেকে অথবা কারো বলার দ্বারা নকশা ও খোলস পাল্টে ইসলাম বানিয়ে ফেলে। এখনকার সকল রসম এভাবে চলে আসছে। এখন কোনো আলেম সেগুলোকে নাজায়েয ও হারাম বললে সবাই ক্ষেপে যায় যে, আমাদের বাপ-দাদার যুগ থেকে এগুলো করে আসছি।

তারপর তাকে অপবাদ ও দোষারোপ করে যে, সে কাফের, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। অথচ তিনি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে বলছেন যে, এগুলো দীন নয়। আসল দীন হলো, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবারা পেশ করেছেন। ইসলামের মেজাজ এমন আর এ রসম ইত্যাদি হলো শিরকী মেজাজ। কিন্তু মানুষ তা শোনে না, মানে না। বরং সেই রসমের উপর অটল থাকে।

হিন্দু-মুসলিম সংমিশ্রণের প্রভাব

অধিকাংশ রসম হিন্দুদের থেকে এসেছে এবং সারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে এর প্রভাব পড়েছে। এভাবে তারাও আপনাদের কিছু বস্তু গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একত্ববাদ এসেছে। তাদের মধ্যে ভিন্ন একটি ফিরকা (আর্য সম্প্রদায়) সৃষ্টি হয়ে যায়, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বাঁধা দিত। আর মুসলমানদের মাঝে শিরক ও মূর্তিপূজা ইসলাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা মনে মনে ভাবছে, তা ইসলাম; কিন্তু বাস্তবে তা শিরক হয়ে যায়। অতএব এগুলো ওদের থেকে এসেছে। অন্যথায় সাহাবাদের যুগে কোথাও এগুলোর অস্তিত্ব নেই যে, তাদের মাঝে দশমী ছিল, চল্লিশা ছিল। তেমনিভাবে তাবেঈদের যুগেও উল্লেখ নেই। ইমামদের যুগেও কোথাও উল্লেখ নেই। তেমনিভাবে ফিকহী মাসয়ালার মধ্যেও নেই। অবশ্য ফিকহী মাসয়ালার মধ্যে এগুলোর রদ রয়েছে যে, এটি ভুল, ওটি ভুল ইত্যাদি।

দীন ও রেওয়াজের পার্থক্য

সুতরাং এগুলো রেওয়াজ হিসেবে চলে আসছে। রেওয়াজ বা প্রচলিত রীতিনীতির নাম দীন নয়। দীন তো রেওয়াজকে ধ্বংস করার জন্য আসে, যাতে খোদায়ী রেওয়াজ কায়েম হয়, খোদায়ী কানুন কায়েম হয়। এজন্য যখনই কোনো আমল করা হবে, তখন সাথে-সাথে দেখে নেবে কিতাবুল্লাহর মধ্যে আছে কিনা? সুন্নাতে রাসূলের মধ্যে আছে কিনা? সুন্নাতে সাহাবার মধ্যে আছে কিনা? যদি জানা যায়, তাহলে মাথা পেতে মেনে নেবে। আর যদি না বের হয়, না জানা যায়, তাহলে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। আর যদি না থাকে কিন্তু অন্যদের মাঝে আছে এবং আমল করে, তাহলে তাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হবে। তাই একে পরিপূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। অন্যথায় মুসলিম জাতির মেজাজ বদলে দেবে। মুসলিমদের একত্ববাদের মেজাজ পাল্টে দেবে। ইসলাম তো তাদের মেজাজকে তাওহীদি মেজাজ বানিয়েছে।

মোটকথা, আমি আপনাদের সামনে দুটি কথা পেশ করছি।

প্রথমটি এই যে, শরীয়ত যে বিষয়কে স্বাভাবিক ও শর্তহীন রেখেছে, সেগুলোর মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তযুক্ত করা ঠিক নয়, অহেতুক শর্তযুক্ত করার আপনি কে? কিন্তু আপনার নিজস্ব সুবিধার জন্য কোনো দিন নির্ধারিত করে নিলেন যে, আমার জন্য অমুক দিন সহজ হয় এবং আপনি সেই দিনের ব্যাপারে অপরকে তাবলীগ করলেন না। আপনি সহজ মনে করছেন; তাই ঠিক করে নিলেন। কিন্তু এমনটি জায়েয মনে করেন যে, যদি কেউ এর বিপরীত করে এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি এমন হয় যে, কোনো জাতি নির্দিষ্ট দিনে ইসালে সাওয়াব আবশ্যক মনে করে, তাহলে আপনাকে সর্তকতামূলক বিরত থাকতে হবে। সেই সময় আপনার উক্ত কর্ম অপবাদের বিষয় হবে। সেজন্য আপনাকে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

আর এ থেকে বেঁচে থাকা কোনো কষ্টকর বিষয় নয়। আর পরিহার করার কারণে মানুষ যখন বাধা দেয় যে, ওইদিন তো সাওয়াব পৌঁছে অন্যদিন পৌঁছে না। আপনি বলতে পারবেন, যখন সাওয়াব এখন পৌঁছতে পারে তো সেই সাওয়াব চার দিন পরেও পৌঁছতে পারে। অতএব, কি দরকার অহেতুক নিজের উপর মসিবত টেনে আনা এবং নিজের উপর অপবাদের বোঝা ডেকে আনা।

দ্বিতীয় কথা হলো, ফাতিহা পাঠের অর্থ যদি ইসালে সাওয়াব হয়, তাহলে

এতে কোনো অসুবিধা নেই বরং করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে যে, মৃত্যুর পর মানুষ এমন হয় যেমন ডুবন্ত মানুষ সামান্য খড়কুটার সাহায্যকে গনীমত মনে করে। সে আশার নজরে তাকিয়ে যে, আমার কোনো প্রিয়ভাজন, আত্মীয়-স্বজন সাওয়াব পাঠায় কিনা? অতএব, আপনাকে ওই আশা পূরণ করা উচিত। তাদের জন্য সাওয়াবরেসানি করা উচিত।

ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক নিয়তের উপর

ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক কাল্‌ব তথা নিয়তের সাথে। যদি নিয়ত করেন তাহলে সাওয়াব পৌঁছে যাবে। আর যদি সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কিছু শর্তারোপ করেন যে, এমন এমন খাবার হতে হবে এবং এই এই পাঠ করতেগ হবে, কিছু সুহাগিনি (যাদের বিবাহ হয়েছে) একত্রিত হলো, যাদের এখন পর্যন্ত সন্তান হয়নি তারা একেক জন একটি করে অথবা সাতটি করে চাউল হাতে নিলো ইত্যাদি এগুলো শুধুই কুপ্রথা। শরীয়তে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। মোটকথা, ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক অন্তরের নিয়তের সাথে। আপনি নিয়ত করেছেন খাবার পাকিয়ে বণ্টন করে দিয়েছেন, ফকিরদেরও বললেন কেন খাওয়াচ্ছেন?

সুতরাং শুধু অন্তরে নিয়ত রয়েছে সাওয়াব রেসানীর; তাহলে পৌঁছে যাবে। এ সমস্ত শর্ত লাগানো যে, যতক্ষণ মসজিদের মোল্লাজী না আসবে, সাওয়াব পৌঁছবে না। এগুলো খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত কথা। মাসয়ালার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু সাওয়াব পৌঁছাতে হবে এবং তা সদকা তাই হকদারদের খাওয়াতে হবে। আপনি সকল আত্মীয়-স্বজন একত্রিত করলেন, তাদের আহার করালেন, এটি প্রথা পালন হলো। এটা সওয়াবের সাথে সম্পর্ক নেই। তারা খাবারের সাথে সাওয়াবও খেয়ে ফেলবে, গরিব ও অসহায় মৃত ব্যক্তির জন্য কিছুই থাকল না। তারা তখনই পাবে, যখন হকদারদের সদকা করবেন।

ইসালে সাওয়াবের সঠিক পন্থা

ইসালে সাওয়াবের জন্য দাওয়াত করলে অত্যন্ত আবেগ ও আগ্রহের সাথে করবেন। আপনি প্রতিদিন দাওয়াত করেন। আপনার প্রিয়ভাজন আছে, আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিয়েছেন। মনে যতটুকু চায় দাওয়াত করেন। দশ, বিশ শত শত একত্রি করেন এতে কোনো আপত্তি

নেই। কিন্তু আপনি সাওয়াব পৌছানোর ইবাদাতে মিশ্রণ ঘটান কেন। কিছু হকদার, কিছু গাইরে হকদার, কিছু ধনী, কিছু গরিব– এমন করেন কেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনার অন্তরে কিছুটা লোক দেখানোর জযবা রয়েছে। আত্মীয়তার প্রতিবন্ধক রয়েছে যে, তাদের দাওয়াত না করলে নাক-কান কাটা যাবে, লজ্জা পেতে হবে। অতএব, যার মধ্যে নাক-কান কাটার ভয় রয়েছে তা ইবাদত হয় কিভাবে?

নাক-কান কাটার ভয় হলে তো মাখলুকের আনুগত্য হবে। না করলে আত্মীয়-স্বজনরা নাম রাখবে। তাহলে নামায, রোযা এবং সদকা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজনদের ইজ্জত রাখা এবং নাক-কান কাটার ভয়ে করা হয়, তাহলে তো মানুষ ইবাদাত করেও নষ্ট করে দেবে। তাহলে ইবাদাত করে উপকার কী হলো? ইবাদাত সঠিক নিয়মে করতে হবে।

অতএব, একথা বলা যে, উলামায়ে দেওবন্দ নিষেধ করেন, এটা ঠিক নয়। তারা ইসালে সাওয়াব থেকে নিষেধ করেন না। তারা এহেন রসম-রেওয়াজ থেকে নিষেধ করেন। অতএব, ওদের অপবাদ জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য। তারা এ কথা বলতে পারে না যে, উলামায়ে দেওবন্দ ইসালে সাওয়াবকে জায়েযই মনে করেন না বরং জরুরি মনে করেন। কিন্তু তারা কুপ্রথাকে নিষেধ করেন। আর এজন্য তারা প্রোপাগাণ্ডা করেন, যেহেতু তাদের পেটপূজায় বাধা সৃষ্টি হয়। তাই এভাবে বলে যে, দেওবন্দিরা সব ধরনের ইসালে সাওয়াবকে নিষেধ করেন, যাতে সর্বসাধারণ ক্ষেপে পায়।

শুনে রাখো; তোমরা ইসালে সাওয়াবের মুতলাক বস্তুকে তোমরা শর্তযুক্ত করছ। তাই দেওবন্দিরা এহেন শর্তযুক্ততাকে প্রতিরোধ করেন। কারণ, শর্তযুক্ত করার তোমাদের অধিকার নেই। আল্লাহ যাকে আম রেখেছেন, তাকে আমই রাখতে হবে, যাকে খাস করেছেন, তাকে খাসই করতে হবে। এদিক-সেদিক করা যাবে না। নাউযুবিল্লাহ! আমরা সাবেঈ নই যে, শরীয়ত বানিয়ে ফেলব। শরীয়তপ্রণেতা একমাত্র আল্লাহ্। তাকে পৌছানেওয়ালা হলেন তাঁর রাসূল। এরপর কারো অধিকার নেই শরীয়ত বানানো। সাহাবাদের মধ্যে আইম্মায়ে মুজতাহিদদেগণ শরীয়ত থেকে মাসায়েল বের করতেন; কিন্তু পৃথক শরীয়ত বানানোর কারো অধিকার নেই।

ইলমে গায়েবের বিতর্ক

প্রশ্ন : উলামায়ে দেওবন্দ জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিশু, পাগল এবং জানোয়ারসমূহের মতো বলে? নাউযুবিল্লাহ! নাউযুবিল্লাহ! শতবার নাউযুবিল্লাহ! শয়তানের ইলমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমে থেকে বেশি বলে?

উত্তর : এমন প্রশ্নও সম্পূর্ণরূপে সাজানো, মিথ্যাচার ও পরিষ্কার অসত্য। এমন দাবি আসলে তারাই করতে পারে, যারা উলামায়ে দেওবন্দকে অপবাদ দেয় এবং দোষারোপ করে। আর এই কাহিনীর ভিত্তি ওখান থেকে যে, কিছুলোক এমন দাবি করে বসে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওই সকল উলুম রয়েছে, যা আল্লাহর রয়েছে। ইলমে গায়েব কুল্লি এবং জুযয়ী, জুযয়ীর ইলমও রয়েছে আল্লাহর কাছে।

এ-সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'আমার এবং আমার সাথে সমস্ত মাখলুকের ইলম মিলিয়ে একত্রে আল্লাহ তায়ালার ইলমের সামনে এমন যেমন একটি বিশাল সমুদ্রে একটি চড়ুই পাখি এল এবং তাতে ঠোঁট লাগাল। তার ঠোঁটে যে পরিমাণ পানি লেগেছে এর সাথে সমুদ্রের পানির কি কোনো তুলনা দেওয়া যেতে পারে। সমগ্র মাখলুকের ইলম মিলে আল্লাহর ইলমের সঙ্গে এমন তুলনা হতে পারে, যা চড়ুই পাখির ঠোঁটের পানির সাথে সমুদ্রের পানি রয়েছে।'

অতএব স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন আর দাবি করি এমন যে, আল্লাহর যতটুকু ইলম রয়েছে, তার সবটুকু রাসূলকে দিয়েছেন। এমনটি আকল ও যুক্তিবিরোধী। আল্লাহ তায়ালার জাত লা মাহদুদ (সীমাহীন) এবং তার সিফাতও লা মাহদুদ। তার সিফাতে কামিলার মধ্যে একটি হলো ইলম। অতএব, তার ইলমও লামাহদুদ। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

আর বান্দা নিজে মাহদুদ। তাঁর বয়স মাহদুদ– সীমিত। জাত মাহদুদ, সিফাত মাহদুদ, শক্তি মাহদুদ। অতএব, লা মাহদুদ বস্তু মাহদুদের মধ্যে কিভাবে সংকুলান হতে পারে?

অতএব শরয়ীভাবে আমি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মোবারক পেশ করলাম এবং আকল ও যুক্তিগতভাবেও অসম্ভব। তাই আকল ও নকল যুক্তি ও বর্ণনা উভয়ের বিপরীত।

উলামায়ে দেওবন্দের আকিদা

উলামায়ে দেওবন্দের দাবি এমন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক তায়ালা যে পরিমাণ ইলম দান করেছেন, সে পরিমাণ ইলম সমগ্র জগতের আর কাউকে দেননি এবং এ-পরিমাণ ইলম আর কারো নেই। তিনি সৃষ্টিজীবের সবচেয়ে বড় আলেম। তামাম ফেরেশতাদেরও এতো পরিমাণ ইলম নেই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রয়েছে। অতএব, কায়েনাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইলমওয়ালা সত্তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। এমন দাবি যে, একে তো আলামুল খালায়েক হওয়া যে সমগ্র মাখলুক থেকে বেশি তার ইলম। আর আরেক তো আল্লাহর সমপরিমাণ হওয়া।

উভয় জিনিস ভিন্ন ভিন্ন। কোনো মাখলুক খালেকের কোনো গুণে আল্লাহর বরাবর হয়ে যাওয়া এমনটি আকলগতভাবেও অসম্ভব। আর আরেকটি হলো, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে উত্তম হওয়া। তা হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা। মোটকথা, বিষয়টি ওখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে, কিছু মানুষের দাবি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমে গায়েবের কুল্লী জানা আছে।

উলামায়ে বেরেলির দাবির খণ্ডন

এ-ব্যাপারে কিছু উলামায়ে দেওবন্দ লিখেছেন, আপনারা বলে থাকেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইলমে কুল্লি' হাসিল রয়েছে। এ কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য কী? যদি এমন উদ্দেশ্য হয় যে, সমস্ত জুয্ইয়্যাত ও কুল্লিয়াতের ইলম তার জানা ছিল, তাহলে এমনটি আকল ও নকল উভয় হিসেবে ভুল। স্বয়ং হাদীসের খেলাফ এবং কুরআনুল কারীমেরও বিপরীত। আর যদি এমন বলেন এবং আপনাদের উদ্দেশ্য এই হয় যে, কুল্লি থেকে কিছু ইলম রাসূল জানতেন, তাহলে কিছু ইলম তো আরো মাখলুকদের জানা আছে, কমবেশি ইলম আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন। প্রত্যেক ফেরেশতা ও জিন জাতিকে দিয়েছেন। তাহলে ইলমের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব রইল কিভাবে?

সারকথা, তোমাদের কথার উদ্দেশ্য যদি এই হয়, তাহলে ভুল। এমন উদ্দেশ্য উলামায়ে দেওবন্দের নয়। এমনটি উলামায়ে বেরলভীদের উদ্দেশ্য। যেগুলোকে আমরা রদ করছি। তারা আমাদের উপর অপবাদ দিচ্ছে,

আমরা এমন বলছি যে (নাউজুবিল্লাহ!) জানোয়ারের বরাবর ইলম ছিল এবং জিন্নাতদের বরাবর ইলম ছিল? নাউযুবিল্লাহ! নাউযুবিল্লাহ! নকলে কুফর কুফর নয়।

নাউযুবিল্লাহ! শয়তানের বরাবর ইলম। অতএব এমনটি বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা ইলম অর্থ এই মনে কর, এর উদ্দেশ্য এমন বের হয় যে, প্রত্যেক জানোয়ারেরও ইলম আছে, প্রত্যেক ফেরেশতার ইলম আছে, জিন্নাতদের ইলম আছে, তাহলে এতে শ্রেষ্ঠত্ব কি থাকল?

মোটকথা, তোমাদের উদ্দেশ্যের দুটি শাখা বর্ণনা করে সেগুলো রদ ও খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের কোনো দাবি পেশ করা হচ্ছে না। আমাদের উপর অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা এ দাবি করছ। এমনটি একেবারেই ভ্রান্ত।

এ-বিষয়টি এমন যে, আপনি আমাকে বললেন, সাহেব! অমুক মানুষ এসেছে আর সে এমন বলছে যে, অমুক স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ না করুন ওখানকার কেউ বেঁচে নেই, কেউ বাকি নেই। তখন আমরা তাকে বলব, ভাই! বুঝে শুনে বলো যে, বাকি না থাকার অর্থ কী?

এমন উদ্দেশ্য যে একজনও বাকি নেই, এমনটি সুস্পষ্ট ভ্রান্ত উদ্দেশ্য যে, গতকাল পত্রিকায় এসেছে যে, অনেক মানুষ জীবিত রয়েছে। আর যদি এমন বলো যে, কিছু মানুষ মারা গেছে, তাহলে এমন কোনো শহর রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিদিন কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে । অতএব আমরা যে আপত্তি তুলেছি, তা আপনাদের দাবি থেকে। আমরা কোন দাবি করিনি। আপনাদের দাবির উদ্দেশ্য বয়ান করা হচ্ছে। আর আপনারা আমাদের উপর অপবাদ দিচ্ছেন যে, তোমাদের এই উদ্দেশ্য। আমাদের এ উদ্দেশ্যের সাথে কী সম্পর্ক?

উলামায়ে দেওবন্দের দাবি

আমাদের দাবি এমন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত মাকলুক থেকে বেশি ইলম দান করা হয়েছে। না এতো ইলম নবীদের দেওয়া হয়েছে, না আউলিয়াদের দেওয়া হয়েছে, না ফেরেশতাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইলমের বিপরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম আংশিক। কুল্লি ইলম স্বয়ং আল্লাহর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম তার একটি অংশ এবং একটি ক্ষুদ্র অণুমাত্র। তেমনিভাবে আম্বিয়া আ.দের যে ইলম দেওয়া হয়েছে, তাও একটি

অংশমাত্র।

অতএব, পার্থক্যকে সুন্দর করে বুঝে নাও যে, এক হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম সমগ্র কায়েনাত থেকে বেশি। আর আরেক হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম আল্লাহর ইলমের সমান হওয়া। এমন বরাবর তখন হতে পারে, যখন জাত বরাবর হবে, সিফাত বরাবর হবে, হালত বরাবর হবে। যখন কোথও বরাবরি নেই, তখন সিফাতের মধ্যে কিভাবে বরাবর হবে? সিফাতসমূহের মধ্যে একটি হলো ইলম। অতএব ইলম কিভাবে বরাবর হতে পারে?

এমনটি অসম্ভব ও দুর্লভ। স্বয়ং এর বিপরীত দাবি করছে। হাদীসও এর বিপরীত দাবি করছে। অতএব এটি বিস্ময়কর বস্তু যে, তাদের দাবির একটি অংশ বর্ণনা করা হবে আর তা আমাদের উপর অপবাদ আরোপ করবে। ভাই! তোমাদের এই দাবি ছিল আর আমাদের পরিষ্কার ব্যাখ্যা এই। তোমরা উভয়টিকে অস্বীকার কর। তাহলে ঠিক। আমরা তো কোনো দাবি করি না।

আমাদের দাবি হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলামুল খালায়েক। বাকি সমস্ত সৃষ্টিজীবের ইলম মিলে এমন হতে পারে না। যেমন– সমুদ্রের মোকাবেলায় চড়ুই পাখির ঠোঁটভেজা পানি। কিন্তু একই তুলনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম আল্লাহর ইলমের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ ইলমের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম যৎসামান্য।

নামাযের পর মুসাফাহা

প্রশ্ন : দেওবন্দিরা নামাযের পর মুসাফাহাকে নিষেধ করেন?

উত্তর : নামাযের পর মুসাফাহাকে ওয়াজিব বানাল কে, আপনারা যা করছেন? কোনো জায়েয বস্তুকে আপনারা ওয়াজিব মনে করবেন, তাহলে নিষেধ করা হবে না তো কী করা হবে। নামাযের পর মুসাফাহা করা নামাযের সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। ওজুর সুন্নাতের মধ্যে শামিল নয়, দোয়া সুন্নাতের মধ্যে শামিল নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে বলেননি, সাহাবাগণ করতে বলেননি। তাই এটি কোনো আবশ্যক জিনিস নয়। ঘটনাক্রমে করে নিল এতে কোনো অসুবিধা নেই, কখনো আন্তরিকতা ও মহব্বতে করে নিল কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অসুবিধা হলো, যারা করে না, তাদেরকে

আপনারা ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেন। এতে বোঝা যায়, আপনারা এটিকে ওয়াজিব মনে করেন। অতএব, যে জনিস ওয়াজিব নয় সেটি আপনারা ওয়াজিব মনে করছেন, তাহলে বাধা দেওয়া হবে না তো কী করা হবে?

সুতরাং সব কথার মূল এমন যে, আল্লাহ যা জায়েয করেছেন, তা জায়েযের স্থানে রাখুন, যা ওয়াজিব করেছেন তা ওয়াজিবের স্থানে রাখুন, যা হারাম করেছেন তা তার স্বস্থানে রাখুন। আপনাদের অধিকার নেই ওয়াজিবকে জায়েয বানানো এবং জায়েযকে ওয়াজিব বানানো। মুসাফাহা করা জায়েয কিন্তু না করাও জায়েয। আর জায়েয অর্থ হলো, যখন করবেন অসুবিধা নেই, না করবেন তাও অসুবিধা নেই।

আর যদি কেউ করার জন্য জোর দেন, তাহলে অর্থ হলো তিনি এটিকে ওয়াজিব মনে করেন। তাহলে তাকে রুখতে হবে। তেমনি না করার জন্য যদি জোর দিতে থাকে, তাও তাকে রুখতে হবে। কারণ, এ কাজের অধিকার তার নেই। আল্লাহ তায়ালা বরাবর রেখেছেন, করলেও কোনো অসুবিধা নেই, না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। নিষেধ করা হয় ফরজ মনে করার কারণে। নামাযের সুন্নাত মনে করে করার কারণে বাধা দেওয়া হয়।

সারকথা হলো, আমরা মুসফাহাকে রেওয়াজ মনে করছি। আর কেউ রেওয়াজকে বাধা দিলে সে কাফির। কাফির হওয়ার একটি সীমারেখা রয়েছে। দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়কে যারা অস্বীকার করে, তারা কাফির। তোমাদের মুসাফাহাতে বাধা দিল, তো কাফির হয়ে গেল। খাবার পাকাতে নিষেধ করলে কাফির হয়ে যাবে। এদিকে কেউ লক্ষ করে না যে, কোন ফায়দার কারণে বাধা দিচ্ছেন। কোন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিরোধ করছেন। সেদিকে কেউ লক্ষ করে না। তেমনিভাবে কাফির বলা আপনাদের জন্য জায়েয নেই।

নামাযের পর দ্বিতীয় দোয়া

প্রশ্ন : নামাযের পর দ্বিতীয় দোয়াকে নিষেধ করেন?

উত্তর : দ্বিতীয় দোয়া অপরিহার্য হওয়াকে নিষেধ করেন। জায়েয হওয়াকে নিষেধ করেন না। কেউ যদি ঘটনাক্রমে করে ফেলে এবং দ্বিতীয় বস্তু কি কেউ দশবার করল, চারবার করল, যে যত পারে করুক কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটিকে এমনভাবে লাযিম করে যে, কেউ যদি না করে, তাহলে বলে, এ

লোকটি ভ্রান্ত প্রকৃতির মানুষ। এর অর্থ হলো, এরা এটিকে লাযিম ও আবশ্যক মনে করে। দ্বিতীয় দোয়া তো লাযিম নয় বরং জায়েয। অতএব জায়েযকে নিষেধ করা হয় না। লাযিমকে নিষেধ করা হয়। আল্লাহ তায়ালাই সঠিক জানেন।

হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ.
ব্যক্তিত্ব ও কর্ম

আমার সৌভাগ্য

হযরাতুল উস্তাদ আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি সাহেব রহ.-এর জীবনচরিত রচনা করার সময় মুহতারাম আশিক উমর সাহেব আব্বাসী আদেশ করলেন, যেন জীবনী লেখকদের সূচিতে আমার নাম যুক্ত করি। আদেশ পালন করা একটি সৌভাগ্যের কাজ। কিন্তু হযরত আল্লামার জীবনীর ফিরিস্তি এত দীর্ঘ যে, আমার মতো অসম্পূর্ণ ইলমধারীর কয়েকটি লাইন তার কয়েকটি শিরোনামের হকও আদায় করতে পারবে না। যাহোক এটি কম সৌভাগ্য নয় যে, আমার মতো মানুষের নাম তার জীবনী লেখকদের কাতারে লেখা হবে। যদিও কয়েকটি অসম্পূর্ণ লাইন লিখেছি; কিন্তু তাতে কোনো সুন্দর বিন্যাস নেই, নেই আলোচকদের গঠনপ্রণালী। ভাবনাহীন লেখকদের মতো মনে যা এসেছে, তা-ই লিখেছি এবং এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যেহন চলে গেছে; সেগুলোকে কাগজে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং এ-জীবনী প্রচলিত জীবনচরিত নয়, শুধু একটি পর্যালোচনা, যার দ্বারা নিজের বরং পাঠকদের প্রশান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান উদ্দেশ্য।

ইলমি রুচিবোধের রং ও ধরন

হযরত আল্লামা রহ. আমার উস্তাদ ছিলেন। তাঁর নিকট হতে আমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। তিনি সকল ইলমের পাশাপাশি বিশেষ করে উলুমে আকলির (দর্শন শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা) প্রতি স্বভাবজাত অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন, আমি যদি হযরত মাওলানা নানুতুবী রহ.-এর রচনাবলি না দেখতাম, তাহলে আমার জানা নেই যে, কেমন গভীর গর্তে পড়ে থাকতাম।

কিন্তু হযরত নানুতুবী রহ.-এর উলুম আমাকে সাহায্য করেছে। উলুমে আকলিয়ার প্রতি প্রথম থেকে আকর্ষণ ছিল। হেকমতে কাসেমিয়্যাহ আমাকে

মাকুলাতে ঈমানীর রাস্তা দেখিয়েছে। হযরতের মধ্যে দার্শনিক রং প্রবল ছিল। এজন্য ইসলামের উসূল ও কুল্লিয়াত তথা মূলনীতি ও সমষ্টিগত বিধান দ্বারা বেশি আনন্দ পেতেন এবং সেই আলোচ্য বিষয়ের তার বয়ান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহকীকসুলভ হতো। শিক্ষকতার প্রাথমিক পর্যায়ে মাকুলাতের কিতাব বেশি-বেশি পড়াতেন। কিন্তু শিক্ষকতার শেষ পর্যায়ে এ-সকল কর্ম ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু কিতাব ও সুন্নাহ এবং দীনি বিষয়াবলির অধ্যাপনা অবশিষ্ট ছিল। এতে ফলাফল এমন হলো যে, পরিশেষে তিনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর খেদমতের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ফায়দাসমূহ

কুরআনুল কারীমের 'তাফসীরে ফাওয়ায়েদ' অত্যন্ত সুস্বাদু ও সাবলীল ভাষায় এবং আশ্চর্যজনক বাচনভঙ্গির সাথে সুন্দর হস্তলিপির অপূর্ব শৈলী। সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফাতহুল মুলহিম' তার ইলমি মেহনতের নিংড়ানো অবদান। এ-তাফসীর ও হাদীসের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলকে সহজ-সরল শিরোনামে সমাধান পেশ করেছেন, যার দ্বারা হযরতের ইলমি যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়।

তাকরীর ও বয়ানের ধরন

বয়ান ও তাকরীরে হযরতের বিশেষ দখল ছিল। প্রমাণ পেশ করার শক্তি-সক্ষমতা অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় ছিল। সাধারণ বিষয়কে এমন চিত্তাকর্ষক ও শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা পেশ করতেন যে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সমাধানকৃত মাসয়ালা মনে হতো এবং তার সকল সাইড দৃঢ়তার সাথে পরিষ্কার হয়ে যেত।

রচনার ক্ষেত্রে তার বিশেষ একটি পদ্ধতি ছিল, যার মধ্যে না আধুনিক যুগের লাগামহীন যথেচ্ছা ও ঔদ্ধত্য থাকত, না প্রাচীন নিয়মের আদীম পদ্ধতি থাকত। যুগের সুন্দর বাচনভঙ্গি এবং অতীতের দৃঢ়তা উভয়ের সমন্বিত রং ও ধরন ছিল, যা তার লেখায় ফুটে উঠত। ভাষায় অলংকার, সাহিত্য ও সাবলীলতা ছিল।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত সুন্দর সমন্বয় এবং তাহকীকের সাথে আদায় করতেন। কথা বিস্তৃত হতো; কিন্তু অর্থহীনতামুক্ত। প্রত্যেক মাসয়ালার মধ্যে তার সমস্ত দিক ও প্রান্তসহ প্রকাশ করা এবং সুস্পষ্ট করার পথ ও উপায় থাকত। সেজন্য হযরতের নজর সবকের সংখ্যার দিকে থাকত না, নজর রাখতেন কাইফিয়্যাতের প্রতি যদিও সবক সংখ্যায় কম হতো; কিন্তু পরিপূর্ণরূপে হতো। এ-কারণে দরস ও তাদরীসে সময়ের বেশি পাবন্দী ছিল না। মাসয়ালা নিরীক্ষণ এবং তাতে গবেষণা ও চিন্তা-ফিকির করার কাজে সময় ব্যয় হতো বেশি। কিন্তু সবকের বিঘ্নতা এজন্য ক্ষতিকর হতো না যে, এক দিনের সবকের অবস্থা এমন হতো যে, তাতে কয়েক দিনের বিষয়বস্তু আয়ত্ত হয়ে যেত এবং ক্ষতি পুরা হয়ে যেত।

আমার প্রাথমিক স্তরে পড়াকালে তিনি নিজে আমার সম্মানিত পিতাকে বললেন, ওকে আমি মাকুলাত বিষয়গুলো পড়াব। আর আমাকে বললেন, আমি তোমাকে মানতিক পড়াব। সুতরাং বিশেষভাবে মানতিক কিতাবের সুগরা ও কুবরা শুরু করালেন এবং মিরকাত কিতাব পর্যন্ত পৌঁছলেন। যদিও মাঝখানে আরো কিতাব রয়ে গেল; কিন্তু যতটুকু পড়িয়েছেন ততটুকুর দ্বারা মানতিক তথা তর্কশাস্ত্রের সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, তাঁর আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি কিতাবের প্রতি থাকত না, বিষয়বস্তুর প্রতি থাকত। ফলে ছাত্রদের যোগ্যতা অনুসারে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যেত। আমি যখন মাধ্যমিক স্তরের কিতাব হিদায়া, জালালাইন ইত্যাদি কিতাব পড়ছিলাম, তখন আমি নিজে তাকে বললাম, হযরত! আমাকে তজমাতুল কুরআন পড়িয়ে দিন। অন্যান্য ছাত্ররাও অনেক আগ্রহী ও আশাবাদী। তিনি বললেন, প্রথম প্রথম তো ছাত্ররা নাম লেখায়। কিন্তু পরবর্তীতে আস্তে-আস্তে কমতে কমতে পরিশেষে ক্লাস জিরো হয়ে যায়। আমি বললাম, হযরত! কমপক্ষে আমার উপর তো বিশ্বাস রয়েছে। আমি না অনুপস্থিত থাকব, না অনাসক্তি প্রদর্শন করব। তিনিও ওয়াদা করলেন এবং অত্যন্ত মমতার সাথে কুরআন শরীফের সবক শুরু করলেন।

প্রথম অবস্থায় শত শত ছাত্রের ভিড় লেগে যায়। কিন্তু পরে ছাত্র কমতে থাকে, পরিশেষে আমি একা থেকে যাই। তখন কুদরতিভাবে হযরতের অধ্যাপনার আসক্তি কমে যায় এবং অনুপস্থিতি অনেক হতে থাকে। কিন্তু আমি এমন তরিকা গ্রহণ করি যে, সেই ঘণ্টার সময় হযরত যেখানেই

থাকতেন, সেখানেই পৌঁছে যেতাম। চাই বাড়িতে হোক, অফিসে হোক বা মাদরাসার কুতুবখানায় হোক সেই ঘণ্টাটুকু হযরতের পাশে চুপ করে বসে থাকতাম। কোন দিন পড়াতেন, কোন দিন ওজর পেশ করতেন। কিন্তু তবুও সেই সময়টুকু হযরতের পাশে বসে কাটাতাম, পুরা করতাম। পরিশেষে একদিন বললেন, ভাই! আমি হেরে গেলাম এবং তুমি জিতে গেলে। তুমি তোমার কথা ও ওয়াদা পুরা করে দেখিয়েছ।

চারিত্রিক গুণাবলি

চরিত্রগতভাবে একটি বিশেষ গুণ এই ছিল– যা অনেক উঁচু মানের ছিল যে, তাঁর ভিতর ও বাহির এক ছিল। তিনি নিজের আন্তরিক জযবা গোপন করা অথবা তার বিপরীত প্রকাশ করতে পারতেন না। যদি কারো প্রতি খুশি হতেন, জাহের ও বাতেন উভয়ভাবে খুশি হতেন। আর যদি নাখোশ ও নারাজ হতেন, তখন প্রকাশ্যরূপে তা তার উজ্জ্বল চেহারায় ফুটে উঠত এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দিতেন। দারুল উলুমের কাজে কখনো যদি যিম্মাদার হযরতদের সাথে মনোমালিন্য হতো এবং হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ. (মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ। তিনি তার বড় ভাই ছিলেন) অসন্তুষ্ট হতেন, তখন অধিকাংশ সময় রাগ করে বসে থাকতেন। অথবা সফরে চলে যেতেন। তাকে মানানো এবং রাজি করানোর জন্য অধিকাংশ সময় আমাকে হুকুম করা হতো। কারণ, আমাকে তিনি অনেক স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন।

একবার রাগ করে থানাভবনে চলে গেলেন। তখন আমি সেখানে গেলাম এবং হযরতকে রাজি করিয়ে নিয়ে এলাম। একবার অসন্তুষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকলেন। মাদরাসায় আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সিদ্ধান্ত করলেন, তুমি গিয়ে নিয়ে আস।

আমি বাড়িতে গেলাম এবং অনুনয়-বিনয় করলাম। তখন রাজি হলেন এবং মাদরাসায় চলে এলেন।

তবিয়ত এত পরিষ্কার ছিল যে, যখনই রাগ চলে যেত, সাথে-সাথে অসন্তুষ্টি দূর হয়ে প্রকৃত খুশি চেহারায় ফুটে উঠত এবং এমন খুশি ও আনন্দ হতেন, যেন অসন্তুষ্ট হননি, রাগ করেননি। একজন আলেমে দীনের জন্য এ গুণ থাকা একটি বিরাট মাকাম যে, তার জাহের ও বাতেন এক এবং কোনো লৌকিকতা নেই বরং কৃত্রিমতা ও বানোয়াটহীন। তাঁর চলার গতিই এমন

ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলম ও ফযলের একটি বিশাল অংশ দান করেছিলেন। কিন্তু সাথে-সাথে অনেকবার এমন চিত্রও দেখেছি যে, তার বড়রা তাকে কোনো ভরপুর মজলিসে ধমকমিশ্রিত কথা বলেছেন; তবু কখনো উফ শব্দ বের করেননি। যদিও কথাটি তাঁর নিকট মানার যোগ্য না হতো, তবুও নিজের আকাবিরদের অধিকার রক্ষা করতেন, চুপ থাকতেন।

সত্যপ্রিয়তা

আন্তরিক জযবাতকে একেবারে সুস্পষ্ট প্রকাশ করে ফেলতেন যদি তাতে নিজের কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পেত। একবার তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ঘরে বসে যান। নিয়মমাফিক তাকে রাজি করানোর জন্য বাড়িতে গেলাম। তিনি রাগতস্বরে বললেন, ভাই! তারা আমাকে মৃত মনে করছে। ফলে আমার থেকে এভাবে নজর ফিরিয়ে নিয়েছে। তুমি শুনে নাও, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে আমার অন্তরে দুই প্রকার জযবা সৃষ্টি হয়েছে। একটি জযবা আল্লাহর পক্ষ হতে, আরেকটি নফসের পক্ষ থেকে। নফসের মধ্যে এমন জযবা সৃষ্টি হয়েছে যে, যদি তারা আমাকে মুর্দার ভাবে, তাহলে আমি তাদেরকে আমার যিন্দেগীর ভরসা করাব এবং এর জন্য আরো কোনো পদ্ধতি হতে পারে, যা তাদেরকে আমার জিন্দেগী কি তা বোঝাবে, বলে দেবে। আর অপর জযবা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আর তা এমন যে, আমি দেওবন্দের বাইরে কোথাও গিয়ে সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করব। আমার পক্ষ হতে কিছু একটা হতে থাকবে। না আমি দেওবন্দে থাকব এবং না প্রতিদিন কৈফিয়ত শুনব।

আমি আরজ করলাম, হযরত! আপনি উভয় জযবার মধ্য হতে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেবেন? তিনি বললেন, লিল্লাহিয়্যাতওয়ালা জযবাকে। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শোকর। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয়ই এতে আপনার জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে এ-নিয়ত পবিত্র নিয়ত। কিন্তু সেদিকেও তো লক্ষ করতে হবে যে, এহেন সামান্য সামান্য স্বভাবজাত অপ্রিয়তার কারণে দলীয় কাজ ছেড়ে দেওয়া, পরিহার করা উচিত হবে না যখন আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপর কাজ নির্ভর করে। এমনিভাবে ভবিষ্যতে দলের অন্যান্য বুযুর্গগণ এহেন সাময়িক এবং দাঙ্গা ও গণ্ডগোলের অপ্রিয়তার কারণ যা কোনো না কোনোভাবে আপনার পক্ষ থেকে তাদের মধ্যে জাহের

হয় আর তারা এমন ফয়সালা করে ফেলে যে, আমাদের কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এখন আপনি বলুন, এই কাজ তাহলে কিভাবে চলবে? এবং এ কাজ কে সামলাবে? আমার মতে আপনি আপনার একার ক্ষতি করার ফয়সালা করেননি বরং একটি দলীয় কাজকে নিঃশেষ করার ফয়সালা করেছেন। এমনটি কি উচিত হবে?

সুতরাং এতটুকু শ্রবণে মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি সঠিক বলেছ। ব্যস, আমি এখন আমার দ্বিতীয় জযবাও অন্তর থেকে বের করে দিলাম। আগামীকাল হতে দারুল উলুমে পৌছে পুনরায় কাজ শুরু করব।

সুতরাং ওয়াদা মোতাবেক সকালবেলা মাদরাসায় এলেন এবং এমনভাবে এলেন যে, কোন ঘটনাই ঘটেনি। এটি মূলত তার জাহের ও বাতেনের একতা, অন্তরের স্বচ্ছতা এবং এক পছন্দীর প্রভাবে ছিল। ফলে মনে কিছুই রাখতেন না।

রচনাপদ্ধতি

যাহোক ইলমের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা হযরতকে বিশেষ একটি গুণ প্রদান করেছিলেন, যা তিনি তার পবিত্র অন্তরে বসিয়ে দিয়েছিলেন। আন্তরিকভাবে স্বনির্ভরতা ও কোমলতার স্বভাব প্রবল ছিল। কর্মের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের পক্ষ থেকে আবেদন এবং যথেষ্ট আবেদন প্রকাশ না পেত, ততক্ষণ পর্যন্ত মনোনিবেশ করতেন না। কিতাব অধ্যয়ন এবং অধ্যয়নের আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। তিনি নিজেই কখনো কখনো বলতেন, আমি কী কাজ করব? আমি তো কিতাবের পোকা হয়ে পড়ে থাকি। তারপরও বাস্তবতা এমন যে, তাফসীরে ফাওয়ায়েদ এবং শরহে মুসলিম তথা ফাতহুল মুলহিমের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আযিমুশ্বান কর্ম, যুগের স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। এ ছাড়া আরো কিছু উচ্চতর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আল আকল ওয়াল নকল', 'আল ইসলাম আশ শিহাবুস সাকিব', 'সাদায়ে ঈমান', 'ইজাযুল কুরআন'সহ আরো কিছু উপকারী দুটি কিতাব রচনা করে গেছেন। বাস্তবতা হলো, তিনি মাসায়েল বর্ণনার হক আদায় করেছেন।

হযরাতুল আল্লাম কাশ্মীরি রহ. এ কারণে তাকে লিসানুল গায়েব (অদৃশ্য ভাষা) বলতেন। স্বভাবজাত মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন, প্রখর বোধশক্তি এবং সুস্ত তবিয়তের অধিকারী ছিলেন। ইলমের ভিত্তিবোধ শক্তির উপর। যখন তা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে ব্যবহার হয়, তখন কুদরতিভাবে

ডাবল ইলম অর্জন হয়।

রচনার বিস্ময়তা সর্বস্বীকৃত ছিল। একই বিষয়বস্তু কয়েকজন লিখেছেন। সেটিকে তিনি যখন লিখতেন, তখন সবার উপর তার লেখার বিস্ময়তা প্রকাশ পেত। মাল্টার বন্দীশালা থেকে ফিরে আসার পর হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর নিকট ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণের ফতোওয়া চাওয়া হয়। তিনি তার তিন আরশাদ (হিদায়েতপ্রাপ্ত) ছাত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব এবং হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ সাহেব রহ.কে সোপর্দ করলেন যে, এরা তিনজন ফতোওয়া সংকলন করবে এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও দীনদারীর সাথে বললেন যে, ইংরেজদের ব্যাপারে আমার তাদের উপর কোনো আস্থা নেই। আমার উপর তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা প্রবল। হতে পারে, ফতোওয়ার দেওয়ার মধ্যে জযবাতের রং জাহের হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কোনো জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন উৎসাহিত না করে যে, তোমরা তাদের উপর ইনসাফ করবে না। ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী কাজ।

এজন্য ফতোওয়ার উত্তর আপনারা তিনজন মিলে লিখবেন। সুতরাং তিনজন পৃথকভাবে ফতোওয়া সংকলন করলেন। তিনি তিনজনের উত্তর নিরীক্ষণ করে হযরত শাব্বির আহমদ সাহেবের উত্তর সম্পর্কে বললেন, মাশাআল্লাহ! সবার উত্তরই উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু ভাই! আমি যদি লিখতাম, তাহলে শাব্বির যা লিখেছে তার পাশাপাশি হতো।

যাহোক তার লেখার পরিপূরক বিস্ময়তা এবং সাহিত্য অলংকারকে স্বয়ং তার আকাবিরগণও স্বীকার করতেন এবং তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

কবিতা ও ছন্দ রচনা

হযরত কবিতা ও ছন্দ বলা ও রচনা করতে অক্ষম ছিলেন না। কিন্তু এগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, আপন মনের ভাব তিনি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ওফাতের উপর 'নালায়ে দিল' নামে একটি কবিতা রচনা করেন, যা সকলেই পছন্দ করেছিলেন। আর একবার আমার সম্পর্কে একটি কবিতা রাচনা

করেন, যার ঘটনা এমন ছিল যে, আমার বিবাহের সম্পর্ক রামপুরে মৌলবী মাহমুদ সাহেব রহ.-এর পরিবারে হচ্ছিল। বিবাহ তখনো হয়নি। আমার আহলিয়া জয়পুর তার চাচার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা ভয়াবহ দেখে ভুলে অথবা ভুল শ্রবণের ফলে ওখান থেকে ইন্তিকালের খবর দেওয়া হয়। ফলে দেওবন্দে শোকের ছায়া নেমে আসে। তৃতীয় সংবাদ আসে যে, মৃত্যুর সংবাদটি ভুল ছিল।

এতে বিবাহের আনন্দ শুরু হয়ে যায়। বাড়িতে ও মাদরাসায় অভিনন্দন চলতে থাকে। এ-সমস্ত জলসায় বিভিন্ন হযরতদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদের কবিতা পাঠ করা হতো। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ সাহেব রহ. এক জলসায় অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন এবং পাঠ করে শোনান– যার দুটি পঙ্‌ক্তি ছিল এই যে–

غلط اک تار برقی پہنچی تھی جے پور سے جس نے

جلایا خرمن مقصود کو برق تپاں ہو کر

ভুল টেলিফোন বার্তা পৌছে জয়পুর হতে, যা ভস্ম করে
দেয় উদ্দেশ্যের গোলা, বিদ্যুৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে।

এমনিভাবে কখনো কখনো বিশেষ কোন মুহূর্তে কবিতা বলতেন। কিন্তু তা সখের পর্যায়ে ছিল না– স্রেফ প্রয়োজন পর্যায়ে ছিল। কিন্তু অভ্যাস এ-কাজে অপরাগ ও অক্ষম ছিল না। যাহোক, হযরত আল্লামার ব্যক্তিত্ব, তাকরীর ও তাহরীর (রচনা), কবিতা ও প্রবন্ধ এবং ইলম ও ফজলের একজন মূর্তপ্রতীক ছিলেন, যার চলে যাওয়ার কারণে এই বিশেষ গুণাবলিও চলে যায়। এমনিতেই আল্লাহপাক আপন দীনের রক্ষক এবং এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে থাকবেন, যারা তার দীন এবং তার নবীর ইলমের সেবা করবে এবং সতেজ হতে সতেজ করতে থাকবে। কিন্তু যাদের সামনে ইলম ও ফজলের ব্যক্তিত্বরা চলে যান, তাঁদের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। আর তাঁরা যে ধরনের ফজল ও কামালের সাথে অন্তরঙ্গ এবং আসক্ত হন, সেগুলো উঠে যাওয়ার ফলে অবশ্যই তারা ইয়াতীম ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক অবদান

পরিশেষে রাজনৈতিক লাইনে হযরতের পক্ষ থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম পেয়েছে, সেগুলো তার জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান। একথা ভিন্ন

যে, তার মতের সাথে অনেক আকাবিরদের ভিন্নতা ছিল। ভিন্ন মত আপন স্থানে সঠিক, এতে প্রত্যেকেই আপন আপন দলিল-প্রমাণের উপর অপারগ থাকেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আমলের শক্তি, যা পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ও পরে হযরত থেকে জাহির হয়েছে। অন্যরা সেগুলোকে প্রত্যাশার বিপরীত ভাবতেন। কিন্তু আল্লাহপাক সেই অংশ তার অংশে নির্ধারণ করে রাখেন। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কাজে উলামায়ে দীনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, সামাল দিয়েছেন। আল্লাহ পাক একাই তাঁকে ওখানকার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বানিয়ে দেন এবং তার দ্বারা এমন কাজের আঞ্জাম দেওয়ালেন, যা একজন কেন্দ্রীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব দ্বারা নেন। আজ তিনি জীবিত থাকলে ওখানকার কাজের ধরন ভিন্ন হতো। এখানকার (ভারতের) লোকেরা তার রায়ের সাথে ভিন্নতা পোষণ করতেন। কিন্তু তার জযবাত ও সততা ও নিষ্ঠার সম্মান করতেন। এ-ও মনে করতেন যে, যদি মতানৈক্যের বাহানায় ওখানে (পাকিস্তানে) তিনি না যেতেন, তাহলে দীনের যে সমস্ত মান হয়েছে, তা জাগতিক আসবাব দ্বারা হতো না।

কৃতিত্বের স্বাক্ষর

সারকথা, সার্বিকভাবে হযরত আল্লামা একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার ইলম ও ফজলের শিষ্য ও ভক্ত সারাদেশ জুড়ে ছিল এবং বহির্বিশ্বেও তার প্রসিদ্ধি পৌঁছে গিয়েছিল, যার সামনে মাথানত করা নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করত।

তার তাফসীরি ফাওয়ায়েদ আফগান সরকারের পক্ষ থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করা এবং সে ফাওয়ায়েদগুলোকে কাজের জন্য নির্বাচন করা প্রকৃতপক্ষে তার ইলম ও ফজলের সামনে মাথানত করার নামান্তর। আর আল্লামা যাহিদ কাউসারী মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম-এর ফাতহুল মুলহিমের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আদায় করা, প্রকাশ করা ও তাঁর ফজল ও কামালের স্বীকৃতি ছিল। যাহোক যেখানে সেখানে তার ফজল ও কামালের কোনো চিহ্ন পৌঁছেছে, সেখানেই স্বীকার ও স্বীকৃত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এমনিভাবে হযরত মাওলানার ব্যক্তিত্ব শুধু ভারতবর্ষের জন্যই গর্বের বস্তু ছিল না বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য গৌরবের বিষয় ছিল।

আদেশ পালন

যদি এভাবে কলম চালাতে থাকি, যেভাবে কলম স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে চলছে, তাহলে অনবরত চলতে থাকবে। আর এই মজলিসে কয়েকটি লাইন লেখা হয়ে গেছে। সম্ভবত কলম চলতে থাকবে এবং একেকটি কথা স্মরণ হতে থাকবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সময় শেষ হয়ে যায়। বাইরের সফরের জন্য পা উঠে পড়ে, ট্রেন আসার সময় হয়ে যায়। সেজন্য কলম বন্ধ করতে হয়। যদি কলম চলতে থাকত, তবুও জীবনীর দীর্ঘ ফিরিস্তি পুরা হত না। বরং তা হতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকতে হতো। এজন্য যদিও বন্ধ করে দিয়েছি, এতে অসুবিধা নেই, ফিরিস্তি পূর্ণ হতো না। এখন কয়েকটি লাইন তাৎক্ষণিকভাবে মুখ থেকে বের হয়ে এল এবং মুহতারাম আশিক সাহেবের আদেশ পালন হয়ে গেল। আর আমিও এই বাহানায় মাওলানার জীবনী লেখকদের ফিরিস্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলাম, যা আমার গৌরবের জন্য যথেষ্ট।

দশম খণ্ড সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

- খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম / কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) [১-১০ খণ্ড]
- উসওয়ায়ে আসহাবে রাসূল / মাওলানা আবদুস সালাম নদভী (রহ.)
- ফতোয়ায়ে উসমানী / জাস্টিস মাওলামা তকী উসমানী [১-৩ খণ্ড]
- ইসলাম ও বিজ্ঞান / হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
- নামাযের কিতাব / হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
- ইলমী বয়ান / মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী
- ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া / জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
- কুরআন আপনাকে কী বলে / প্রফেসর আহমদ উদ্দিন মাহবারবী
- দীনী দাওয়াত ও আল্লাহর মদদ / মাওলানা তারিক জামীল
- কালের আয়নায় মুসলিমবিশ্ব / শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- বাংলার শত আলেমের জীবনকথা / মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
- আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ / হাফেয আকবর শাহ বুখারী রহ.
- ইসলামে পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য / ড. মাজহার ইউ কাজী
- দাস্তানে মুজাহিদ / নসিম হিজাযী
- বখতিয়ারের তিন ইয়ার / শফীউদ্দীন সরদার
- দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত / শফীউদ্দীন সরদার
- রাজনন্দিনী / শফীউদ্দীন সরদার
- সাহসের গল্প / মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- কাশ্মীরের কান্না / সমর ইসলাম
- তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে / সমর ইসলাম
- নোলক / সমর ইসলাম
- স্বপ্নের উপাদান / সমর ইসলাম
- আদর্শ এক গৃহবধূ / আবদুল খালেক জোয়ারদার
- বাংলা ভাষার বানানরীতি / এম এ মোতালিব
- মোবাইল ফোনের শরয়ী আহকাম / মুফতী আবদুল আহাদ
- ছোটদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) / সমর ইসলাম
- ছোটদের ইমাম বুখারী (রহ.) / সমর ইসলাম
- রহস্যময় মজার বিজ্ঞান (১ ও ২) / সমর ইসলাম
- বিজয়ের গল্প-১ : স্পেনবিজয়ী তারেক বিন জিয়াদ / সমর ইসলাম
- গল্পের ফুলদানী / হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন
- ইতিহাসের গল্প-১ : ভারত শাসন করলো যারা / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-২ : ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের অজানা কথা / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-৩ : গল্প নয় সত্যি / মো. জেহাদ উদ্দিন
- ইতিহাসের গল্প-৪ : সোনালী যুগের কাহিনী / মো. জেহাদ উদ্দিন